আদিম জনপদ অবুঝ মেয়ে

শরৎ পাবলিশিং হাউস
১৪, টেমার লেন,
কলকাতা-৭০০ ০০৯

বৈশাখ, ১৩৬৭ ॥ এপ্রিল, ১৯৬০

প্রকাশক :

ছায়া চট্টোপাধ্যায়

শরৎ পাবলিশিং হাউস

৯।৪, টেমার লেন,

কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর :

নীলরতন পাল

উদিত উদ্যোগ

৪২, মহেন্দ্র গোঁসাই লেন,

কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ :

প্রবীর সেন

আদিম জনপদ

গোলটা শেভ করে দিল অন্য একজন গোলকিপার। ডাউন মোকামা প্যাসেঞ্জারের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল জনাদার বউ। ধ্রুব কিছু করে ওঠার আগেই কোথা থেকে ইয়াং একটা ছেলে এসে, হ্যাঁচকা টানে জনাদার বউকে প্ল্যাটফর্মে আছড়ে ফেলল। হই হই করে উঠল প্ল্যাটফর্ম চত্বর। অফিসবাবুরা সবে জমা হচ্ছিল স্টেশনে। ভাত-পেটে সবাই দৌড়ল ঘটনাস্থলে। স্টেশনবাসী যুগি বুড়ি কিন্তু নিজের পোঁটলা পুঁটুলি ছেড়ে নড়েনি। সমানে খিস্তি করে যাচ্ছে। কাকে অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না।

ধ্রুব পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় জটলার দিকে। ছেলেটার শেভ করার স্টাইল তার খুব ভাল লেগেছে। একেবারে লা জবাব!

কাগজফুল গাছের নীচে গ্রিক যুবরাজের মতো দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা, পায়ের নীচে মাথা নামিয়ে বসে বউদি। কান্নাকাটি, ছটফটানি কিচ্ছু নেই। লজ্জায় যেন পাথর। ধ্রুব সিওর, সান্ত্বনা ও কৌতূহল নিয়ে গজিয়ে-ওঠা ভিড়ের মধ্যে সে-ই সব থেকে জনা বউদির কাছের লোক। বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে ধ্রুবকেই। তার মানে সকালের অপারেশন ঘণ্টা-খানেক পেছল। যদিও চার শাগরেদকে এখনও দেখা যাচ্ছে না।

বউদির সামনে হাঁটুমুড়ে বসার আগে ধ্রুবর একবার থ্যাঙ্কস দিতে ইচ্ছে হয় উদ্ধার কর্তাকে। লাইফ থেকে আচমকা ছুটে-আসা বউদির মৃত্যুঝাঁপ ধ্রুবর পোস্ট দিয়েই হয়ে যাচ্ছিল। ভাগ্যিস ছেলেটা এসে যায়! এই তো কিছুক্ষণ আগে ধ্রুবর একটা বেঞ্চ পরেই বউদি এসে বসেছিল। ধ্রুব ভেবেছে কোনও কামধান্ধায় যাচ্ছে হয়তো। দেখেও না-দেখার ভান করেছে। চোখাচোখি হলেই কথা বলতে হবে। আর কথা মানেই তো সেই এক পাঁচালি। গত সাত বছর ধরে ধ্রুবদের পাড়ার বেশিরভাগ বাড়িতে যেটা পড়া হচ্ছে। কিন্তু জনাদার বউ যে এরকম একটা সোজা মতলব নিয়ে বসেছিল, ভাবাই যায়নি! ট্রেন ঢুকতেই দৌড় মারল। প্রাক্তন গোলরক্ষক ধ্রুবর বেঞ্চ ছেড়ে উঠতে সামান্য দেরি হয়ে যায়। বিয়াল্লিশে রিফ্লেক্স তো কমবেই। সেই দেরিটা মেকআপ করে দেয় কুড়ি বাইশের নতুন গোলকিপার।

ছেলেটাকে ঘিরে এখন ভিড়। সবাই বাহবা দিচ্ছে। দু'-একজন তো হ্যান্ডশেক করে গেল। সবাইকে ছাড়িয়ে ওব মাথা। গোলকিপিং-এর পক্ষে উপযুক্ত হাইট। ভিড় সরিয়ে ধ্রুব পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

ছেলেটার মুখে অহংকারের কোনও চিহ্ন নেই। বরং বেশ ঘাবড়ে গেছে। কত বড় কাজ করে ফেলেছে নিজেই বুঝে উঠতে পারেনি এখনও। পাবলিকের পাম্পে আরও জেরবার অবস্থা।

এরকমই হয়। তিরাশি সালে একটা প্রীতিম্যাচে কলকাতার টিম এসেছিল মজিদপুরে। মোহনবাগানের কান্নন ছিল সেই টিমে। সাবডিভিশান চ্যাম্পিয়ন চড়কডাঙার গোলে ধ্রুব। বক্সে ঢুকেই শটটা নিয়েছিল কান্নন। বাঁ-পোস্টের ভেতর দিকে কামানের গোলার মতো ঢুকে যাচ্ছিল বল। স্প্রিং-এর মতো ছিটকে গিয়ে গোলটা শেভ করে ধ্রুব। সারা মাঠ জুড়ে দর্শক ধেয়ে আসছে। ধ্রুব থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে। নিজেই জানে না কী করে ফেলেছে।

জনা বউদির দুঃখের জীবনটা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ছেলেটার পিঠে হাত রাখতে যাবে ধ্রুব, হঠাৎ হনহন করে হাঁটা দিল সে।

ভিড় থেকে বেরিয়ে আসে ধ্রুব। ছেলেটার যাওয়ার পথে তাকিয়ে থাকে। যেন বাইশ বছর আগের ধ্রুবই হেঁটে যাচ্ছে।

—কী হয়েছে মামা! এখানে এত ভিড় কেন?

ফুচার প্রশ্নে সংবিৎ ফেরে ধ্রুবর, আর বলিস না। আমাদের পাড়ার বউ সুইসাইড করতে গেছিল। জোর বাঁচিয়ে দিয়েছে একটা ছেলে। আমাকে এখন আবার পাড়ায় বউটাকে দিয়ে আসতে হবে।

ফুচা অবাক হয়ে বলে, সে কী, তা হলে আমরা কাজে যাব কখন?

—বাকি ছেলেগুলো আসুক। আমি আধঘণ্টার মধ্যে ঘুরে আসছি।

—ওরা এসে গেছে। চা প্যাঁদাচ্ছে গোপলার দোকানে। তোমাকে ডাকতে পাঠাল।

কী করা উচিত, ভেবে পাচ্ছে না ধ্রুব। জটলার দিকে তাকায়, জনা বউদিকে চেনে এমন কি কেউ নেই ওখানে। এমন সময় ফুচা টু দ্য পয়েন্ট কমেন্ট করে, তুমি কি ভাবছ বাড়ি পৌঁছে দিলেই বউটা বেঁচে যাবে। এ শালার সুইসাইড এমন একটা জিনিস না, নেশার মতো। বারবার ট্রাই নেবে বউটা।

ক্লাস নাইন ফেল দার্শনিক ফুচার দিকে অবাক হয়ে তাকায় ধ্রুব। ফুচা তাড়া দেয়, চলো চলো। এ-সব ফালতু লাফরায় থাকলে আমাদের চলবে!

তবুও ধ্রুব একবার ভিড় ভেদ করে দাঁড়ায়। একটু ধাতস্থ হয়ে মুখ তুলেছে জনা

বউদি। যেন কুয়োয় পড়ে যাওয়া মানুষ স্বজন খুঁজছে। মুহূর্তে সরে আসে ধ্রুব। বউদি কি তাকে দেখল?

যে ছেলেটাকে গোলকিপার ভাবতে ভাল লাগছিল ধ্রুবর, মিশন-স্কুলে রুটিন মাফিক ফুটবল খেললেও, কোনও দিন গোলকিপিং করেনি। কলেজে ওঠার পর পা দেয়নি ফুটবলে। ছেলেটার নাম কাজল। বলতে গেলে, এলাকায় সে নতুন। যদিও এই মজিদপুরেই তাদের আদিবাড়ি। তার জন্মের পর বাবা এখান থেকে কলকাতায় চলে যান। কিছুদিন ভাড়াবাড়িতে থাকার পর স্বীয় ক্ষমতায় টালিগঞ্জে বাড়ি করেন। সেই বাড়িতেই বড় হয়েছে কাজল। এর মাঝে অবশ্য অনেকগুলো বছর কেটেছে বাঁকুড়ার এক মিশন-স্কুলে।

গ্রাজুয়েশনের পর মাস দুয়েক হল কাজল তাদের এখানকার বাড়িতে এসে উঠেছে। পুকুর, বাগান ছেড়েও ছ'কাঠার ওপর বিশাল বাড়ি। অনেক ঘর, লম্বা দালান, বৈঠকখানা ঘরটাকে কিছুতেই ড্রয়িং রুম বলে চালানো যাবে না। সেই বাড়িতে এখন কেবলমাত্র কাকার ফ্যামিলি থাকে। কাকা-কাকির তত্ত্বাবধানে কাজল এখন বাড়ির দোতলায়। সেই ঘরটাতেই, যেখানে একসময় তার বাবা-মা থাকত।

কলকাতার স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে কাজল হঠাৎ কেন এখানে চলে এল, বাবা বা কাকা কারও কাছেই পরিষ্কার নয়। কাজলকে জিজ্ঞেস করলে দায়সারা উত্তর দিয়েছে। যেহেতু সে এখন অ্যাডাল্ট, বড়রা আর ঘাঁটায়নি। এখানে আসার একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে আছে কাজলের। বলা যেতে পারে আত্মাবিষ্কারের তাগিদেই সে মজিদপুরে এসেছে। এখানকার অজানা অচেনা রাস্তায় সে একা একা ঘুরে বেড়ায়। যা সে খুঁজছে, না পেলেও জায়গাটা তার ভাল লেগে গেছে। এই অঞ্চলটার বিশেষত্ব হল, একে ঠিক শহর বলা যায় না, গ্রাম তো নয়ই। আবার মফস্‌সলও নয়। এলাকা জুড়ে উদাসীন পরিকল্পনার ছাপ। এই উদাসীনতার ভেতর এক ধরনের বিশ্বস্ত আত্মীয়তা খুঁজে পায় কাজল।

গভীর অভিমান অথবা পরিস্থিতির চাপে বাবা সেই যে মজিদপুরে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, আর কখনও আসেনি। ফলে কাজলেরও আসা হয়নি। এখন সে কাকার সঙ্গে ঘুরে দেখে নিয়েছে, বাবা-কাকাদের স্কুল, খেলার মাঠ। কোন পুকুরে সাঁতার কাটত কাকারা। সব নাকি আগের মতোই আছে। কিন্তু কাজল যা খুঁজছে, জিজ্ঞেস করতে পারেনি কাকাকে। এটা তার ব্যক্তিগত অভিযান। পরিবারের সাহায্য ছাড়াই একদিন নিশ্চয়ই সে পেয়ে যাবে। সময় হয়তো একটু লাগবে। তাই

কাছাকাছি বর্ধমান ইউনিভারসিটিতে ভর্তি পর্যন্ত হয়ে গেছে। এখনও ক্লাস শুরু হয়নি। বাবা যখন এ বাড়িতে ফোন করে, সব শেষে একবার বলবেই, এত বড় একটা ডিসিশন নিলে। কোর্সের মাঝপথে ফিরে আসবে না তো? বছরগুলো মিছিমিছি নষ্ট হবে।

প্রতিবারই কাজল বলেছে, হবে না বাবা। তুমি নিশ্চিন্তে থাক।

সেই বিশ্বাসটায় আজ বড় একটা ধাক্কা লেগেছে। রোগা মহিলার কবজির স্পর্শটা এখনও লেগে রয়েছে হাতের তালুতে। এই প্রথম আত্মহননে উদ্যত কাউকে দেখল কাজল। মৃত্যুর প্রতি কী উদগ্র বাসনা মহিলাটির। কেন মরতে যাচ্ছিলেন তিনি? জানার ভীষণ ইচ্ছে থাকলেও অকুস্থল থেকে সরে আসতে বাধ্য হয় কাজল। সবাই কেমন যেন হামলে পড়েছিল মহিলা আর তার ওপর। ঘটনাটা প্রত্যক্ষদর্শীদের আজ সারাদিনের আলোচনার খোরাক।

বহু মানুষই অশেষ দুঃখকষ্ট সহ্য করে বেঁচে থাকে। কেউ কেউ পারে না। অনায়াসে দৌড়ে যায় মৃত্যুর মুখে। তার মানে কি বাঁচতে চাওয়া, না চাওয়া, দুটো ইচ্ছেই মন্ত্রণার মতো পৃথিবীর আলো বাতাসে মিশে থাকে? কখন যে কোনটা, কার ওপর ভর করে!

প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে এতক্ষণ এসব ভাবতে-ভাবতেই হেঁটে আসছিল কাজল। মজিদপুরের আলো বাতাস থেকে দুটো ইচ্ছেকে আলাদা করার জন্যই যেন মুখটা তোলে। রাস্তার ওপারে প্রাক স্বাধীনতা আমলের একতলা বাড়ি। ওটা এখন পোস্টাফিস। পাশে সিগারেট-গুমটি। মজিদপুরের ম্যাপ ধরে হাঁটতে হাঁটতে কাজল সপ্তাহে তিনদিন এই সময়টা নিজের উদ্দেশ্যের বাইরে চলে যায়। ওই সিগারেট-গুমটির সামনে দাঁড়িয়ে কিং সাইজ সিগারেট খায় তাড়িয়ে তাড়িয়ে। বাড়ি থেকে এত দূরে এসে লুকিয়ে সিগারেট খাওয়ার বয়স তার পেরিয়ে গেছে। তেমনভাবে সিগারেটের নেশাও তার নেই। আসল কারণ অন্য।

একটি মেয়েকে দেখার জন্যেই সোম, বুধ, শুক্র ওখানে গিয়ে দাঁড়ায় সে। মেয়েটি সম্ভবত টিউশনি অথবা কম্পিউটার শিখতে যায়, নাকি ফেরে? কাজল কখনও ফলো করে না। গুমটির সামনে দাঁড়িয়ে মিনিট খানেক মেয়েটাকে দেখলেই তার চলে। উলটোদিকে বিডিও অফিসের সামনে ঝাঁকালো রাধাচূড়া গাছ। এবারে বোধহয় উদ্বৃত্ত ফুল এসেছে তাব, গাছতলা সমান হলুদ। সপ্তাহে তিনদিন সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ মেয়েটা ওখানে এসে, ব্যাগ কাঁধ বদল করতে করতে গুমটির দিকে একবার তাকায়। কাজল স্পষ্ট দেখতে পায়, মেয়েটার শরীর থেকে অদ্ভুত একটা নীল আভা বেরোচ্ছে। কেন সে এই আভাটা দেখতে পায়,

জানে না কাজল। গাছতলা থেকে মেয়েটা সরে গেলেই আভাটা মিলিয়ে যায়। নানান ভাবে কারণটা খোঁজার চেষ্টা করেছে, হয়তো হলুদ ফুলের ওপর গোলাপি ফর্সা মেয়েটা এসে দাঁড়ায় বলেই ক্ষণিকের দৃষ্টি বিভ্রম হয়। অথবা মেয়েটার নামের মধ্যে কোথাও যেন নীলের অনুষঙ্গ আছে। আইরিন! হলুদ গাছের নীচে এসে দাঁড়ালেই নামটা বেশি করে মনে পড়ে কাজলের।

মেয়েটির থেকেও গোটা দৃশ্যটা মহার্ঘ হয়ে যায়। সেই টানেই এখানে আসে কাজল। বাইশ বছর জীবনের সংগ্রহ বলতে বেশ কিছু মোহময় দৃশ্য। তাদের আয়ু খুব সীমিত। যেমন গ্রীষ্ম উতরে গেলে রাধাচূড়ায় ফুল থাকবে না, তখন কি আর আইরিনের গা থেকে সেই অপূর্ব রং বিচ্ছুরিত হবে। সেই কারণেই আইরিনকে দেখে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উদ্যোগ নেয়নি কাজল। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার, আইরিনের সঙ্গে তার প্রথম দেখায় আলাপ হলেও, সেটাকে এগোতে দেয়নি কাজল নিজেই।

—আজ একটু দেরি হল মনে হচ্ছে।

দোকানির কথায় ঘোর ভাঙে কাজলের। কখন যেন চলে এসেছে গুমটির সামনে। মাঝবয়সি দোকানি প্রথমবার প্রয়োজনের বাইরে কথা বলল। কাজল আশঙ্কা করছিলই, দোকানদার নিশ্চয়ই আন্দাজ করছে তার এখানে দাঁড়ানোর মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ দৃশ্যটার আয়ু কমে আসছে। এই একান্ত অনুভূতির মধ্যে কারও ইন্টারফিয়ারেন্স সহ্য করতে পারে না কাজল।

কিং সাইজ এগিয়ে দিয়ে আরও একটা অসহ্য কথা বলে দোকানি, আমি দেখেছি। এখনও যায়নি।

মাথা যথেষ্ট গরম হয়ে গেলেও শান্তভাবে সিগারেট নিয়ে, ধরায় কাজল। টাকা এগিয়ে দিয়ে ঠিক করে এক্ষুনি সে এখান থেকে চলে যাবে। প্ল্যাটফর্মের ঘটনায় এমনিতেই মনটা তেতো হয়ে আছে, তার ওপর দোকানির ওস্তাদি। পয়সা ফেরত নিয়ে ঘুরতেই দেখে, সে আসছে।

পা থেমে যায় কাজলের। ধবধবে সালোয়ার-কামিজ পরেছে আজ। নাচ জানে বলেই হয়তো মেয়েটার স্টেপিং এত মার্জিত, ছন্দোবন্ধ। আইরিন গাছতলায় এসে দাঁড়াতেই কাজল টের পায়, মনের তেতো ভাবটা ক্রমশ কেটে যাচ্ছে তার।

কিন্তু এ কী, গাছতলায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল কেন আইরিন? এই দিকেই তাকিয়ে আছে। সরাসরি কাজলের ওপর দৃষ্টি রেখেছে স্থির। সাদা পোশাক ক্রমশ নীল হয়ে উঠছে। চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে কাজলের।

—তোমাকে ডাকছে। দোকানি বলল পিছন থেকে। বিরক্তির সুরে কাজল বলে, কী করে বুঝলেন?

—ভদ্রলোকের মেয়ে, হাত তুলে ডাকবে নাকি! যাও না।

দোকানি হয়তো ঠিকই বলেছে, কিছু বলার জন্যেই আইরিন এদিক তাকিয়ে আছে। শোভনতার কারণেই এর থেকে বেশি সাহসী হতে পারছে না। এরকম সিচুয়েশনে পুরুষটিরই উদ্যোগ নেওয়া উচিত। কাজল পারছে না। মেয়েটিকে বলার মতো কোনও কথাই তার মধ্যে জমা হয়নি। অথচ কত মানুষ কথা জমা হওয়ার আগেই খরচ করে ফেলে।

আরও একবার ভেতরে-ভেতর চমকে ওঠে কাজল, আইরিন পায়ে পায়ে এদিকেই আসছে। দূরত্ব কমার সঙ্গে-সঙ্গে নিষ্প্রভ হয়ে আসছে আশ্চর্য সেই রং। কাপুরুষের মতো দেখালেও কাজল উলটো পথে পা চালায়।

বেশ খানিকটা হেঁটে আসার পর আলগোছে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে কাজল। মেয়েটা মোটেই আর পেছনে আসছে না। আসার কথাও নয়। বদলে ফুলে ভরা রাধাচূড়া যেন বিদ্রুপ করে হাসছে। দোকানির মতো আইরিনও ধন্ধে পড়ে গেছে নিশ্চয়ই। ওই বয়সি মেয়ের চারপাশে অহরহ বীরপুরুষেরা ঘুরে বেড়ায়। কাজলই একমাত্র ব্যতিক্রম। আইরিনের সঙ্গে আলাপের দিন একই রকম অপ্রস্তুত হয়েছিল কাজল। গত রবীন্দ্র জয়ন্তীতে কাকিদের ক্লাবের অনুষ্ঠান, খোলা মাঠে স্টেজ বেঁধে। সামনের সারির ডেকরেটরের সোফায় কাকার সঙ্গে বসেছিল কাজল। একই সারিতে এলাকার মান্যগণ্য লোক। এসডিও, বিডিও, এসডিপিও। কাকা সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। তারপর থেকেই খুব আড়ষ্ট হয়ে বসেছিল কাজল। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর সামনে এই আড়ষ্টতা তার হয়তো আমরণ রয়ে যাবে।

অনুষ্ঠান শুরু হতে ধীরে ধীরে সহজ হয় কাজল। তার ছোট ছোট দুই খুড়তুতো ভাই-বোন ডুয়েট আবৃত্তি করল। তারপর গান। সবশেষে নৃত্যনাট্য। চিত্রাঙ্গদা। মিশন স্কুলে পড়ার দরুন অনেক কিছুর মতো চিত্রাঙ্গদাও মিস করে গেছে কাজল। শাপমোচন, বাল্মীকি প্রতিভা কলেজে উঠে দেখেছে। চিত্রাঙ্গদার গল্পটা বাবা বলেছিল। গানগুলো শোনা ছিল ক্যাসেট থেকে। সুরূপাকে চাক্ষুষ করল কাকিদের ফাংশানে। কল্পনা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল মেয়েটি। নাচের কিছু না বুঝলেও, কাজল মেয়েটার সমস্ত মুদ্রা, আঙ্গিক পড়ে নিতে পারছিল। যে-কোনও খরাক্লিষ্ট গ্রামের স্বপ্নবৃষ্টির মতোই পদচারণ মেয়েটির। সে যে সঙ্গিনীদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে, বুঝে নিতে অসুবিধে হয়নি। কতই বা বয়স, মাধ্যমিক দিয়েছে কি দেয়নি!

এর মধ্যেই কী পরিণত অভিব্যক্তি। নাচের মাধ্যমেই নিজের রূপকে ছাড়িয়ে অপরূপ হয়ে উঠেছিল আইরিন।

নৃত্যনাট্য শেষ হওয়ার পরেও কাজলের কানে বাজছিল, কোন ছলনা এ যে নিয়েছে আকার/ এর কাছে মানিবে কি হার/ ঠিক ঠিক ঠিক... গানটা কী যেন বলছে কাজলকে। খানিকটা বিহ্বলের মতো গ্রিনরুমের ঢুকে গিয়েছিল কাজল। ভেবেছিল, মেয়েটাকে ঘিরে নিশ্চয়ই খুব ভিড় থাকবে। ছিল না। এক একাই নিরাভরণ হচ্ছিল আইরিন। অথচ একফোঁটা সৌন্দর্য কমছিল না। আবেগতাড়িত কাজল বলে, দারুণ করেছ তুমি।

কানের দুল খুলতে খুলতে আইরিন বলেছিল, থ্যাঙ্ক ইউ। আর কিছু?

কাজল নার্ভাস হয়ে বলে, না, আর কিছু মানে...

—এখন যান। মেয়েরা ড্রেস চেঞ্জ করবে।

নিজের বোকামিতে লজ্জা পেয়েছিল কাজল। তাড়াতাড়ি বাইরে চলে আসে। পরে আর কাকির কাছে মেয়েটির সম্পর্কে কিছু জানতে চায়নি। সেই নাচ দেখার অভিজ্ঞতাটা বিরল মুহূর্ত বলেই গণ্য করেছে।

তার বেশ কিছুদিন পর হঠাৎ এক সকালে এই রাস্তায় দেখা হয়ে যায়। তখন আইরিনের শরীরে অলংকার বলতে সেই নীল আলো।

আর কোনও দিনই সিগারেট গুমটির সামনে দাঁড়াবে না কাজল। মজিদপুরে কতদিন থাকতে পারবে কে জানে! যে কাজে আসা, এখনও এতটুকু এগোতে পারেনি। এর মধ্যেই মজিদপুর তাকে তাড়াতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আজ সকালে এখানকার একজন আত্মহত্যা করতে গিয়ে বেঁচে গেছে। একটু আগে একটা মেয়ে তার নীল রং হারিয়ে ফেলল। কাজলের ভাললাগা দৃশ্যগুলোর আয়ু এত কম!

যখনই কোনও অপারেশনে যায় ধ্রুব, জীবনের চূড়ান্ত ব্যর্থতার ঘটনাটা মনের চোখে দেখতে থাকে। এটাই নিজেকে মোটিভেট করার সেরা উপায়। কয়েকবার দেখার পরই শক্ত হয় চোয়াল, দৃষ্টি স্থির। নির্মম মুখাবয়ব নিয়ে পার্টির সামনে দাঁড়ায়।

আজ দলের সঙ্গে হেঁটে যেতে যেতে কিছুতেই মনটাকে বেঁধে রাখতে পারছে না, জনাদার বউকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসা তার উচিত ছিল। সুইসাইড ফেল মেয়ে লগ্নভ্রষ্টার মতোই অভিশপ্ত। ঘটনাটা ধীরে ধীরে পড়ার সবাই জানবে। চাপা গলায় আলোচনা করবে নিজেদের মধ্যে। কেউ কেউ হয়তো জনা বউদির সাহসের জন্য বাহবাও দেবে। কেন না তারা একই মতলব মাথায় নিয়ে ঘুরলেও, মুখোমুখি হতে পারেনি মৃত্যুর।

ব্যর্থ হলেও মেয়ে হয়ে জনা বউদি সেই ট্রাইটা নিল। কিছুদিন আগে পাড়ার আর একটা মেয়ে ধ্রুবকে বলেছিল, এখান থেকে পালাই চলো। এভাবে চলতে থাকলে গলায় দড়ি দিতে হবে আমাদের।

মেয়েটার জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে দেখে, ধ্রুব আশ্চর্য হয়। ধ্রুবর ব্যক্তিজীবন ধসে যাওয়ার পেছনে মেয়েটার ভূমিকা অনেকটাই। সবকিছু বাদ দিয়ে পাড়াটা এই মুহূর্তে ভীষণ টানছে ধ্রুবকে। কিন্তু উপায় নেই যাওয়ার। সে এখন দলের একজন। কারখানায় ইউনিয়ন করতে গিয়ে শিখেছে, দলের মতই শ্রমিকের মত হওয়া উচিত।

এই পাঁচজনের গ্রুপটায় ধ্রুব বয়সে অনেকটা বড়। বাকি চ্যাংড়াগুলো আজ বেশ স্ফূর্তিতে। নিজেদের মধ্যে হা হা হি হি করছে। আজকের অপারেশনটায় তুলনামূলক ঝুঁকি কম। তবু সর্তক থাকাই ভাল, বড় পুলিশের নজর পড়েছে এলাকায়।

হাটতলা পেরোল ধ্রুবরা। রেললাইনের এপারটা পঞ্চায়েত এলাকা। জনবসতি কম। মিনিট কুড়ি হাঁটলেই মাঠ, খাল, বিল। কোনও গ্রুপেরই এলাকাটা সেভাবে দখলে নেই। কামাইয়ের ব্যাপারে একদম শুখা জায়গা। কে জানত ওখানকার একটা পোড়ো বাড়িতে শুটিং হবে। কাল ঠেকে যেতেই সোনা বলল, পাল বাড়িতে কাল থেকে শুটিং শুরু হচ্ছে। চারটে ছেলে নিয়ে তুমি চলে যাও।

আমিই যেতাম। হঠাৎ একটা কাজ পড়ে গেছে। ছোট কাজ তুমি ইজিলি সামলে নিতে পারবে।

ধ্রুব অবাক হয়ে তাকিয়েছিল সোনার দিকে। সোনা তাকে অপারেশন লিড করতে বলছে! এরকম কথা কিন্তু ছিল না। অ্যাকাডেমিক পার্সন হিসেবে ধ্রুব জয়েন করেছিল সোনার গ্রুপে। তাও সে নিজে আসেনি। সোনা তাকে রিকোয়েস্ট করে নিয়ে আসে। ঘটনাটা বেশিদিনের নয়। ডাক্তার রক্ষিতের এক্সরে ক্লিনিক-কাম-পাথোলজিক্যাল ল্যাবের উদ্বোধন ছিল সেদিন। সারাদিনে মাত্র চার প্যাকেট ডিটারজেন্ট পাউডার বিক্রি করতে পারা ধ্রুব, ক্লান্ত পদক্ষেপে বাড়ি ফিরছিল। তখনই চোখে পড়ে রক্ষিতের গ্লো-সাইন। অনেকদিন পর মজিদপুরে এতবড় আলোকোজ্জ্বল বোর্ড লাগাল কেউ। মুগ্ধতার মধ্যেই খেয়াল করে, ভেতরে একটা গোলমাল হচ্ছে। বেশ কিছু হুপ্লাবাজ ছেলের ভিড়। রাত তখন প্রায় সাড়ে দশটা। ছেলেগুলো নিশ্চয়ই অভ্যাগত নয়। নেহাতই কৌতূহল বশে দলটার পেছনের গিয়ে দাঁড়ায় ধ্রুব।

কাউন্টারের ওপারে ভীত, সন্ত্রস্ত কিছু মহিলা ও পুরুষ। ডাক্তার রক্ষিত একটা

চেয়ারে হাতে মাথা নামিয়ে বসে আছে। কোনও একটা ছেলে তাড়া দেয়, কী হল, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি! তাড়াতাড়ি খালাস করুন।

মুখ তোলেন রক্ষিত। চোখে হতাশ দৃষ্টি। বলেন, বললাম তো, তোমাদের যা ইচ্ছে করে নাও। আমি একটা টাকাও দিতে পারব না।

ধ্রুব বুঝতে পারে তোলাবাজি কেস, ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং। শুনেছে, চোখের সামনে কোনও দিন দেখেনি। পরিস্থিতির ওপর মনোযোগ দেয় ধ্রুব। ছেলেগুলো কী করবে, ভেবে উঠতে পারছে না। তারা তো কিছু করতে আসেনি। করা মানেই বিস্তর ঝামেলা। টাকা নিতেই এসেছিল। হুমকি দিয়ে চলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। রক্ষিত ঘোড়েল লোক। প্র্যাকটিস করেই সলিড কামায়। দুটো নার্সিং হোমের সঙ্গে অ্যাটাচড। তার ওপর এই ব্যবসা। শালা, এই মরা জায়গাতেও দেদার কামিয়ে যাচ্ছে। মনে মনে তোলাবাজদের পক্ষ নিয়ে ফেলছিল ধ্রুব। ওদের দলের আর একজন বলল, ঠিক আছে, আমরা পাঁচদিন পর। ঠিক এই সময় আসছি। টাকাটা অ্যারেঞ্জ করে রাখবেন।

কান্না চোয়ানো স্বরে ডাক্তার বলে, সময় দিয়ে লাভ নেই ভাই। আমি কোনও টাকাই জোগাড় করতে পারব না। ব্যাঙ্ক লোন করে মেশিন পত্তর কিনেছি। গলা পর্যন্ত ধার। রিস্ক যা নিয়েছি, সবই এলাকার মানুষের জন্য। একটাও ভাল এক্সরে মেশিন, ওয়েল ইকুইপড ল্যাব ছিল না এলাকায়।

হাসি পেয়েছিল ধ্রুবর, রক্ত চোষার যন্ত্র বসিয়ে, শালা মহান সাজছে! ডাক্তার তখনও বলে যাচ্ছে, এলাকার মানুষের স্বার্থে কাজ করব। আবার তোমাদেরও টাকা দেব, তা কী করে হয়!

ডাক্তারের বাক্‌মাধুর্যের সামনে সোনাদের দলটাকে বেশ অসহায় দেখাচ্ছিল। তখনই ধ্রুব বলে ওঠে, আপনি তা হলে এক কাজ করুন, আমাদের দলের চারটে ছেলেকে কাজে নিন।

সোনাদের গ্রুপ অবাক হয়ে তাদের বিরল হিতৈষীর দিকে তাকায়। ধ্রুবকে জায়গা ছেড়ে দেয় ডাক্তারের মুখোমুখি হতে। রক্ষিত বলেন, এই কাজে ক'টা আর লোক লাগে! তা ছাড়া আমার সব লোক নেওয়া হয়ে গেছে।

—বাঃ, আপনি আমাদের ক'টা বেকার ছেলেকে চাকরিও দেবেন না, টাকাও না। আমাদের এলাকাতে বসে শুধু ক্ষীর খেয়ে যাবেন! —বক্স থেকে বলটা স্ট্রাইকার জোনে ভলি করেছিল ধ্রুব। বিচ্ছিরিভাবে ডিফেন্স করে রক্ষিত, মুখ সামলে কথা বলবে। আমি কি তোমাদের মতো মস্তানি করে টাকা রোজগার করি। আমার আর্নিং-এর পেছনে পড়াশোনা, ভাল ফ্যামিলি, সৎ চেষ্টা লাগে।

বল রেঞ্জে চলে আসতেই সোনা শট নেয়, চোপ শালা, বেশি বকবি তো ইঞ্চি ভিড়িয়ে দেব।

ডাক্তারের গলকম্বল খামচে ধরেছিলে সোনা। একহাতে সদ্য ঘুম ভাঙা ন'ইঞ্চি ছুরি। ততক্ষণে ডাক্তার একদম নার্ভাস। ধ্রুব এসে কলার ছাড়ায়। ডাক্তারকে বলে, কেন মিছিমিছি প্রেশার বাড়াচ্ছেন! ফিজ লাগবে না বলে নাকি? চলুন, এসব কথা এখানে হয় না, চেম্বারে চলুন। যা হোক একটা নেগোসিয়েশান করা যাবে।

চেম্বারে ঢোকার আগে ধ্রুবকে সাইড মারতে দেখে সোনা ডাকল, কী হল ওস্তাদ, চলে এসো। পুজোটা শেষ করে দিয়ে যাও।

—না রে ভাই, বাড়িতে একটা কাজ আছে। বলে জায়গা ছাড়ে ধ্রুব। সোনাদের দলটা তার অচেনা, কতটা দাগি কে জানে!

কিন্তু ধ্রুবকে ছাড়ে না সোনারা। দু'দিন পর যোগেনের সেলুনে চুল কাটছে ধ্রুব, আয়না দিয়ে দেখে, দোকানের বাইরে বেশ ক'টা চামচা নিয়ে সোনা এসে দাঁড়াল। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল ধ্রুব। আয়নাতেই দেখতে পেল, সোনা হাতের ইঙ্গিতে বলছে, চুলটা কেটে নাও আমরা দাঁড়িয়ে আছি।

চুল কেটে দোকানের বাইরে আসে ধ্রুব। মেয়ের বাপের নগদ দেওয়ার ভঙ্গিতে সোনা বেশ কিছু নোট ধ্রুবর মুঠোয় ধরিয়ে দেয়। বলে, তোমার শেয়ার। সেদিন তুমি না থাকলে মক্ষিচুষ ডাক্তারের থেকে একটা কয়েনও বার করা যেত না।

সোনার চ্যালারা দাঁত বার করে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। ধ্রুবর হতভম্ব অবস্থা। না খেটেই একমুঠো টাকা! মুহূর্তে জন্য ন্যায় অন্যায় বোধটা মাথা চাগাড় দিয়েছিল ধ্রুবর। রক্ষিতের মুখটা মনে পড়তেই, সব পাপ ধুয়ে গেল। টাকাটা তো আসলে চোরের টাকা। এতে কোনও দোষ হয় না। সোনা বলে, পারলে সন্ধের দিকে আমাদের ঠেকে চলে এসো না। শীলবাজারে বকুলদির হোমিওপ্যাথি ওযুধের দোকান। পেছনের চেম্বারে আমরা বসি। তোমার মতো কথা বলতে পারা একটা লোক আমাদের খুব দরকার। বুঝতেই তো পারছ, এই সব ফাইভ পাশ গ্রাজুয়েটদের নিয়ে আমার কারবার। সব ক'টা গাড়ল। কেলাকেলি ছাড়া কিছু বোঝে না।

চ্যালারা এবার শব্দ করে হেসে ওঠে। সোনার বিদ্রুপটা বেশ উপভোগ করছে। একদিনের ঘটনাতেই ধ্রুব বুঝেছে, সোনাও গাড়ল শ্রেণীর। কথাবার্তা তারও খুব একটা আসে না। তবে চেহারায় একটা পালিশ আছে, বড়লোকের বখে যাওয়া ছেলেদের যেটা থাকে।

সোনার পরের কথাটায় একটু অবাক হয়ে ধ্রুব, তোমার ফ্যাক্টরি তো বন্ধ। হাতে কাজ কারবার নেই। চলে এসো, খুচখাচ কামাই হয়ে যাবে। চলি।

দলটার চলে যাওয়া দিকে তাকিয়ে ধ্রুব ভাবে, ওপর থেকে যতটা মাথাহীন মনে হয় এদের, আসলে ততটা নয়। এদেরও একটা নেটওয়ার্ক আছে। ধ্রুবর সম্বন্ধে সমস্ত খোঁজখবর নিয়েছে ইতিমধ্যেই। তারপর দলে ভেড়ার অফার করছে।

নেহাতই সৌজন্য রক্ষার কারণে চারদিন পর ধ্রুব ওদের ঠেকে গিয়েছিল। ওরা সেদিন যথেষ্ট খাতির করে। এবং কথা দেয়, ধ্রুবকে কোনওদিন যন্তর ধরতে হবে না। অ্যাকশানের সময় সবার পেছনে থাকলেও চলবে। তার কাজ শুধু পার্টির সঙ্গে কথা বলা। আর ধ্রুব যদি চায় ওদের সঙ্গে 'টানা' কাজেও থাকতে পারে। 'টানা' কাজ মানে প্রায় চোখের সামনে চুরি। কোনও প্রমোটার হয়তো বিল্ডিং মেটিরিয়াল ফেলেছে, কিছুটা তুলে নিয়ে আসা। পুরনো বাড়ি ভাঙার কিছু স্মৃতি স্মারক তুলে আনা। হপ্তা ঘুরতে না ঘুরতে সেগুলো অবশ্য বিক্রি করে দেওয়া হয়। তারপর দিল্লি রোডে দাঁড়িয়ে ট্রাক থেকে কয়লা নামানো... এরকম নানাবিধ কাজ। একমাত্র সবজি বাজারে তোলা আদায়ের কাজটা পছন্দ করে না সোনা। প্রেস্টিজে লাগে। ওর মামা বারো নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার। মিউনিসিপ্যালটির চেয়ারম্যানের সঙ্গে সোনার ভালই চেনাজানা। থানাও মোটামুটি সাইজ করা আছে। খুবই নিরুদ্বেগে গ্রুপটা চালায় সোনা। ধ্রুব এসে যাওয়াতে দলটার মধ্যে সফিস্টিকেশনও এসেছে। তা হলে আজ কেন অপারেশনে এল না সোনা! ক'দিন ধরেই ওকে একটু নিস্প্রভ লাগছে। কী যেন চিন্তা করছে সবসময়। ধ্রুবর আশঙ্কা হচ্ছে, সোনার কোনও মেজর কানেকশন কাজ করছে না। তাই হয়তো আড়াল চাইছে সোনা। একই সঙ্গে ধ্রুব বুঝতে পারছে, বেইমানির টাকা খেয়ে সেও মোটামুটি বিকিয়ে গেছে সোনার কাছে। না হলে কেন সে বলতে পারল না, আমার তো অপারেশন লিড করার কথা ছিল না সোনার।

পুকুরের ওপারে পালেদের ভাঙাবাড়ি দেখা যাচ্ছে। বাড়ির হাতায় দুটো টাটা সুমো গাড়ি। ইউনিটের কিছু লোক দৌড়দৌড়ি করছে। এ দিকটা জনবসত নেই বলে শুটিং ঘিরে তেমন ভিড় নেই। জেনারেটরের একঘেয়ে আওয়াজ ভেসে আসছে।

পুকুরের গা দিয়ে রাস্তা। দলের সঙ্গে হেঁটে যেতে যেতে ধ্রুবর হঠাৎ মনে হয়, আজকের অপারেশনে কোনও বিপদ লুকিয়ে নেই তো? কেমন যেন নার্ভাস লাগতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে জীবনের চূড়ান্ত ব্যর্থতার ঘটনাটা মনে করতে থাকে।

বাড়ির ভাঙা গেটে দাঁড়িয়ে দেবা বলে, এ কী রে ভাই, এ তো ফিস্ট পার্টির থেকেও ছোট পার্টি। কী সিনেমা হচ্ছে, এই ক'টা লোকে!

—তুই কি ভেবেছিলি মুম্বাই থেকে শাহরুখ এসেছে শুটিং করতে? ফুট কাটে ফুচা। হালকা ধমকের সুরে ধ্রুব বলে, চুপ কর। সিরিয়াস হ। সব সময় চ্যাংড়ামি করলে চলে না।

পাঁচজনের দলটি সিরিয়াস মুখ করে শুটিং চত্বরে পৌঁছে যায়। বাড়ির বারান্দায় সম্ভবত শট নেওয়া হবে। লাইট, ক্যামেরা সেট হচ্ছে।

একটা ছটফটে প্রোডাকশনের ছেলেকে বেছে নিয়ে ধ্রুব ডাকে, ভাইটি, একবারটি শুনবে।

এক হাতে গুচ্ছের কাগজ নিয়ে, একটু বেঁকে সামনে দাঁড়ায় ছেলেটা, বলুন, কী ব্যাপার?

—তোমাদের ডিরেকটার সাহেবকে একবার ডেকে দেবে ভাই।

জিনসের ওপর পাঞ্জাবি, কাটাকাটা চোখ মুখ। চর্বিহীন লম্বা চেহারার ধ্রুবকে দেখে, ছেলেটি পাশে দাঁড়ানো আর চারটি ছেলের সঙ্গে মেলাতে পারে না। তারা কেউ কলার তুলেছে, সোজা টুপি ঘুরিয়ে নিল, কেউবা পা নাচাতে-নাচাতে হাতে বাঁধছে রুমাল, আবার খুলে ফেলছে। দাদাগিরির নানান মুদ্রা। ছেলেটা এবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়। বলে, আমাকেই বলুন না, তাঁকে কী জন্য দরকার?

বিনয়ের কাঁঠালগাছ হয়ে ধ্রুব বলে, তাঁকে গিয়ে বলো, আমরা তোলা তুলতে এসেছি।

শুভদৃষ্টির সময় বউ বদল হয়েছে দেখেও, ছেলেটা বোধহয় এত আশ্চর্য হত না। হাঁ মুখ বন্ধ করতে ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়েই আছে।

—কী হল ভাই, যাও।

ঘোর কাটিয়ে ছেলেটা ছুটল ডিরেকটারকে ডাকতে। আলগা ভঙ্গিতে চারপাশে চোখ বোলায় ধ্রুব। ছেলেটা ইউনিটে গিয়ে কথাটা ফেলতেই, কর্মব্যস্ত লোকগুলো একটু থমকে গেছে। সবার মুখেই ফুটে উঠেছে অনিশ্চয়তা। এইমাত্র তারা জানতে পেরেছে, ধ্রুবদের আগমনের কারণ। ঠিক এরকমই হত, যখন র-মেটেরিয়ালের বদলে ধ্রুবদের ফ্যাক্টরিতে ম্যানেজমেন্টের লোক আসত। ইউনিয়ন লিডারদের সঙ্গে ক্লোজডোর মিটিঙে বসতেন ওঁরা। লেবারদের মুখ থমথমে।... ডিরেকটর আসছে না কেন? গোল হয়ে সবাই আলোচনা করছে। চার-পাঁচটা দাঁড়িগোফওলা আঁতেলমার্কা লোকের মধ্যে কে যে ডিরেকটার বোঝাই যাচ্ছে না।

—ধ্রুবদা, হিরোইন কোথায়? একটাও ভাল মেয়ে দেখছি না। কানের পাশে চাপা গলায় বলে দেবা।

ধ্রুব কোনও উত্তর দেয় না। ভেতর ভেতর একটা টেনশন হচ্ছে। লিডার হিসেবে এটা তার প্রথম কাজ। সব ভালয় ভালয় উতরোলে হয়। দেবা ছাড়া অন্য তিনটে ছেলে প্যানিক তৈরি করতে শুরু করেছে, এগুলো অপারেশনের প্রাথমিক অঙ্গ। ফুচা চলে গেছে ক্যামেরার একদম সামনে। এমন খুঁটিয়ে দেখছে, যেন একটু বুঝিয়ে দিলেই অপারেট করে দেবে। চেয়ারে বসা দামি বিউটি পারলার চর্চিত শ্যামলা সুন্দরীকে একজন কোল্ডড্রিঙ্ক দিতে এসেছিল, কানাই কেড়ে নিয়ে চালান করল নিজের গলায়। বাচ্চু একটা বুড়ো লোককে চেয়ার থেকে তুলে দিয়ে, চেয়ারটা নিয়ে আসছে ধ্রুবর জন্য। কিন্তু ডিরেকটার আসছে না কেন এখনও।

ধ্রুব চেয়ারে বসতেই দেখে, প্রোডাকশনের ছেলেটা একজনকে সঙ্গে নিয়ে আসছে। এটাই তা হলে ডিরেকটার। দেখে বোঝার উপায় নেই। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির বড় সাহেবের মতো চেহারা। সেল ফোনে কথা বলতে বলতে আসছে। ধ্রুবরই বয়সি।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়তে যাচ্ছিল ধ্রুব। খেয়াল হয় এটা রং জেসচার। ডিরেকটার সামনে এসে দাঁড়াতেই কে যেন চেয়ার এগিয়ে দেয়। সেল ফোন অফ করে চেয়ারে বসে ডিরেকটার, বলুন, আপনাদের বক্তব্যটা কী?

পরিচালকের পরিশীলিত সাহেবি আচরণে ধ্রুবর মনে হয় যেন মেন অফিস থেকে অফিসার এসেছে, লেবারদের সমস্যা জানতে। মনে মনে ধ্রুব বলে, সমস্যার কী শেষ আছে স্যার? এতদিন ধরে কারখানা বন্ধ। বউ পালিয়ে গেছে। মেয়েটা এখনও অবধি আছে ঠিকই, পরে কী হবে জানি না। স্বর্গত পিতার প্রভিডেন্ট ফান্ডের ইন্টারেস্টে আমি, মা, মেয়ে খাই। সুদের হার কীরকম কমে যাচ্ছে, আপনার অজানা নয়....

ধ্রুব কিছুই বলছে না দেখে ডিরেকটারের অস্বস্তি হয়। বলে, আপনাদের ব্যাপারটা বলুন প্লিজ।

পাশ থেকে ফুচা বলে, কেন, আপনাকে কিছু বলেনি, এমনি এমনি ডেকে নিয়ে এল!

—বলেছে। কিন্তু আপনাদের ডিমান্ডটা কত?

—কুড়ি হাজার। ডিমান্ড নয়, ভাড়া। আমাদের এলাকার রেন্ট।

ফুচার কথা শুনে বেশ চমকায় ডিরেকটার। তারপর ধ্রুবকে বোঝাতে শুরু করে, দেখুন ভাই, আমরা একটা টিভি চ্যানেলের হয়ে সিনেমাটা করছি। ওরা যে

টাইট বাজেট দিয়েছে, আপনাদের স্পেয়ার করার মতো টাকা নেই। তার ওপর পাই-পয়সার হিসেব দিতে হবে চ্যানেলকে।

নিজের মধ্যে ফিরে ধ্রুব বলে, সে যাই হোক, একটা গ্রস অ্যামাউন্ট যখন পেয়েছেন, কিছু সাইড আপনারা করবেনই। তার থেকেই দিন। দু' তরফেরই রইল।

—আপনাকে বললে বিশ্বাস করবেন কি না জানি না। আপনারা যত টাকা ডিমান্ড করছেন, আমি নিজেই এই ফিল্মটা ডিরেক্ট করে অত টাকা পাব না। ইন্ডাস্ট্রি ইজ নাউ সিংকিং। খুবই খারাপ সিচুয়েশন।

ধ্রুব ভাবে, তাই তো, এটাও একটা ইন্ডাস্ট্রি। তবে ধ্রুবদের কারখানার মতো অবস্থা নয়। লোকে তো হামলে পড়ে টিভি দেখে। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে ধ্রুব। বলে, ঠিক আছে। টাকা যখন দেবেন না, আপনারা আপনাদের মতো কাজ করে যান। আমরা যা করার করব। পরে কিন্তু...

কথা শেষ হওয়ার আগেই সজোরে ছুটে-আসা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। ঘাড় ঘোরাতেই ধ্রুব দেখে, পুলিশ জিপ। কঁকিয়ে উঠল গাড়ির ব্রেক। বাকি চার সাকরেদ পলকে উধাও। এরকম পরিস্থিতিতে আগেও পড়েছে ওরা। ধ্রুবর এই প্রথম। সেও পালাতে পারত। ডিরেকটার কাঁধটা খামচে ধরে আছে বলেই পারছে না।

জিপ থেকে প্লেন ড্রেসের অফিসার নেমে এলেন। সঙ্গে চার রক্ষী। আগে না দেখলেও ধ্রুব চিনতে পারে, ইনিই নতুন এস ডি পি ও রণজয় দত্ত। সব ধরনের অ্যান্টিসোশালদের মুখে এখন একটাই নাম। চেহারার বর্ণনা তাদের কাছেই পেয়েছে ধ্রুব। ধরা পড়ল এর হাতেই! সোনার ইনফ্লুয়েন্স কি কাজ করবে এত দূর? পরিচালক বোধহয় সেল ফোনে তখন এস ডি পি ও-কেই খবর দিচ্ছিল। তারপরেও ধ্যাস্টামো করল এতক্ষণ ধরে। পুলিশ নিশ্চয়ই বেধড়ক মারবে ধ্রুবকে। সেটা নিয়ে যতটা না ভাবছে ধ্রুব, তার থেকেও বেশি দুশ্চিন্তা হচ্ছে মা-মেয়ের জন্য। ওরা এই প্রথম জানতে পারবে, জমি বাড়ির দালালি, ইটবালি সাপ্লাই এসব মিথ্যে। ধ্রুব আসলে গুন্ডামি করে সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য আনার চেষ্টা করছে। ক'দিন আগে না চাইতেই মেয়েকে দামি ড্রেস কেনার টাকা দিয়েছে ধ্রুব। মাকে নতুন ফ্রেমের চশমা। সে সব যদি ওরা থানায় ফেরত দিতে আসে! আরও কী কী ফেরত দিতে পারে ভাবতে ভাবতেই, অফিসার দালানে উঠে এলেন, কোথায় গেল ছেলেগুলো?

ধ্রুবর অবস্থা খুব কাহিল। ডিরেকটার বলল, ওরা তো আপনার জিপের

আওয়াজ শুনেই পালিয়েছে।

অফিসার জিপের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর ভাবে বলেন, হ্যাঁ, ইঞ্জিনটা এবার করাতে দিতেই হবে।

ধ্রুব নিজের অভিব্যক্তি লুকোতে পারে না। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে পরিচালকের দিকে। পরিচালক খুবই স্বাভাবিক। ধ্রুবর কাঁধে রাখা থাবাটা ক্রমশ আলগা হচ্ছে। দরদর করে ঘামছে ধ্রুব। অফিসারের বোধহয় খটকা লাগে ধ্রুবকে দেখে। দু'পা এগিয়ে এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধ্রুবর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখেন। কী সাংঘাতিক নিষ্ঠুর চাহনি। খাপ খোলা ছুরিও এই দৃষ্টির সামনে ম্লান হয়ে যাবে।

ধ্রুবর চেহারায় এখনও ভদ্রঘরের ছাপ অবশিষ্ট রয়ে গেছে বলেই বোধহয় অফিসার সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছেন না। বিভ্রান্তি কাটাতে পরিচালক ধ্রুবকে আর একটু কাছে নিয়ে অফিসারকে বলে, আমার বন্ধু। এখানেই থাকে। খুব হেল্প করছে আমাদের। ইনফ্যাক্ট, ওই এতক্ষণ ট্যাকল করছিল ছেলেগুলোকে। তারপর তো আপনি এসে গেলেন।

অফিসার এবার নিঃসন্দেহ হলেন। ইউনিটের একজন এসে অফিসারের সামনে কোল্ডড্রিঙ্কের বোতল ধরল। হাতের ইশারায় ফিরিয়ে দিয়ে অফিসার বললেন, কাজ শুরু করতে পেরেছেন?

প্রথম আলাপ হওয়া সেই ছেলেটা এসে বলে, কী করে শুরু করব। ব্যাড এলিমেন্টগুলো এসে এমন ঝামেলা পাকাল... বলতে বলতে ছেলেটা আড়চোখে ধ্রুবর দিকে তাকায়। প্রমাদ গোনে ধ্রুব। অফিসার বলেন, আর কোনও চিন্তা নেই ফ্রিলি কাজ করে যান। সময় করে আমার অফিসে কোনও আইউইটনেস পাঠিয়ে দেবেন। ছেলেগুলোর হুলিয়া জেনে নেব।

ছায়াসঙ্গী সমেত অফিসার জিপে গিয়ে বসেন। ধ্রুবর বুক কাঁপিয়ে জিপ স্টার্ট নেয়। পরিচালক আবার ধ্রুবর মুখোমুখি চেয়ারে। ওদের ঘিরে ভিড়। পরিচালক বলেন, যে যার কাজে যাও। ভিড় হালকা হলেও অভিমানী ছেলেটা হিংসুটে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ধ্রুবর দিকে।

পেনাল্টি শটে গোল-খাওয়া গোলকিপারের মতো বসে আছে ধ্রুব। একটু পরে পরিচালক বলে, কী, আমাকে খুব মহান মনে হচ্ছে তো?

ভাবলেশহীন চেয়ে থাকে ধ্রুব। পজ শেষ করে পরিচালক বলে, তা কিন্তু মোটেই নয়। পুলিশি ঝামেলায় গেলে আমাদের কাজ হেল্ডআপ হত। খরচা বাড়ত সেখানেও। তাই এড়িয়ে গেলাম। এবার আপনার তো কিছু কর্তব্য থাকে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় ধ্রুব। পরিচালক বলে, তেমন কিছুই নয়। আমরা যে

পাঁচছ'দিন শুটিং করব, মাঝে মধ্যে আপনাকে এখানে আসতে হবে। আপনার দায়িত্ব, আর যেন কোনও গ্রুপ আমাদের কাজে ব্যাঘাত না ঘটায়। উই শ্যাল পে ফর দ্যাট।

আপনাদের আর কেউ ডিসটার্ব করবে না। আপনারা এস ডি পি-ওর চেনা। শুকনো গলায় বলে ধ্রুব।

না, তবু আপনি আসবেন। আমাদের কাজে লোকাল সোর্সের দরকার পড়ে। সেটা আপনি পারবেন। আই থিংক ইউ সিম টু বি মিসপ্লেসড। আপনি যেটা পারেন, যেটা করেন না। আমি যেমন প্রথম জীবনে পাইলট হওয়ার ঝোঁকে এয়ার ফোর্সে জয়েন করেছিলাম। একগাদা হার্ড ট্রেনিং-এর পর যখন পাইলটের সিটে বসলাম, আবিষ্কার হল পায়ের লেংথ সাফিসিয়েন্ট নয়। আমাকে অন্য কাজে প্লেস করা হবে। অনেক কায়দা করে পালিয়ে এলাম। এখন অবশ্য অন্য মডেলের প্লেন বেরিয়ে গেছে।

খোশ গল্প শোনার কোনও ইচ্ছে নেই ধ্রবর। সে এখন ছাড়া পেলে বাঁচে। বিরক্তিটা কাজে লাগিয়ে ধ্রুব বলে, আমি কি এবার যেতে পারি?

অন্যমনস্কভাবে ঘাড় হেলায় ডিরেকটর। তারপর বলে, আপনার নামটা কী?

মুহূর্তের মধ্যে ধ্রুব সিদ্ধান্ত নেয় সত্যি নাম বলা যাবে না। বলে, দুলাল। দুলাল মজুমদার।

নামটা আপনি জানালেন। তো নামে কী এসে যায়। দেখুন দুলালবাবু, পরিচালনার সূত্রে অভিনয় আমি ভালই চিনি। আপনি এখানে এসে থেকে অ্যাক্টিং করে যাচ্ছেন। এবং সেটা খুব বাজে হচ্ছে। আপনার হাত ধরেই আন্ডারওয়ার্ল্ডের এলিমেন্টগুলো সারফেসে চলে আসছে। একদিন এর জন্য আপনাকে আক্ষেপ করতে হবে। বিকজ আপনার মূল্যবোধের ভিত তৈরি হয়েছে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত আদর্শে।

ধ্রুব চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। আঁতেল ডিরেকটার কায়দা করে করুণা দেখাচ্ছে। এসব ধ্রুবর সহ্য হয় না। অম্বল হয়। এতদিন কারখানা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে সাহায্য চায়নি।

হ্যাঁ, এবার আপনি যেতে পারেন।

ডিরেকটারের পারমিশন পেতেই ঘুরে যায় ধ্রুব। পলকে চোখ পড়ে শ্যামলা সুন্দরীর ওপর। কানাই যার কোল্ডড্রিঙ্ক কেড়ে নিয়েছিল। বিস্ময়, করুণা, কিছুটা প্রেম-মেশানো দৃষ্টিতে ধ্রুবকে দেখছে। এই মনে হয় নায়িকা। এক্সপ্রেশানে কত ভ্যারাইটি!

প্রায় গেটের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল ধ্রুব।— দাদা একটু শুনবেন! বলে দৌড়ে আসে সেই ছেলেটা। শোধ নেবে নাকি! সামনে এসে বলে, প্লিজ একটা ষোলো-সতেরোর মেয়ে দিতে পারবেন? ছোট রোল। তিন-চার দিন পরে দিলেও চলবে। আসলে যে আর্টিস্টের করার কথা ছিল। কিছুক্ষণ আগে ফোন করে জানাল শরীর খারাপ এক সপ্তাহ কাজ করবে না। জানি মিছে কথা। বড় রোল পেয়ে গেছে। আউটডোরে এত ছোট রোলে কেউ আসতে চায় না। প্লিজ আপনি...

ছেলেটার কথাগুলো শুনলেও, মাথায় নিচ্ছিল না ধ্রুব। তার চোখ এখন শুটিংপার্টির গাড়ির চাকায়। মোদি টায়ার লাগিয়েছে। ধ্রুবদের কারখানা যদি চালু থাকত, ধ্রুবদের টায়ার লাগানো থাকত ওই চাকায়। এতটাই মনোপলি ছিল। ধ্রুবকে এখানে আসতেই হত না।

কী হল দাদা আমার কথা শুনছেন? ছেলেটার কণ্ঠে সংশয়।

হ্যাঁ, শুনেছি। দেখব। বলে গেটের বাইরে পা চালায় ধ্রুব।

ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর। পরাজিত অধিনায়ক একা মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছে। জীবনের প্রথম অধিনায়কত্বেই হার। লাইনটাও বোধহয় ছেড়ে দিতে হবে। আবার নতুন কিছুর চেষ্টা। কানের পাশে সেই রাতের ভর্ৎসনা ভাসছে, এই ক্ষমতাটুকু তোমার শেষ হয়ে গেছে! নাকি মন নেই আমার ওপর। সমস্ত কিছু উজাড় করে দিয়ে এসেছে অন্য কোথাও। বলো, বলো চুপ করে আছ কেন? শ্রীতমার গলা। প্রতি ব্যর্থতার পর ফিরে ফিরে আসে। পরের দিন সকালে সেই শ্রীতমা চলে গেল। আর ফেরেনি। জীবনে আর কত সহস্রবার হারতে হবে, জানে না ধ্রুব। পরাজয় যদি বা স্বীকার করা যায়। শ্রীতমার ভর্ৎসনা আর সহ্য করা যায় না।

কেন জানি এই সময় আর একবার জনাদার বউয়ের কথা মনে পড়ে। ঠিকঠাক বাড়ি ফিরেছে তো। গত চার মাস রজার টায়ার কোম্পানির শ্রমিক পরিবারের কেউ সুইসাইড করেনি। তার আগে চারটে কেস আছে।

হঠাৎ যেন মাঠ ফুঁড়ে চার শাগরেদ উঠে এল। দেবা বলে, কী হল মামা, ডিরেকটর কী এতক্ষণ তোমার সঙ্গে গজুরফুসুর করছিল? পার্টফার্ট দিল নাকি?

ভোররাত থেকেই বুঝি বৃষ্টি হচ্ছে। ঠান্ডা হাওয়া আর মাটির গন্ধে ঘুম ভাঙল কাজলের। সবে সাড়ে ছ'টা বাজে। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল কাজল। দোতলার এই ঘরটা তার নিজস্ব। জানলা দিয়ে নীচের বাগান, পুকুর সবসময়ই দেখতে ভাল লাগে। এখন যেন আরও মোহময়। গাছপালা সব ঝুপ্পুস হয়ে ভিজছে। বৃষ্টির তেমন তোড় নেই। আকাশও তত কালো নয়। অদ্ভুত একটা স্নিগ্ধ মা মা ভাব। এটা কি মা-বৃষ্টি।

কোমল হাওয়া, জলের ছাঁট এসে লাগছে কাজলের চোখেমুখে। মায়ের কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে বারবার।

গরমের অথবা পুজোর ছুটিতে কাজল যেদিন বাড়ি ফিরত, একবেলা লেগে যেত মায়ের সহজ হতে। কেমন যেন লজ্জা পেয়ে দূরে দূরে থাকত। এদিকে কাজল ছটফট করছে, বাবা-মাকে জমা কথা উগরে দিতে। মাকে না পেয়ে বাবার সঙ্গেই বসে যেত আড্ডা। কাজল টের পেত, আড়ালে দাঁড়িয়ে মা সব শুনছে। কখনও হঠাৎ এসে জলখাবারটা দিয়েই চলে গেল। স্নানের সময় কাজল দেখল, হাতের কাছেই তোয়ালে, তেল, পোশাক। মা নেই। দুপুরে খাওয়ার পর বিছানায় শুয়েছে কাগজ, সবে চোখটা লেগেছে, মা এসে বসত মাথার কাছে। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিত আজকের বৃষ্টির মতোই। চুলে নাক ডুবিয়ে গন্ধ নিত সন্তানেরা।

কিছুক্ষণ চোখ বুজে আরামটা নিত কাজল। তারপর আচমকাই জাপটে ধরত মাকে।

মায়ের সেই গোলাপি হাসিটা কাজল আজও ভোলেনি। লজ্জার রং বোধহয় গোলাপি।

খুব ছোটবেলার কথা মনে নেই, পর কখনও সামনে গায়নি। অথচ দারুণ গান গাইত মা। সে সব গান খুব একটা প্রচলিত নয়। রবীন্দ্রনাথের গান মাকে কখনও গাইতে শুনিনি। বেশিরভাগই কীর্তনাঙ্গ নয়তো কোনও লোকসংগীত। এর মধ্যে কখনও সখনও পুরনো বাংলা সিনেমারও গান থাকত। রেডিয়ো, টিভির কল্যাণে এখন তা বুঝতে পারে কাজল।

পাশের ঘর থেকে কাজলকে শুনিয়েই গাইত মা। পা টিপে টিপে দোরগোড়ায় পৌঁছে যেত কাজল। গান ভাঙাত না।

অন্য পাঁচজনের তুলনায় মা যে বেশ কম কথা বলে, বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে নিয়েছিল কাজল। বাবার সঙ্গেও বড় একটা বলত না। বাবা কিছু বললে, ছোট্ট উত্তর অথবা ঘাড় হেলিয়ে কাজ কাজ সেরে নিত। বাকি সারাক্ষণ মুখে একটা অসামান্য হাসি, বিনা ক্লান্তিতে রাজ্যের কাজ করে যাচ্ছে। এ সবের মধ্যেও

কাজলের বোর্ডিংয়ে থাকা যে মায়ের পছন্দ নয়, সেটা লুকোতে পারত না। ছুটি ফুরিয়ে এলেই মায়ের হাসিটা ক্রমশ উধাও হয়ে যেত।

কাজলের ধারণা ছিল, ছেলে দূরে থাকার অভিমানে মা হয়তো কম কথা বলে। তাই সেই ঠিক করেছিল, হায়ার সেকেন্ডারির পর যখন বাড়িতে এসে থাকবে, অনেক অনেক কথা বলে মায়ের পাওনা মিটিয়ে দেবে। সে সুযোগ আর পায়নি কাজল। তবে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি আসার পর কাজল জানতে পেরেছিল মায়ের মৌন স্বভাবের কারণ। এই জানাটাই কাজলের জীবনে গুরুতর সত্য।

বৃষ্টি একটু ধরল। ঝাপসা পুকুরঘাট এখন অনেক পরিষ্কার। একটা শালিক ঘাটের সিঁড়ি ওঠানামা করে ভিজছে। মাঝেমধ্যে জল ঝেড়ে হালকা রাখছে ডানা। উড়ানের কোনও সম্ভাবনা খোয়াতে সে রাজি নয়। মানুষ পারে না। বারবার সিক্ত হয় পৃথিবীর মায়ায়। এমনকী যে সময় চলে গেছে, পিছু ছাড়ে না। ধাওয়া করে শব্দ, গন্ধ, স্মৃতি সমেত।

সেবার প্রচণ্ড গরম পড়েছিল। কাজলের পিঠময় ঘামাচি। হাত বুলিয়ে দেওয়া, পাউডার, কী সব মেশানো জল, কত কিছু করছে মা। ঘামাচি কমার কোনও লক্ষণ নেই। অনেকদিন পর দুপুরে হঠাৎ বৃষ্টি এল। বিছানা থেকে কাজলকে তুলে ছাদে নিয়ে গেল মা। পরনের গেঞ্জি খুলিয়ে ফাঁকা ছাদে ছেড়ে দিল। বলল, ভাল করে ভেজ। সব ঘামাচি মরে যাবে। ঘামাচির এত ভাল ওষুধ আছে জানত না কাজল। দেদার ভিজছে। টেনে এনেছে মাকেও। দু'জনেই বৃষ্টির নেশায় মাতোয়ারা। তখনই যেন বাজ পড়ে ছাদে, এ কী করছ তুমি! ছেলেটাকে মারবে নাকি!

বাবার গলা শুনে কাজলের থেকে মা-ই বেশি চমকে ওঠে। ভিজে কাজলকে আগলে নিয়ে মা ধীর পায়ে বৃষ্টির বাইরে, বাবার সামনে দাঁড়ায়। মাথা নিচু রেখে বলে, ওর ভীষণ ঘামাচি হয়েছিল।

স্বভাব শান্ত বাবা ওই একদিনই অসহায় ক্রোধে বলেছিল, কেন ওর অত ঘামাচি হয়, কেন?

কোনও কথা না-বলে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল মা। কাজল এখন জানে বাবার প্রশ্নটার মধ্যেই উত্তরটা লুকিয়ে ছিল।

জানলা থেকে সরে আসে কাজল। জীবনানন্দের একটা লাইন হঠাৎ মাথায় ভেসে ওঠে, যে শালিখ মরে যায় কুয়াশায়— সে তো আর ফিরে নাহি আসে।

হায়ার সেকেন্ডারির শেষের দিন বাবা বাঁকুড়ায় এসেছিল কাজলকে নিতে।

সারা ট্রেন-পথে চার-পাঁচটির বেশি কথা বলেনি বাবা। কাজল ভেবেছিল, দরকার নেই, এবার তো তার যত কথা মায়ের সঙ্গেই।

হাওড়া স্টেশনে নেমে তারা বাড়ি যায়নি। বাবার নির্দেশ ছাড়াই ড্রাইভারকাকু কাজলদের গাড়ি পার্ক করেছিল লাইফ নার্সিং হোমের সামনে।

আই সি ইউ-তে শুয়ে আছে মা। কথা বলার কোনও ইচ্ছেই নেই আর। বাবা পিঠে হাত রেখে অজুহাতের সুরে বলে, তোর পরীক্ষা চলছিল বলে, কিছু জানাইনি।

দাদা, তোমার চা।

তোমার বিস্কিট।

কাজল বিছানায় বসে আছে। সামনে চা-বিস্কিট নিয়ে দাঁড়িয়ে তোতা, তাতান। কাজলের এই ছোট্ট দুটো খুড়তুতো ভাই-বোন আসলে আশ্রম বালক-বালিকা। এই ঘরে ওদের পড়ায় কাজল। আগে বিকেলে পড়াত। সামারের ছুটি পড়ে যেতে, সময়টা বদলে নিয়েছে। নিজেও আর সকালে বেরোয় না। সিগারেট গুমটির সামনে থেকে পালিয়ে আসাটা, কুণ্ঠায় রেখেছে এখনও।

হাত ফাঁকা করে, ভাই বোন মিলে মাদুর আনতে গেল টেবিলের তলা থেকে। ওরা বই খাতাসুদ্ধ উঠে এসেছে। না তাড়ালে যাবে না। খানিক পর আরও দুটো আসবে। এস ডি পি ও-র দুই মেয়ে। যমজ। কাজলদের বাড়ির পাশেই এস ডি পি ও-র বাংলো। রণজয়বাবুর সঙ্গে কাকার বেশ ভাল রিলেশন। কাকার রিকোয়েস্টে মেয়েদুটোকে পড়াতে রাজি হয়েছে কাজল।

তাতান ফোরে পড়ে। বাকি তিনজনই থ্রি-তে। লোয়ার ক্লাসের ছাত্রদের পড়ানো, স্বেচ্ছায় পাগল হতে চাওয়া প্রায় সমান। যদিও পুরো খাটুনিটা বেগার নয়। কাজল আপত্তি করলেও, কাকা, রণজয়বাবু টাকাটা নেহাত খারাপ দেয় না। এখানকার টিউশানির মার্কেটের তুলনায় নির্ঘাত বেশি। কাকা বলেছে, দোতলায় একটা টোল খুলে ফেল। আমি আরও স্টুডেন্ট জোগাড় করে দেব।

তোমার মাথা খারাপ। বাবা জানলে হাত খরচ পাঠানো বন্ধ করে দেবে। এই বলে, এড়িয়ে গেছে কাজল।

কাকা-কাকির আড়ম্বরহীন সংসারে কাজল বেশ ভালই আছে। প্রফেসারকাকা দিলদরাজ মানুষ। সারাক্ষণ পড়াশোনা, ছাত্রছাত্রীদের নিয়েই মেতে আছে। কাকি ব্যস্ত ক্লাব, মহিলা সমিতি—এসব নিয়ে। এ বাড়িতে অনুশাসনের বালাই নেই। কাজল এসে না পড়লে, তোতা, তাতান দু'জনেই বোধহয় গোল্লায় যেত।

ওদের সঙ্গে মাদুরে বসেছে কাজল। বৃষ্টিটা আবার ঝেপে এল। সেই দেখে তোতা, বলে, ওরা আজ আসতে পারবে না মনে হয়। তুমি কি ছাতা নিয়ে যাবে দাদা?

কথা শেষ হতে না হতেই দেখা গেল, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দুটো শিশুপাখি। অলি, কলি। ডানার জল ঝাড়ছে দোরগোড়ায়।

কাজল উঠে তোয়ালে নিয়ে আসে। অলি, কলির গা, মাথা মুছিয়ে দেয়। কাজল ভাবে, কোন আক্কেলে এই পাখির মতো শিশুর বাবা পুলিশে চাকরি করতে যায়। রণজয়বাবু আবার নাকি এই মহকুমার দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশকর্তা।

কী গুরুদেব, আশ্রম তো জমিয়ে নিয়েছেন। ভালই বশ করছেন শিষ্যদের। কাকির গলা। কখন যেন উঠে এসেছে ওপরে। অলি, কলিকে গা, মাথা মুছিয়ে দিচ্ছে দেখেই খোঁচাটা দিল। তোতা, তাতানও উঠে এসে, কাজলকে ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শিশুসুলভ হিংসে। কাকি চিন্তিত মুখে বলে, ও মা, কেন যেন এলাম ওপরে?

আমাকে হ্যান্ডসেটটা দিতে এসেছ। কাকির হাতে কর্ডলেস ফোন দেখে বলে কাজল।

এই দেখো, এর মধ্যেই ভুলে গেছি। বলে হ্যান্ডসেট বাড়িয়ে দেয় কাকি।

কাজল জানে বাবার ফোন। দু'-একদিন অন্তরই করে। ফোন কানে দিয়ে কাজল বলে, বলো।

আজ এলেন না কেন? ও প্রান্তে নারীকণ্ঠ। ফোনসেটটা হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল কাজলের। কে তাকে ফোন করছে? কোথায় যাওয়ার ছিল তার! আজ শুক্রবার, মুহূর্তে মনে পড়ে। তা হলে কী!

আপনার জন্যই শুধু বেরোলাম। নইলে এই বৃষ্টিতে কেউ বেরোয়। স্যারও আজ পড়ালেন না। কী হল চুপ করে আছেন কেন?

নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না কাজল। এই কি আইরিন। নাকি অন্য কোনও বন্ধুকে দিয়ে ফোন করাচ্ছে। ফোন নাম্বার পেল কোথায়!

বাবাঃ, ফোনেও এত ভয়!

না, অ্যাকচুয়ালি, আমি ঠিক... বলতে বলতে থেমে যায় কাজল। কথাগুলো নিজের কানেই উৎকট শোনাচ্ছে। অপর প্রান্ত খিলখিল করে হেসে ওঠে। বলে, এক নম্বরের ক্যাবলা।

ফোন কেটে যায়। কাজল রীতিমতো থ। হ্যান্ডসেটটা চোখের সামনে নিয়ে

দাঁড়িয়ে। অল্পবয়সি কাকি তার বউদির মতোই। জিজ্ঞেস করে, কলকাতার বান্ধবী? বিরহ সইছে না!

অন্যমনস্ক ভাবে কাজল বলে, না, এখানকার।

ও মা, কখন....বলে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে কাকি।

পাড়ার ফোন বুথ থেকে বেরিয়ে আসছে আইরিন। ঠোঁটে এখনও হাসিটা লেগে। ঝিরঝিরে বৃষ্টির ভেতর রোদ উঠেছে। ছাতা মাথায় দিয়ে বাড়ির দিকে হেঁটে যায় আইরিন। সে আজ মোটেই পড়তে যায়নি। মিথ্যে বলেছে কাজলকে। ফোন পেয়ে খুব অবাক হয়েছে হাঁদাটা। ফোনের এপার থেকে ওর মুখটা যেন দেখতে পাচ্ছিল আইরিন। আজ সারাদিন আকাশপাতাল ভাববে ছেলেটা, আইরিন কোথা থেকে ফোন নাম্বার জোগাড় করল। ভাবুক। ওরকম ভিতু ছেলের এটা শাস্তি। ও মা, সেদিন আইরিনের মতো মেয়ে যেচে এগিয়ে যাচ্ছিল কথা বলতে, পালাল! যে আইরিন বান্ধবীদের সঙ্গেই কম কথা বলে, ছেলেদের সঙ্গে যেচে কথা বলা তো দূরের ব্যাপার।

কাজলকে ফোন করার জন্য বুথে আসেনি আইরিন। মাকে ফোন করতে এসেছিল। যেমন সপ্তাহে দু' দিন আসে। বড় মামার বাড়ির লাইনটা বোধহয় খারাপ। খালি এনগেজ টোন আসছে। মাঝে একবার কাজলকে ফোন করে খানিকটা মজা করে নিল আইরিন। কাজলের কথা মাথা থেকে সরে গিয়ে এবার মায়ের জন্য চিন্তা হচ্ছে। মা-ও নিশ্চয়ই ভাবছে কী ভাবে যোগাযোগ করা যায়। আগের ফোনে মা নিজেই বোকার মতন নতুন অফিসের ফোন নাম্বার দিল না। বলল, দাঁড়া, আগে দেখি এই অফিসের কী ছিরি। প্রাইভেট কোম্পানিগুলো তো জানিস। এক একটা অফিস এমন হয় না, বাড়ির লোক ফোন করলেও ডেকে দেয় না।

এ বাড়িতে ফোন নেই। থাকার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ইলেকট্রিক বিল এলে আইরিন আর ঠাম্মা সেটা এমনভাবে খোলে, যেন অঙ্ক পরীক্ষার কোয়েশ্চেন। সংসারটা তারা দু'জন মিলেই দেখাশোনা করে। খরচা চালায় স্বর্গত ঠাকুর্দা। তার জমানো টাকার ইন্টারেস্টই আইরিনদের ভরসা। ফ্যাক্টরি বন্ধ হওয়ার পর থেকে বাবা নানা ধরনের ব্যবসার চেষ্টা করেছে। ডিটারজেন্ট পাউডার ম্যানুফ্যাকচারিং, শাড়ির ব্যবসা, দোলের সময় রং আবির তৈরি আরও দু'-একটা আছে যা আইরিনের এখন মনে নেই। শেষ ব্যবসা ছিল টিপ কারখানা। সোয়েটের টিপের ওপর চুমকি বসানো হত। ব্যবসাটা মোটোমুটি চলছিল। বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের

পরিবারের দশজন মেয়ে কাজ করত। কেন কী জানি তখনই ধৈর্য হারাল মা। অথচ আগের বিজনেসগুলো ডোবার পর মা সপ্তাহ খানেক গুম মেরে থাকত। তারপর হঠাৎ সব বিষণ্ণতা ঝেড়ে ফেলে বড় মামার কাছে চলে যেত ক্যাপিটাল আনতে। বাবা বারণ করলেও শুনত না। টিপ কারখানার মধ্যে কী যে অভিশাপ ছিল, মা নিজেই চলে গেল বড় মামার কাছে, আজও ফিরল না।

চলে যাওয়ার আগের দিন রাতে আইরিনদের সংসারে প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল। আইরিন তখন ঠাম্মার ঘরে ঘুমে কাদা। নাচ শেখা, হোমটাস্ক, পড়তে যাওয়া, স্কুল, খেলা, কারখানায় ঘুরঘুর করা, আইরিন ক্লান্ত হয়ে যেত। সেদিন ভোরবেলা ঠাম্মা ঠেলে তুলল, ও মণি, তাড়াতাড়ি ওঠ। তোর মা-বাবা রাত থেকে ঝগড়া করছে। গিয়ে থামা।

চোখ ডলতে ডলতে পাশের ঘরে গিয়েছিল আইরিন। ঝড়ে ভাঙা সুপারি গাছের মতো মেঝেয় বসা বাবা। মায়ের মুখে বৃষ্টির জল। তড়িঘড়ি ব্যাগ গুছোচ্ছে মা। আইরিনের দিকে চোখ পড়তেই বলে, তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে নে। আমরা বেলেঘাটা চলে যাব।

কথাটা শুনে মাথা তোলে বাবা। অদ্ভুত একটা দৃষ্টি নিয়ে তাকায় আইরিনের দিকে। যে কোনও ভিখারির থেকেও করুণ সেই চাউনি। লকআউট-এর পর কিছুদিন অন্তর বাবা বাড়ি ফিরে এসে বলত, মোলডিং-এর শ্যামলদাকে দেখলাম ট্রেনে গান গাইতে। দিপুর মা চার্চের গেটে ভিক্ষে করছে। শিবেনটা আজকাল হাতে প্রেসক্রিপশান নিয়ে স্টেশনে টিকিট কাউন্টারের সামনে দাঁড়ায়.... বাবা কি তাদের থেকেও বেশি ভিখিরি হয়ে যাচ্ছে। কথাটা মাথায় আসতেই আইরিন মায়ের অবাধ্য হয়। বলে, আমি বড় মামার বাড়ি যাব না। তুমি গেলে যাও।

আইরিন তখন ক্লাস এইট। হতভম্ব ভাবটা কাটাতে একটু সময় নেয় মা। তারপর আইরিনের কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে থাকে, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে। এই লোকটার কাছে থাকলে তুমি কোনও দিনই মানুষ হতে পারবে না। ও আমার কপাল খেয়েছে, একদিন তোমাকেও খেয়ে নেবে। লোকটা শুধু অকৃতজ্ঞ নয়, অমানুষ।

বাবাকে বারবার 'লোকটা' বলাতে মাথা গরম হয়ে গেল আইরিনের। কাঁধ ছাড়িয়ে মায়ের থেকে দূরে সরে গেল। ঝাঁঝিয়ে বলে উঠল, আমি যাব না বলে দিলাম ব্যস।

বাবা তখনও চেয়ে আছে অবলা জীবের মতন। হারা জেতার কোনও ছাপই

নেই মুখে। কে বলবে লোকটা কোনও একসময় খেলোয়াড় ছিল। এখনও তাকে রাখা মেডেল ঝাড়াপোছা করে নিজে।

মায়ের আগুনঝরা চোখের সামনে থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল আইরিন। খুঁজছিল ঠাম্মাকে। ঠাকুরঘরে নেই, রান্নাঘর, কলঘর কোথাও না! গেল কোথায় বুড়িটা?

বাড়ির পাশে আমগাছ তলায় পাওয়া গেল। মাথা উঁচু করে দাদুর লাগানো আমগাছটা দেখছে। মুকুল এসেছে অনেক। এই ঠাম্মাই কিছুক্ষণ আগে আইরিনকে ঠেলে পাঠাল বাবা-মায়ের কাছে। এখন কী নির্বিকার!

ও ঠাম্মা, মা বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে যে। তুমি গিয়ে কিছু বল।

আইরিনের কথা শুনতে পায়নি, এমনভাবে ঠাম্মা বলে, মুকুলগুলো সব খেয়ে ফেলছে।

কারা তোমার গাছের মুকুল খেল? অবাক হয়ে জানতে চায় আইরিন। মাথা নামিয়ে চিন্তিত মুখে ঠাম্মা বলে, পুতুলদের কাঠবিড়ালি দুটোকে দেখিস তো, খাঁচায় আছে, না ছেড়ে দিয়েছে।

ধুত্তোরিকা তোমার মুকুল। বলছি মা চলে যাচ্ছে।

জানতাম। কত দিন আর ভরতুকি দিয়ে চালাবে। তাও যদি ছেলেটা বউয়ের ভালমন্দের খোঁজটা একটু নিত। ভাল করে তো মুখের দিকেই তাকায় না।... বিড়বিড় করতে করতে ঠাকুরঘরের দিকে চলল ঠাম্মা। তার মানে মায়ের সাপোর্টার। উঠোনে দাঁড়িয়ে আইরিন দেখল, মা ভারী সুটকেস নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সুটকেসের ওজনের কারণেই বোধহয় মা সেদিন পেছনে ফিরে তাকাতে ভুলে গিয়েছিল।

যদি একবার পেছন ফিরত, দেখত, তার মেয়ের গলায় কান্নার ফাঁস এমনভাবে চেপে বসেছে, কিছুতেই মা বলে ডেকে উঠতে পারছে না।

সুটকেস ফেলে প্রবল উৎকণ্ঠায় ছুটে আসত মা। বলত, দেখি দেখি, গলায় কী আটকেছে!

খাঁ খাঁ করতে লাগল বাড়ি। পায়ে পায়ে ঘরে গেল আইরিন, বাবা মেঝে থেকে উঠে বিছানায় চিত হয়ে শুয়েছে। চোখ বোজা। ঘুমল নাকি! ঠাম্মার গলা পাওয়া যাচ্ছে না। ওই অসহ্য নির্জনতার কাটাতে পুতুলপিসির বাড়ি দৌড়েছিল আইরিন।

ওদের দালানে কাঠবিড়ালিদুটো খাঁচাতেই আছে। আইরিনের সাড়া পেয়ে পুতুলপিসিই যেন খোলা খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল, মুখ চোখে সে রকমই পরিতৃপ্তির ভাব। পরম উৎসাহে বলল, হ্যাঁ রে মণি, একটু আগে তোর মাকে

দেখলাম বড় সুটকেস নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ধ্রুবদার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হল নাকি?

আইরিন উত্তর দেয়নি। পাশ দিয়ে ভেতর ঘরে চলে গিয়েছিল। পুতুলপিসির মা, রাঙাঠাম্মার সঙ্গেই আইরিনের বেশি সম্পর্ক। এ বাড়ির ঠাম্মা তাকে নিজের নাতনির মতোই ভালবাসে। রাঙাঠাম্মার কাছে সান্ত্বনা নিতে এসেছিল আইরিন। মাথায় হাত বুলিয়ে নানান প্রবোধ দিচ্ছিল রাঙাঠাম্মা, স্বামী, স্ত্রীতে এরকম হয়ই। দেখিস ক'দিন পরেই তোর মা ফিরে আসবে। শ্রীতমার মতো মেয়ে হয় না, ও টাকা জোগাড় না করে দিলে, টিপ কারখানা চলত কী করে। ওখানে কাজ করে আমার মেয়েও তো দু'পয়সা ঘরে আনছে।

তখনই আইরিনের খেয়াল হয়, পুতুলপিসিকে কাজে নেওয়ার ব্যাপারে প্রবল আপত্তি করেছিল মা। বলেছিল, মেয়েটা বাচাল। অন্য মেয়েদের কাজে ডিসটার্ব করবে।

বাবা বলল, তা হয় না। অন্য স্টাফের মেয়ে-বউকে কাজে নেব। পাশের বাড়ির মেয়েকে নেব না! তারাও তো লকআউটের শিকার।

পুতুলপিসিকে কাজে নেওয়া হয়েছিল। এবং আশ্চর্য, কাজের সময় পুতুলপিসি দরকার ছাড়া কথা বলত না। প্রোডাকশান সবার থেকে বেশি করত। তা হলে কেন মা ও কথা বলেছিল! আর মা আজ চলে যেতে, কেনই বা পুতুলপিসির এত উৎসাহ? কাল রাতে ঝগড়া কি পুতুলপিসিকে ঘিরেই? বাবার দিকে এক আধবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা ছাড়া, পুতুলপিসির আর কোনও দোষ দেখেনি আইরিন। কারখানার অন্য মেয়ে-বউরা বাবার পেটানো চেহারার দিকে প্রায়ই হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। বাবার এসব খেয়াল করার ফুরসত ছিল না। রোজগারের চিন্তায় সারাক্ষণ ব্যস্ত। তা হলে কি বাবা আর পুতুলপিসির মধ্যে বিশেষ কিছু সম্পর্ক ছিল, যা আইরিনের চোখ এড়িয়ে গেছে? নাকি মিছিমিছি সন্দেহ করছে মা। সেই সন্দেহের বশে মা আজ চলে গেল। ক'দিন পরে যদি টিপ কারখানার টাকা ফেরত চায়!

আশঙ্কাটা মাথায় আসতেই রাঙাঠাম্মার সামনে থেকে উঠে এসেছিল আইরিন। বাড়ির উঠোনে পা রাখতেই থমকে যায়। সদরে, রাস্তায় হাজার হাজার টিপ পড়ে আছে। টিপের ওপর চুপটি করে দাঁড়িয়ে পুতুলপিসি। বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আরও এক কার্টুন টিপ বাইরে ফেলে, ফের ঘরে ঢুকে গেল। এ কী করছে বাবা, পাগল হয়ে গেল নাকি! পুতুলপিসিই বা বারণ করছে না কেন? ঘর থেকে ছুড়ে ছুড়ে সমস্ত কারখানাটাই বাইরে ফেলে দিচ্ছে বাবা। পুতুলপিসির কোনও বিকার নেই। চোখের সামনে দেখছে, কাল থেকে ওদের কারখানাটাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

গভীর সংশয়ে পুতুলপিসির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল আইরিন। পিসির মুখের দিকে তাকাতেই আমূল চমকে ওঠে, অদ্ভুত একটা নির্মম হাসি জ্বলছে পুতুলপিসির ঠোঁটের কোণায়। সেইদিন থেকেই পুতুলপিসিকে সহ্য করতে পারে না আইরিন। অথচ এই পুতুলপিসি কত কষ্ট করে নিজেদের সংসারটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কখনও আয়ার কাজ, নানান ছোটখাটো কারখানায় চাকরি। ওদের বাড়িতে একটা ভাল রান্না হলে, সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসে।

কী রে, বৃষ্টি তো অনেকক্ষণ থেমে গেছে। এখনও ছাতা খুলে আছিস!

যার কথায় ঘোর ভাঙে, এতক্ষণ তার কথাই ভাবছিল আইরিন। পুতুলপিসি। অনেকদিন বাঁচবে। ক্যাটক্যাটে হলুদ একটা শাড়ি পরে কাজে যাচ্ছে। সেন্ট কারখানায় কাজ করে এখন। পুতুলপিসি আবার বলে, চার-পাঁচটা ছেলে এসেছে তোদের বাড়িতে। ধ্রুবদার খোঁজ করছে।

ছাতা বন্ধ না করেই বাড়ির দিকে হেঁটে যায় আইরিন। এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে, বাড়ির সামনে বখাটে টাইপের কয়েকটা ছেলে পায়চারি করছে।

কাকে চাই? ছেলেগুলোকে প্রশ্ন করে আইরিন। খুব চেষ্টা করে, গলায় সম্ভ্রম এনে, একটা ছেলে বলে, তুমিই তো ধ্রুবদার মেয়ে?

হ্যাঁ, বলুন!

ধ্রুবদা কোথায় গেছে বলতে পার? মাসিমা কিছু বলতে পারলেন না। ধ্রুবদাকে খুব আর্জেন্ট দরকার।

বাবা তো ফ্যাক্টরির গেটে। মিটিং আছে আজ। বলেই আইরিনের মনে হল, ঠিক হল কি বলা? এই ছেলেগুলো কারা কিছুই জানে না আইরিন।

এই রে, ওখানে গিয়ে ডাকা তো মুশকিল। দুপুরে ফিরবে খেতে?

ঘাড় হেলায় আইরিন। ছেলেটা বলে, ফিরলেই বলো, ঠেকে একবার যেতে।

'ঠেক' শব্দটা মাথায় যেন ঠকাস করে লাগল। 'আচ্ছা বলব' বলতে ভুলে গেল আইরিন। ছেলেগুলো চলে যাচ্ছে। বাবাব সঙ্গে এদের কীসের আর্জেন্ট দরকার!

রজার কারখানার কর্মী সংখ্যা সাড়ে তিন হাজার। দীর্ঘ সাত বছর বন্ধ থাকার কারণে গেট মিটিং... এ মাত্র শ'দুয়েক কর্মী জমা হয়েছে। অথচ আজকেই অনেক আশার খবর শোনাচ্ছে স্বপন। মালিক নাকি কারখানা খোলার জন্য ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছে। নতুন চিফ মিনিস্টার মালিককে আশ্বাস দিয়েছে সব রকম সহযোগিতা করবে। খুব তাড়াতাড়ি মালিক, মন্ত্রী, ইউনিয়ন মিটিঙে বসবে। তার

আগে বিজয়ী ইউনিয়নের সেক্রেটারি স্বপন, কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে নিতে চায়। আজকের গেট মিটিং তারই ভূমিকা।

শ্রমিকদের ডিমান্ড কী হওয়া উচিত সেই নিয়ে অনেক কথা বলে যাচ্ছে স্বপন। সব কথা মাথায় ঢুকছে না ধ্রুবর। সে মন দিয়ে স্বপনের উৎসাহ দেখে যাচ্ছে। স্বপনের বডি লাঙ্গুয়েজ বলছে, খুব ম্লান হলেও কোথাও একটা আশার আলো দেখেছে। ধ্রুবর সঙ্গেই কোয়ালিটি ডিপার্টমেন্টে কাজ করতে স্বপন। খুবই গরিব ঘরের ছেলে। সেখান থেকে কোথায় উঠে গেল ছেলেটা! ডুবোজাহাজ হলেও, সেই তো ধ্রুবদের ক্যাপ্টেন।

কিছুক্ষণ আগের বৃষ্টিতে চারপাশে জল। মিটিং-এর স্টেজটাকে মনে হচ্ছে ডুবোজাহাজের ডেক। এইমাত্র ভেসে উঠেছে। স্বপন ওখানে দাঁড়িয়েই দেখতে পেয়েছে লাইট হাউসের আলো। সেই আলোয় উদ্ভাসিত ওর মুখ। যা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে বাকি দুশো জনের মুখে।

স্বপনের নেতৃত্ব নিয়ে কারওর কোনও সংশয় নেই। ও যা বলছে, বিশ্বাস করছে সবাই। সিদ্ধান্ত যা নেবে সবাই একবাক্যে মেনে নেবে। এই ভরসার জায়গাটা তৈরি করেছে স্বপন নিজেই। অন্য কারখানার ইউনিয়নগুলো যেমন নিজেদের কাউকে সেক্রেটারি হিসেবে বসিয়ে দেয়, স্বপন তা নয়। ও নেতা হয়ে আগমার্কা ইউনিয়নের কাছে গেছে। ইউনিয়নও ওকে মেনে নিয়েছে। স্বপনের মস্ত বড় গুণ, প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে গিয়ে কোম্পানির অবস্থাটা ডিটেলে বোঝাত। দরকার পড়লে ইন্ডিভিজুয়াল স্টাফের সামনে বসে আলোচনা করত ধৈর্য ধরে। অন্যান্য ইউনিয়ন নেতৃত্বের মতো কাউকেই অন্ধকারে রাখত না।

আজকের ভাষণটা মন দিয়ে না শুনলেও, ধ্রুব যেন টের পায় স্বপন কিছু সিদ্ধান্ত পার্সোনালি নিতে যাচ্ছে। ইউনিয়নের ওপর মহলের সঙ্গে কথা না বলেই। এটা কি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস। নাকি ইউনিয়নের ওপরই আস্থা হারাচ্ছে স্বপন? ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না ধ্রুবর কাছে। কোম্পানি খোলার যে সামান্য সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, ইউনিয়নের সঙ্গে ঝামেলা হয়ে গেলে সেটাও মাটি হয়ে যাবে। ধ্রুব ঠিক করে, মিটিং শেষ হলে স্বপনকে ঠান্ডা মাথায় বোঝাতে হবে, আগে ফ্যাক্টরিটা খোলার বন্দোবস্ত কর। স্টাফদের হাতে দু'-চার পয়সা আসুক। তবে তো লড়ার দম পাবে শ্রমিকরা। ...একটা কথা মাথায় আসতে, আপন হাসি হাসে ধ্রুব। লিডার হওয়ার কোয়ালিটি তার না থাকুক, বোঝাতে সে ভালই পারে। সোনাদের দলের হয়ে বোঝাচ্ছে। এখন স্বপনকে বোঝাবে। মা-মেয়েকেও ভুল বুঝিয়ে রেখেছে।

ভাষণের শেষে স্বপন বলে, এবার আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন জনার্দন পাল।

ধ্রুব অবাক হয়, স্পিচ দেওয়ার মতো দম এখনও জনাদার আছে! এটা ঠিক, একসময় জনাদা ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী ছিল। ছায়ার মতো ঘুরত স্বপনের সঙ্গে। তারপর এই দীর্ঘ সাত বছরে জনাদা ক্রমশ ভেঙে গেছে। মাঝে যখন কয়েক মাসের জন্য কারখানা খুলল, প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া জনাদার তখন কী উৎসাহ। তার আগে সংসার চালানোর জন্য কী না করেছে, ট্রেনে হকারি, দোরে দোরে ধূপ বিক্রি। এমনকী একদিন ভ্যানরিকশা চালাতে দেখেছে ধ্রুব। জনাদার দু'মেয়ে, এক ছেলে। ওরা বড় হয়েছে, কোনও রকমে সংসারটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। চুল্লু খেয়ে আদাড়ে বাদাড়ে পড়ে আছে জনাদা। ক'দিন আগে জনা বউদি সুইসাইড করতে গিয়েছিল।

জনাদা উঠে এসেছে মঞ্চে। এ কী চেহারা হয়েছে! ঠিক যেন কাকতাড়ুয়া। সবার থেকে আলাদা, একটু উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছে বলে, শীর্ণদশাটা আরও চোখে পড়ছে।

কথা জড়িয়ে যাচ্ছে জনাদার। হাতফাত ছুড়ে কোনও রকমে ম্যানেজ করছে ব্যাপারটা। ধ্রুবর চোখ খোঁজে স্বপনকে। স্টেজ থেকে নামার পর ঘেরাও হয়ে গেছে। কিন্তু ওকে যে একটু সংযত থাকতে বলতে হবে। জনাদার ভাষণটা যাত্রা পার্টির কনর্সাট ছাড়া কিছুই নয়। না শুনলেও চলে। স্বপনের উদ্দেশে পা বাড়ায় ধ্রুব। তখনই জনাদার ভাষণের একটা অংশ কানে আসে। পা থেমে যায়। জনাদা বলছে, এই তো ক'দিন আগে, অভাবের তাড়নায় আমার বউ ট্রেনের চাকায় মাথা দিতে গেল। কে বাঁচাল? না, আমাদেরই সহযোদ্ধা। ধ্রুব রায়। এইভাবে যদি আমরা একে অপরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি, তা হলে বাকি লড়াই...।

পরপর দুটো ঢপ মারল জনাদা। প্রথমটা তো ডাহা মিথ্যে। ধ্রুব খোঁজ নিয়ে জেনেছে, জনাদার অতিরিক্ত মদ খাওয়া নিয়ে সংসারে প্রচণ্ড অশান্তি। সেদিন বউদির গায়ে পর্যন্ত হাত তুলেছিল জনাদা। বউদি আর মাথার ঠিক রাখতে পারেনি। দ্বিতীয় তথ্যটা কোথা থেকে জোগাড় করল কে জানে! ঘটনাটা জোরালো করতে বউদিই হয়তো মিথ্যেটা পরিবেশন করেছে। মরতে যাওয়ার আগে ধ্রুবকে পাশের বেঞ্চে দেখে, এমনটাই বোধহয় আশা করেছিল। ধ্রুব পারেনি। ভাগ্যিস ছেলেটা এসে পড়ল। উদ্ধারকর্তার প্রাপ্য কৃতজ্ঞতা না দিয়ে কারখানা খোলার উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করা হচ্ছে, জানলে ছেলেটি নিশ্চয়ই রাগ করবে না।

স্বপনকে ঘিরে ভিড়টা ক্রমশ বাড়ছে। ওর কথার খণ্ডাংশ শুনতেও শ্রমিকরা উদ্গ্রীব। দেওয়ালটা ভেদ করা অসম্ভব বুঝে কারখানা গেটের একদম সামনে যায় ধ্রুব। মাত্র সাত বছরে লোহার বিশাল গেটটা বড় মলিন, বিবর্ণ হয়ে গেছে। বুড়ো হয়ে যাচ্ছে অতি দ্রুত। পাশে পাঁচিলের গায়ে ছোট গেটটা খোলা। মাথা নিচু করে ঢুকে পড়ে ধ্রুব। জারুল গাছটা দেখে জোরালো ধাক্কা লাগে বুকে। কী অসম্ভব বাড় হয়েছে গাছটার, আর অজস্র ফুল! যেন গরিব ঘরে অতি যৌবন পাওয়া কোনও অরক্ষিত মেয়ে।

ও বাবু, ইঁহা ক্যায়া কাম হ্যায়?

প্রশ্ন শুনে ঘাড় ফেরায় ধ্রুব, বুঝতে পারে ততটা অরক্ষিত নয় এখানকার বাতিল সম্পদ। সিকিউরিটি রুমের বাইরে তিনজন। একজন পাঞ্জাবি। প্রশ্নটা সেই করেছে। এবং সর্তক ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে ধ্রুবর কাছে। পাত্তা দেয় না ধ্রুব।

গাছটার পেছনে একটা শেড। প্রচুর জং ধরা ট্রলি জড়ো করা আছে সেখানে। ওই ট্রলিগুলোতে ফিনিশড টায়ার স্টক শেডে নিয়ে যাওয়া হত।

আপ ভিতর কিঁউ ঘুস আঁয়ে? জেরার সুরে জানতে চাইল গার্ড। এ যেন কর্তব্যপরায়ণ বোকা দারোয়ান বাড়ির সদস্যকেই জিজ্ঞাসাবাদ করছে। এই গার্ডটাকে আগে দেখেনি ধ্রুব। কারখানা বন্ধ থাকলেও কর্মী নিয়োগ চলছে! যেন অফিসের কারবার। জারুল গাছের দিকে তাকিয়ে ধ্রুব বলে, থোরা সা ফুল উতারুঙ্গা।

আশ্বস্ত হয় গার্ড। নিরাসক্ত ভাবে বলে, উতারিয়ে। অলস ভঙ্গিতে ফিরে যায় নিজের জায়গায়।

গাছটা এতটাই বেড়ে গেছে, এখন আর হাত পাওয়া যাবে না। ফ্যাক্টরি চালু থাকাকালীন সপ্তাহান্তে জারুলের ছোট্ট একটা ডাল বাড়ি নিয়ে যেত ধ্রুব। বেগুনি রঙের ফুলে ভরা ডালটা এমনভাবে, এমন জায়গায় ফুলদানিতে সাজাত শ্রীতমা, গরমকালে অদ্ভুত এক ধরনের শান্তি নেমে আসত ঘরে। এতটাই গোছানো, রুচিশীল ছিল সে।

ঝড়বৃষ্টির কারণেই গাছতলা থেকে একটু দূরে ফুল সুদ্ধ ছোট একটা ডাল পাড় আছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় ধ্রুব। নিচু হয়ে ফুলটা তুলতে যেতেই, কানে বেজে ওঠে সাত বছর আগের কারখানার ভোঁ। যেন ছুটির শেষে ফুল তুলে নিচ্ছে ধ্রুব। বাড়ি গিয়েই শ্রীতমার হাতে দেবে। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠত শ্রীতমার মুখ। সাত বছর আগে।

যেন ধ্রুব নয়, জলে ভেজা নিস্তেজ ফুলগুলোই শ্রীতমার জন্য মন খারাপ করে আছে।

ছোট গেট দিয়ে বাইরে আসে ধ্রুব। জারুলের ডালটা একটু আড়ালে রাখে। মিটিং শেষ। ছড়িয়ে ছিটিয়ে চার পাঁচটা জটলা। স্বপনকে ঘিরে ভিড়টা পাতলা হয়েছে।

নিঃসাড়ে সাইকেলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ধ্রুব। স্বপন ডাকে, এই ধ্রুবদা, শোনো।

বাধ্য হয়ে ঘুরতে হয় ধ্রুবকে। স্বপন একাই এগিয়ে আসে, কখন এসেছ?

অনেকক্ষণ। তোর বক্তৃতা পুরোটা শুনলাম। সত্যিই কি খোলার কোনও চান্স আছে?

চান্স তো আছেই। যদি না... বলে থেমে গেল স্বপন। গভীর আশঙ্কায় ধ্রুব জানতে চায়, যদি না, মানে?

প্রসঙ্গ থেকে একটু সরে স্বপন বলে, আসলে কী জানো ধ্রুবদা, মুখে আমরা যতই শ্রমিক স্বার্থ, শিল্পোন্নয়ন বলে লাফাই, এখনও পর্যন্ত যে কোনও শিল্পোদ্যোগীকে মুরগি বলেই ভাবি।

স্বপন কাদের উদ্দেশে কথাগুলো বলছে, বুঝতে অসুবিধে হয় না ধ্রুবর। ওকে মেন্টাল সাপোর্ট দেওয়ার জন্য ধ্রুব বলে, যে যাই করুক। তুই তো বার্গেনিং এজেন্টদের একজন। তুই তোর মতো কাজ করে যা। আমরা পেছনে আছি।

সেটা তো জানি। কিন্তু একা একা আর কত লড়াই করা যায়। যখনই বড়দের সঙ্গে মিটিং-এ বসি, বিশ্বায়ন, খোলাবাজার, কেন্দ্রীয় শিল্পনীতি এসব এসে যায়। আমাদের কারখানার সমস্যা যেন তুচ্ছ একটা ব্যাপার।

তুই কি আলাদা ইউনিয়ন করার কথা ভাবছিস? চাপা গলায় জিজ্ঞেস করে ধ্রুব। মাথা নাড়ে স্বপন। চিন্তিত মুখে বলে, এই সিচুয়েশনে সেটা করা ঠিক হবে না। শ্রমিক বিরোধী ব্যাপার হবে। মালিক পক্ষ থেকে কিছু কিছু প্রস্তাব এসেছে, যা মোটামুটি পজেটিভ। আর কিছু দিন দেখি। —থামে স্বপন। তারপর বলে, তোমার সঙ্গে যা কথা হল, বাইরে বোলো না। ব্যক্তিগত সম্পর্কের জায়গা থেকেই এগুলো বললাম।

সে সব তোকে ভাবতে হবে না। ঠান্ডামাথায় কাজ করে যা। এতদিন লেগে আছিস, ফল একটা পাবিই। তেমন বুঝলে আন্দোলনের নতুন কিছু কর্মসূচি তৈরি কর। অনেকদিন রেল রোকো, রাস্তা রোকো কিছু হয়নি। খবরের কাগজগুলোও ইদানীং আমাদের কথা আর লেখে না। আমরা যে শালা এখনও বেঁচে আছি। ভুলেই গেছে মানুষ।

জনগণের কথা বলছ। খেয়াল করে দেখো তো, আত্মীয়-পরিজনরা তোমার লাস্ট কবে খবর নিয়েছিল। —কথাটা বলার মধ্যে দিয়েই নেতা থেকে সাধারণ শ্রমিক হয়ে উঠল স্বপন। এই কারণেই স্বপনকে এত ভাল লাগে। বেলা হয়ে যাচ্ছে দেখে, ধ্রুব বলে, চলি রে, আবার করে মিটিং ডাকছিস?

দিন পনেরো পরে। সেদিন সবাইকে একটু আসতে বোলো তো।

আচ্ছা। বলে সাইকেলের দিকে পা বাড়াচ্ছিল ধ্রুব। স্বপনের চোখে পড়ে জারুলের ডালটা। বলে, কী ব্যাপার ফুল নিয়ে বাড়ি যাচ্ছ। বউদি এসেছে নাকি?

বোকার মতো মাথা নেড়ে ধ্রুব বলে, এমনই নিয়ে যাচ্ছি।

হতেই পারে না। নিশ্চয়ই এসেছে বউদি। না হলে মিটিং-এ এসে তুমি ফুল নিয়ে বাড়ি যাও! তোমার মনে আছে, তোমার ঘরে এই ফুল সাজানো দেখে আমি কী বলেছিলাম? আবার অসহায় ভাবে মাথা নাড়ে ধ্রুব। স্বপন বলে, বউদিকে বললাম, 'স্টাফেরা কারখানা থেকে টুকটাক মাল সরায়। ধ্রুবদা আপনার জন্য ফুল চুরি করে আনে'। সেদিন খুব লজ্জা পেয়েছিল বউদি।

সুখস্মৃতি উদ্ধার করে প্রাণ খুলে হাসছে স্বপন। হাসিটা ধ্রুবর মুখে সঞ্চারিত হতেই, কেমন যেন বিষাদময় হয়ে উঠছে। নিস্তেজ গলায় ধ্রুব বলে, তোর সব মনে আছে দেখছি।

সব মনে আছে, সব। আবার সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে দেখো। আমরা আবার আগের মতো...কথা শেষ না করে ধ্রুবর পিঠ চাপড়ে দেয় স্বপন। অনেকদিন পর ধ্রুবর গলার কাছে কষ্ট গুটলি পাকিয়ে ওঠে। হয়তো স্বপনেরও এমনটাই হচ্ছে। তাই কথাটা শেষ করতে পারেনি।

কারখানার গেট থেকে বাউন্ডারির মেন গেট সাইকেলে প্রায় দু' মিনিট। চওড়া পিচ ঢালা রাস্তা পুরোটাই গাছের ছায়ায় মোড়া। রাস্তাটা আগের মতো মসৃণ নয়। ধ্রুবর সাইকেল লাফাচ্ছে। একপাশে সাইকেল শেড, কোম্পানির নিজস্ব দমকল, দুটো ভাঙা গাড়ি দেখা যাচ্ছে। তারপর ট্রেনিং স্কুল। ধুলো পাতা পড়ে থাকলেও সব আগের মতোই। একটু ঝাড়পোঁছ করে নিলে, দিব্যি চালু করা যায় সব কিছু। রাস্তার ডান পাশে একতলা বাড়িতে কোম্পানির হাসপাতাল। কয়েক বছর আগেও চালু ছিল। এই টাকাটুকু মেন অফিস থেকে আসত। এখন তাও বন্ধ হয়ে গেছে। এরপরেই ইঞ্জিনিয়ার, অফিসারদের কোয়ার্টার। সামনে নানা ধরনের গাছ। আমগাছই প্রধানত। গাছতলায় কাদের সব ছেলেমেয়ে, কচি আম পাড়ছে। এদের মধ্যে কিছু ছেলে লেবারদের। এখনও যারা লেবার কোয়ার্টার ছেড়ে যায়নি। বাউন্ডারির শেষ প্রান্তে ওদের

কোয়াটার্র। জল, আলো এখনও পায় তারা। একটা স্কুল ছিল। চালু আছে কি না কে জানে!

একবার কাজের জায়গা থেকে বেরোতে পারলে, কেউ আর সারাদিনে ফিরে আসে না। ধ্রুব আসত। মর্নিং শিফট থাকলে, বিকেলবেলা শ্রীতমাকে নিয়ে কারখানা কম্পাউন্ডে বেড়াতে আসত। তখন স্কুটার ছিল, ধ্রুবর। কোম্পানির ঝা চকচকে রাস্তায় স্কুটার চালানোর মজাই ছিল আলাদা। এখানে এসে বুক ভরে নিশ্বাস নিত শ্রীতমা। অক্সিজেনের সঙ্গে বেশ কিছুটা আশ্বাসও ঢুকে যেত ওর ফুসফুসে। বাড়ির অমতে ধ্রুবকে বিয়ে করার জন্য কোনও খেদ থাকত না।

এখন এই রাস্তায় স্কুটার চালানোই মুশকিল। শ্রীতমার ফিরে আসার সম্ভাবনার মতোই বন্ধুর হয়ে গেছে পথ।

মেন গেট থেকে বেরিয়ে জি টি রোডে এসে পড়ে ধ্রুব। মেঘটেঘ উড়ে গিয়ে বেশ রোদ উঠছে। সাইকেল চালাতে চালাতে ঘড়ি দেখে ধ্রুব। প্রায় বারোটা। দুপুরের এই সময়টা রবিবার ছাড়া রোজই একটু নার্ভাস থাকে ধ্রুব। বুকের মধ্যে গুড় গুড়ে একটা ভয় ঘুরে বেড়ায়। যেখানেই থাকুক না কেন, দুপুরে একবার বাড়িতে ঢুঁ মারবেই। বারোটা থেকে একটার মধ্যে পাড়ায় পিওন আসে। শ্রীতমা চলে যাওয়ার পরের দিন থেকেই ধ্রুব আশঙ্কায় আছে, আজই বুঝি রেজিস্ট্রি চিঠিটা এল। শ্রীতমা ডিভোর্স চেয়ে পাঠিয়েছে।

কোনও অজ্ঞাত কারণে আজও উকিলের চিঠি পাঠায়নি শ্রীতমা। অথচ ক্ষেত্র প্রস্তুত। শ্রীতমা চাকরিবাকরি করে মোটামুটি স্বাবলম্বী। গত চার বছর ধ্রুবর ব্যাপারে কোনও দুর্বলতাও দেখায়নি। তা হলে কেন এখনও চিঠিটা আসছে না? ধ্রুবর কখনও কখনও সন্দেহ হয়, শ্রীতমা বোধহয় আরও বড় কোনও আঘাত দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। মেয়েকে কেড়ে নেওয়াই ওর একমাত্র লক্ষ্য। ওই একটা ব্যাপারে হেরে বসে আছে শ্রীতমা। আইরিনকে কেড়ে নিলে বাস্তবিকই নিঃস্ব হয়ে যাবে ধ্রুব। কোনও প্ররোচনা ছাড়াই মেয়ে যে তার কাছে আছে, এই অহঙ্কারটা ধ্রুবর জীবনীশক্তি। অথবা জীবনের একমাত্র বিস্ময়। মেয়েটাকে কী দিতে পারে ধ্রুব, ভাল ড্রেস, শৌখিন খাদ্য, ভাল টিউশন কিছুই না। তবু মেয়েটা ভুলেও একবারের জন্য মায়ের নাম মুখে আনে না। ব্যাপারটা যে খুব এনজয় করে ধ্রুব তা নয়। বরং মায়ের প্রতি মেয়েটার যে এই বিদ্বেষ, এটা মোটেই ওর মনের পক্ষে ভাল না। জেনেও মেয়েকে ঘাঁটাতে ভয় পায় ধ্রুব। ইচ্ছে করে মেয়েকে বলতে, ফোনটোন করে মায়ের একটু খোঁজখবর নে। তোর সঙ্গে তো কিছু

হয়নি।—ভেবেও পিছিয়ে আসে। মনে পড়ে শ্রীতমা চলে যাওয়ার পরের পুজোর কথা। কেন জানি শরতের আলো বাতাস, রেললাইনের ওপারে জলার কাশফুল বলছিল শ্রীতমা ফিরে আসবে। খোঁজ নেবে মেয়ের ক'টা জামাকাপড় হয়েছে। একটাও হয়নি দেখে, মামার বাড়ি থেকে আনা দামি ড্রেসগুলো গর্বের সঙ্গে পরিয়ে দিতে দিতে ভর্ৎসনার চোখে তাকাবে ধ্রুবর দিকে। মাথা নিচু করে বসে থাকা ধ্রুব অপমান নয়, আনন্দই লুকোবে।

এল না শ্রীতমা। ধ্রুব অবশ্য পুঁজির টাকা ভেঙেই দামি দামি ড্রেস কিনে দিয়েছিল মেয়েকে। প্রতিবারের মতো দশমীর দিন শিবতলা ঘাটে বসে মেয়েকে নিয়ে ভাসান দেখছিল। আইরিনের মুখ থমথমে। অন্যান্য বার খুব লাফায়। ওকে সামলাতে গিয়ে শ্রীতমার ভাল করে ভাসান দেখা হত না। নিশ্চয়ই শ্রীতমার কথাই মনে পড়ছে মেয়েটার। এই ভেবে আইরিনের মাথায় হাত রেখে ধ্রুব জানতে চেয়েছিল, মন খারাপ হচ্ছে মায়ের জন্য।

ধীরে ধীরে মাথা নেড়েছিল আইরিন। এক বাঁধ জল চোখের ওই পাতলা পাতায় আটকে রেখে বলেছিল, আমার মা তো ভাসান হয়েই গেছে।

কথাটা ছুরির মতো বিঁধে গিয়েছিল ধ্রুবর বুকে। আজও ছুরিটা বয়ে বেড়াচ্ছে ধ্রুব। শত চেষ্টায় ওপড়াতে পারেনি।

বাড়ির গেট খুলে, সাইকেল ঢোকাতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য মাথায় একটা আকাঙ্ক্ষা খেলে যায়। স্বপনের কথা মতো সত্যিই যদি ঘরে গিয়ে দেখে, শ্রীতমা এসেছে। পরক্ষণেই ভাবনাটা মাথা থেকে উড়িয়ে দেয় ধ্রুব। এসব উপন্যাস, সিনেমায় সম্ভব।

বারান্দায় সাইকেল তুলে ঘরে আসে ধ্রুব। অভ্যেস মতো সংশয়ের দৃষ্টিতে চারপাশে চোখ বোলায়। চিঠিটা আসেনি তো!

মা ঘরে আসে, কী রে, এত দেরি হল। চানটান করে নে। মেয়েটাও না খেয়ে বসে আছে।

মা ঘর ছেড়ে চলে গেল। এখন আর জিজ্ঞেস করে না, মিটিং-এ কী কথা হল। আশা ছেড়ে দিয়েছে মা।

যাক, চিঠি যে আসেনি, সেটা অন্তত বোঝা গেল।

জারুলের ডাল নিয়ে ফুলদানির দিকে যায় ধ্রুব। ফুলটা লাগাতে যাবে, মেয়ে এসে পাশে দাঁড়ায়। অদ্ভুত একটা পবিত্র সুগন্ধ আসছে ওর শরীর থেকে। এইমাত্র স্নান করে এসেছে।

মেয়ের সামনে ফুলটা সাজাতে কেমন যেন সংকোচ হয় ধ্রুবর। এ যেন পরিণত সন্তানের সামনে স্ত্রীকে প্রেম নিবেদন।

বাবা, ঠেক মানে কী?

আইরিনের আলটপকা প্রশ্নে রীতিমতো অপ্রস্তুত হয় ধ্রুব। বলে, কেন, হঠাৎ!

ঠেক মানে তো, জুয়ার ঠেক, মদের ঠেক, আরও কী কী সব।

হ্যাঁ, তুই তো জানিস দেখছি। তা হলে!

তুমি কোন ঠেকে যাও? প্রশ্নটা করে বাবার দিকে সরাসরি তাকিয়ে থাকে আইরিন। ধ্রুব মাথা নামিয়ে নেয়। আচমকা আক্রমণে পুরোপুরি পরাস্ত সে। ঠিক শ্রীতমার মতোই জেরা করছে আইরিন। চাউনিটা পর্যন্ত এক।

কী হল, উত্তর দিচ্ছ না কেন? বলো, কোন ঠেকে যাও?

কী সব উলটোপালটা বলছিস, আমি আবার কোন ঠেকে যাব।

আমার কি আড্ডা মারার সময় আছে।—কোনওক্রমে ভাবমূর্তিটা বাঁচানোর চেষ্টা করে ধ্রুব। এখনও বুঝতে পারছে না; মেয়েটা কত দূর কী জেনেছে। আইরিন আবার বলে। কোনও ঠেকেই ভদ্রলোকেরা আড্ডা মারে না বাবা। আজ ক'টা ছেলে এসেছিল তোমার খোঁজে। বলেছে, দুপুরে ঠেকে দেখা করতে।

নকল হাসি হেসে ধ্রুব বলে, ও, বুঝেছি! সোনারা এসেছিল। ওরা একটা ফুটবল টুর্নামেন্ট করবে বলছিল, সেই নিয়েই হয়তো কথা বলতে চায়।

কিছুটা হলেও মিথ্যেটা বিশ্বাস করল আইরিন। খোঁচা হিসেবে বলল, ছেলেগুলোকে দেখে, সোনা, হিরে কিছুই মনে হয় না। টিপিক্যাল বখাটে ছেলে।—একটু থেমে বলে, যাও চান করে নাও তাড়াতাড়ি।

চোর-পায়ে ঘর ছাড়ে ধ্রুব। মনে পড়ে টেলিফিল্মের পরিচালকের কথা। ব্যাটা বলে কি না, ধ্রুব বাজে অভিনয় করে!

স্নান করতে করতে ধ্রুবর আর একটা কথা মাথায় আসে। শুটিং পার্টি বলেছিল, ষোলো সতেরোর মেয়ে দরকার। আইরিন একটু বড় হলেও চলে যাবে। বাবার অভিনয় প্রতিভার কিছুটা কি সে পায়নি? এখন রাজি হয় কি না, সেটাই বড় ব্যাপার।

আইরিন রাজি হলেও, পরিচালকের বোধহয় মুড ভাল ছিল না। দুম করে অপছন্দ করে দিল। দুপুরে খেতে বসে আইরিনকে প্রস্তাবটা দিয়েছিল ধ্রুব। ও এক কথায় রাজি। সেটা সিনেমায় নামার আগ্রহে, নাকি সংসারে সামান্য সুরাহা হবে বলে, বোঝা যায়নি। তবে এখন মনে হচ্ছে বাড়ির কথা ভেবেই রাজি

হয়েছিল আইরিন। কারণ সাইকেলের পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলে উঠল, বাবা, ওরা কত টাকা দিত? একদিনেরই শুটিং ছিল?

কী জানি। বলে সাইকেল গড়িয়ে নিয়ে যায় ধ্রুব। এখানে আসার সময় মেয়েকে সাইকেলে ক্যারি করে নিয়ে এসেছিল। ভরা পেটে ভীষণ ধকল গেছে। ফেরার সময় আইরিন নিজেই বলল, চলো না বাবা, হাঁটতে হাঁটতে ফিরি। জায়গাটা কী দারুণ না!

পরিচালকের প্রত্যাখ্যান কী সহজে ভুলে গেছে মেয়েটা। এর পেছনে একটা গর্বের কারণও আছে। আইরিনকে দেখেই পরিচালক বলে উঠল, এত ভাল দেখতে মেয়ে আমার চলবে না। আপনারই মেয়ে! আপনি দাড়ি কাটেননি কেন? একটু থেমে বলে, আমার গ্রাম্য দেখতে মেয়ে চাই। জ্যাস্ট লাইক পিওর ভিলেজ গার্ল।

দেখতে এগজিবিউটিভ মতো হলে কী হবে, ডিরেকটারটা শালা খ্যাপাটে! আজকেও পাশে বসিয়ে গল্প শুরু করল, কীভাবে এয়ারফোর্স থেকে পালিয়ে আসে। যখনই বুঝতে পেরেছিল পাইলট হওয়া হল না। উলটোপালটা খেয়ে হসপিটালে ভর্তি হয়ে যেত। বাড়ি ফিরে আসার জন্য অ্যাপ্লাই করল। সবই বুঝতে পারলেন এয়ারফোর্সের কর্তারা। ও কে জিজ্ঞেস করলেন, এয়ারফোর্সে তো অনেক কাজ আছে, তুমি কী হতে চাও ডিরেকটার বলেছিল, এ দেশের প্রধানমন্ত্রী। পত্রপাঠ তাকে বিদায় দেওয়া হয়। ভাগ্যিস দিয়েছিল। —এসব গল্পই কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মতো বসে থেকে শুনছিল ধ্রুব। আইরিন ঘুরে ফিরে শুটিং দেখছে। একটা সিন টেক করে ডিরেকটাব আবার ধ্রুবর পাশে বসে বলল, আপনার ফোন নাম্বার দিন। আপনার মেয়েকে আমার পরের কোনও ছবিতে দরকার হতে পারে।

আমার তো টেলিফোন নেই।

বিরক্ত হয়ে পরিচালক বলে, আপনার তো দেখছি সবই নেই নেই। কীসের মস্তান আপনি!

চমকে আইরিনকে খুঁজেছিল ধ্রুব। ডিরেকটারের কথা মেয়েটা শুনতে পায়নি তো! তখনই চোখে পড়ে প্রোডাকশনের সেই ছেলেটার সামনে দাঁড়িয়ে আইরিন কথা বলছে। ভয় পেয়ে যায় ধ্রুব। ছেলেটা আগের দিনের সব কাণ্ড বলে দিচ্ছে না তো! বোধহয় না মেয়েটা দিব্যি হাসছে।

মেয়ের ভাল কোনও ছবি আছে? জিজ্ঞেস করে ডিরেকটার, এবার 'নেই' বলতে ভয় পায় ধ্রুব। বলে, বোধহয় আছে। পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে

ডিরেকটার বলে, এই ঠিকানায় একটা ফুল ফিগার আর ক্লোজ আপ ছবি পাঠিয়ে দেবেন। সঙ্গে অ্যাড্রেস। কেয়ার অব দিয়ে নিজের আসল নামটা লিখবেন। আপনার নামটা কী যেন?

ধ্রুব রায়। আসল নামটাই মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল তখন। ডিরেকটার খানিকক্ষণ অবাক হয়ে ধ্রুবকে দেখে বলল, ধ্রুব হয়েও আপনি মিথ্যে বলেছিলেন! এ তো নক্ষত্রের অবক্ষয়!

সেই মুহূর্তে কথাটা মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেলেও, এখন মানে হয়ে ফিরে আসছে। নক্ষত্র বলতে ধ্রুবতারা বোঝাতে চেয়েছে, তার ক্ষয়! উরি শালা, লোকটা ঘ্যাম আঁতেল আছে তো! গালে দাড়িফাড়ি নিয়ে আমার সঙ্গে কথাটা বেশ মানিয়ে গেছে। —ভাবতে ভাবতে গালে হাত বোলায় ধ্রুব। মনে মনে বলে, দাড়ি কী আর সাধে রাখি রে ভাই, একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলেই পাশের বাড়ির বেড়ালিটার চোখ চকচক করে ওঠে। এই তো ক'দিন আগে সোনার ছেলের জন্মদিন ছিল, বিকেলে একটু মাঞ্জা দিয়েছে ধ্রুব। পুতুল ঘরে এসে বলে, ও মা কী ফ্যান্টাস্টিক লাগছে তোমায় ধ্রুবদা। কে বলবে অতবড় একটা মেয়ে আছে তোমার।

চুপ কর, চেঁচাস না। পাশের ঘরে মা আছে। বলে সতর্ক করেছিল ধ্রুব। কিন্তু কে কার কথা শোনে। পুতুল গ্যাঁট হয়ে বিছানায় বসে বলে, বেশ করব চেঁচাব। জেঠিমা কি জানে না তোমার আমার সম্পর্ক। তোমার প্রতি আমার দুর্বলতা আছে দেখে, তোমার অনেক কাজ আমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছে। 'ও রে ধ্রুবর জার্সি, প্যান্টটা একটু কেঁচে দে' 'ধ্রুব কলেজ থেকে ফিরেই অমুকটা খেতে চাইবে, এনে দে না ভাই' 'লক্ষ্মী সোনা ওর ঘরটা গুছিয়ে দে' কী খাটান খাটিয়েছে! যেই তোমার বিয়ের কথা শুরু হল, ওমনি জাত, ঘর এসব চলে এল। ঠিক হয়েছে। জেঠিমার এরকম শাস্তিই দরকার ছিল। শেষ বয়সে বউমার হাতে সেবা যত্ন পেলেন না।

কী হচ্ছে কী পুতুল। বলে ধমক মেরেছিল ধ্রুব। মেয়েটার ওপর রাগও করা যায় না। ভালবাসা ভুলে বিয়েতে বসতে যাচ্ছিল, সেটাও পণ্ড হল। বিয়ের ঠিক চারদিন আগে তালা পড়ে গেল কারখানায়। প্যান্ডেলের বাঁশ খাটানো হয়ে গেছে ওদের উঠোনে। সেই ফাঁকা খাঁচার মাঝখানে মাথায় হাত দিয়ে বসে অঘোরকাকা।

ধ্রুব গিয়েছিলে সান্ত্বনা দিতে। বলেছিল, ভেঙে পড়ার কী আছে! লকআউট এখন আকছার ঘটনা। কিছুদিন পর আবার খুলেও যায়। জুটমিলগুলো দেখছ না। বিয়েটা হয়ে যেতে দাও। তারপর সব সামলে নেওয়া যাবে।

হতাশ চোখ তুলে অঘোরকাকা বলেছিল, জুটমিল খোলা বন্ধ ওদের ব্যবসার

অঙ্গ। আমাদের তো তা নয়। ব্যবসা গুটিয়ে নিচ্ছে মালিক। আর খুলবে না। অনেক ধার বাকি করে বিয়েটা দিচ্ছিলাম, এখন শোধ দেব কী করে। বিয়েটা ভাবছি ভেঙেই দি।

মাথা খারাপ হয়েছে তোমার। দিনক্ষণ ঠিক হয়ে যাওয়া মেয়ের বিয়ে কেউ ভেঙে দেয়। বিশেষ করে আমাদের মতো সাধারণ ফ্যামিলিতে। তুমি ভেব না। আমি দেখছি খরচাপাতি কীভাবে কমানো যায়। তেমন বুঝলে চাঁদা তুলব। ছেলের বাড়িতে গিয়ে বারণ করব নগদ নিতে।

কথা মতো দিনরাত এক করে ধ্রুব নেমে পড়ল টাকা জোগাড় করতে। ওর হাবভাব দেখে শ্রীতমা বলল, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, অন্য কোনও অফিসে কাজ কর। কারখানা তো তোমারও বন্ধ হয়েছে। এবার ভাবো কীভাবে সংসারখরচ জোগাড় করবে। তা না, পরের মেয়ের বিয়ে দিতে টোঁ টোঁ করে ঘুরে মরছে।

সব সময় নিজেদের স্বার্থ দেখলে চলে না। ওদের বিপদ আরও বেশি। পুতুলের বিয়েটা হয়ে যাক, তারপর ঠান্ডামাথায় রোজগারের কথা ভাবা যাবে। তা ছাড়া ফ্যাক্টরি তো চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়নি, কয়েকটা সমস্যা মিটে গেলেই ফের খুলবে।

ধ্রুবর আশ্বাসবাণী মোটেই গ্রাহ্য করেনি শ্রীতমা। প্রসঙ্গ উত্থাপনের লক্ষ্য তার ভিন্ন ছিল। তারপরই সেই মোক্ষম কথাটা বলে, ও সব কথা তোমার কলিগদের বুঝিয়ো। আমি ভাল করেই জানি, কেন তুমি পুতুলের বিয়ে নিয়ে এত উঠে পড়ে লেগেছ। মেয়েটাকে পার করতে পারলেই তুমি নিশ্চিন্ত।

কীসের নিশ্চিন্ততা, কীসের? কী বলতে চাইছ তুমি? বলে উঠলেও গলায় তেমন জোর ছিল না ধ্রুবর। কথা বাড়ায়নি শ্রীতমা। সরে গিয়েছিল সামনে থেকে।

শ্রীতমার সন্দেহ পুরোপুরি মিথ্যে ছিল না। বিয়ের পর থেকেই সে দেখে আসছে এ বাড়িতে পুতুলের অবাধ গতিবিধি। কথায় এবং হাবেভাবে পুতুল সবসময়ই বুঝিয়ে দেয়, ধ্রুবদার বিয়ের আগের জীবনটার কত কিছুর হদিস সে জানে।

সত্যি বলতে কী, শ্রীতমা, পুতুল বসে গল্প করলেই এক ধরনের আশঙ্কামিশ্রিত অস্বস্তি শুরু হত ধ্রুবর। কথার ঝোঁকে পুতুল না বলে ফেলে সেইসব নির্জন দুপুর, নিষিদ্ধ বিকেলের কথা। কৈশোর থেকে যৌবনের অস্পষ্ট গোপন রাস্তাটা ধ্রুব পার হয়েছে পুতুলের হাত ধরেই।

পূর্ণ যুবক হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ধ্রুব টের পায়। তার জগৎটা হঠাৎ বড় হয়ে গেছে। অনেক সুন্দরী, বিদুষীর মুগ্ধ দৃষ্টি কাড়তে সমর্থ হচ্ছে সে। পুতুলকে ভুলে যেতে সময় লাগে না।

শ্রীতমা সেই সব সুন্দরী, বিদুষীদের মধ্যে নির্বাচিত একজন। ধ্রুবর বিয়ের কথা চলছে শুনে অঘোরকাকা খুবই কুণ্ঠিতভাবে প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। সম্ভবত পুতুল ও কাকিমার প্ররোচনাতে। বাবা মাছি তাড়ানোর মতো প্রস্তাবটা উড়িয়ে দেয়। বলে, ধ্রুব তো নিজের পছন্দ করা পাত্রীকেই বিয়ে করছে।

দ্বিধা ভরা কণ্ঠে অঘোরকাকা বলে, আসলে ওরা একে অপরকে অনেকদিন ধরে চেনে। ধ্রুবর বিয়ের কথা শুনে পুতুল নাওয়া খাওয়া বন্ধ করেছে, তাই বলছিলাম...

বাবা বুঝতে পেরেছিল, অঘোরকাকা আসলে কী বলতে চাইছে। গুম মেরে গিয়েছিল। মা বংশমর্যাদার কথা খেয়াল করিয়ে দিয়ে অবস্থা সামাল দেয়।

ধ্রুবর বাবা ব্যাঙ্ক-চাকুরে। একটু নির্জনে থাকবে বলে দক্ষিণ মজিদপুরে অনেকটা জায়গা নিয়ে বাড়ি করেছে। প্রতিবেশী অঘোরকাকা আগে ইলেকট্রিক মিস্তিরি ছিল। পরে রজার কোম্পানির মেনটেনেন্স স্টাফ। তার ওপর জাত বিচারে অনেক নীচের সারির।

অঘোরকাকারা নিজেদের গুটিয়ে নেয়। শ্রীতমা এসেছিল রাজহংসীর মতো। কাঙ্খিত হ্রদ ততটা নিরুপদ্রব ছিল না। পায়ের পাতায় জলজ গুল্মের মতো জড়িয়ে থাকত পুতুল। তবু চলে যাচ্ছিল দিন। কারখানা বন্ধ হল। রাজহংসীর গায়ে লাগল কালো ছোপ। শ্রীতমার যা একটু ভরসা ছিল ধ্রুবর ভালবাসার ওপর। সেই ভালবাসায় ফাটল ধরায় ধ্রুবর একদিনের ব্যর্থতা। ভুল বোঝে শ্রীতমা।

ধ্রুব জানত না শ্রীতমার ডানায় ছিল পরিযায়ী পাখির মতো ক্ষমতা। উড়ে যায় সে। শাবকটি থেকে যায় এই পচা হ্রদে। মেয়েটাই এখন ধ্রুবর আড়াল। নয়তো যে কোনও মুহূর্তে পাশের বাড়ির বিড়ালি থাবা বসিয়ে শোধ নিতে পারে পুরনো প্রত্যাখানের।

বাবা, এগুলো কী ফুল গো? চাষ হচ্ছে। রাস্তার পাশের জমিতে আঙুল তুলেছে আইরিন। ধ্রুবর খুব মজা লাগে। হাসতে হাসতে বলে, খুব কমন গাছ। প্রায়ই এর ফল আমরা খাই। পাতার নীচে দেখ, সেগুলো ঝুলছে।

জমির দিকে এগিয়ে যায় আইরিন। পাতার নীচটা লক্ষ করে লাফিয়ে ওঠে, ওমা, এটা তো ঢ্যাঁড়শ গাছ। তার এত সুন্দর বাসন্তী রঙের ফুল! মাঝে আবার মেরুন

ছোপ। আমি সিওর আমার কোনও বন্ধু ঢ্যাঁড়শ ফুল দেখেনি। দেখলে বলত।

জমিজমার ওপর আবিষ্কারের আগ্রহে চোখ বোলায় আইরিন। ধ্রুব সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। রোদে লেগেছে বিকেলের রং। প্রথমে ধ্রুবর চোখেই পড়ে। বলে, ওই দেখো আইরিন, সূর্যমুখী চাষ হচ্ছে।

মেঠো রাস্তার বাঁদিকে এবার হাত তুলেছে ধ্রুব। আইরিন প্রায় লাফিয়ে চলে আসে। বেশ কিছুটা দূরে সূর্যমুখী খেতের আড়ালে চলে গেছে নীল প্রান্তর। বিস্ময়াবিষ্ট আইরিন স্বগতোক্তির মতো বলে ওঠে, সূর্যমুখী ফুলগুলোকে দেখলে মনে হয় না আকাশকে কিছু বলতে চাইছে?

আইরিনের কথায় গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে ধ্রুবর। কী নিবিড় অনুভূতির কথা বলল তার মেয়ে! কোনও সাক্ষী রইল না। এটা যে আইরিনের কথা, বিশ্বাস করানো যাবে না কাউকে।

চার পাশে ফসল ওগড়ানো গর্বিত জমির দিকে চেয়ে থাকে পিতা-পুত্রী। প্রকৃতি কত পরিপূর্ণ! কোথাও কোনও অভাব নেই। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া কালো মেঘ। তার নীচে ছোট ছোট এক ঝাঁক পাখি ওড়াউড়ি করছে।

মেয়েকে সিনেমায় নিল না বলে আর কোনও আক্ষেপ থাকে না ধ্রুবর। মনে হয় যেন সিনেমার বাতিল কোনও রিলে তারা নিজেরাই ঢুকে পড়েছে। বেরিয়ে আসতে ইচ্ছেই করছে না।

কিন্তু ফিরতে তো হবেই। সোনার ছেলেগুলো দেখা করতে বলে গেছে। মেয়ের ভয়ে দুপুরে আর যায়নি। এখানে চলে এসেছে। শুটিংয়ে আসার পথে মনে মনে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল ধ্রুব, আজ থেকেই শুরু হবে মেয়ের অন্য জীবন। ওর অভিনয় দেখে চমকে উঠবে সবাই। পর পর অফার আসবে। ঘুরে যাবে ধ্রুবদের ভাগ্যের চাকা। কিছুই হল না। বেশি প্রোডাকশান হয়ে গেছে, বিক্রি নেই অজুহাতে কোম্পানি যেমন বন্ধ হয়ে যেত, আইরিনের অতিরিক্ত সৌন্দর্যের কারণে সে বাতিল হয়ে গেল। প্রাচুর্যের কারণে অভাব। গোলমেলে ইকনমিক্স। মাথায় ঢোকে না ধ্রুবর।

বাবা, এবার থেকে আমরা এখানে প্রায়ই আসব।

আচ্ছা।

কত রকম অচেনা গাছ পাখি, তুমি সবার নাম জানো?

কিছু কিছু জানি। এগুলোই এক সময় মজিদপুরেও ছিল। শহর বেড়ে যেতে সব উধাও হয়েছে। বলতে বলতে ধ্রুবর খেয়াল হয়, শহরও হারিয়ে যাচ্ছে। আজকেই তো দেখে এল ফ্যাক্টরির কম্পাউন্ড জুড়ে আগাছা, ভাঙা রাস্তা।

মজিদপুরের বাড়ি, রাস্তাঘাটের কোনও উন্নতি নেই। আসলে শহরের হার্ট রজার কোম্পানিই যদি অসুস্থ থাকে, তা হলে যা হয়।

তুমি মাকে নিয়ে কখনও এখানে এসেছ?

মাথা নাড়ে ধ্রুব। মুখ গম্ভীর হয়ে যায় মেয়ের। যেন এখানে না-নিয়ে আসার জন্যই ওর মা চলে গেছে।

নে, এবার সাইকেলে উঠে পড়। এখন অনেকটা রাস্তা।

ধ্রুবর কথায় সাইকেলের সামনের রডে উঠে আসে আইরিন। বাবা-মেয়ে কোনওদিন রিলিজ হবে না, এমন একটা সিনেমার ফ্রেম থেকে বেরিয়ে যেতে থাকে।

স্টেশনের কাছে গোপলার দোকানে আড্ডা মারছিল সোনার চ্যালারা। সাইকেলে ধ্রুবকে দেখে এক সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। ধ্রুব কিছুটা এগিয়ে গিয়ে, হাতের ইশারায় বলে, পরে দেখা করছি।

গতকাল বাবার কাছে এসেছিল কাজল। আজ দুপুরেই ফিরে যাচ্ছে মজিদপুরে। এখন সে হাওড়া স্টেশনে। তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে ফাঁকা গাড়ি। কোথায় যাবে এখনও ঘোষণা হয়নি।

দুপুরের দিকটা তবু লোকাল ট্রেনে চড়া যায়। বিকেল হতে না হতেই ক্লান্ত কলকাতা তার বোঝা নামিয়ে দিয়ে যায় শিয়ালদা, হাওড়া স্টেশনে।

এই লাইনে যাতায়াতের অভ্যেস নেই কাজলের। আগেরবার ভারী বিপদে পড়েছিল। ভিড় এড়াতে একটা দুটো ট্রেন ছাড়ার পর দেখে, পিল পিল করে লোক বাড়ছে। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই বৃদ্ধ মহিলা, যুবক সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল।

নির্লজ্জের মতো সিট দখল নিল সমর্থ যুবকরাই। তারপর ভিড় ভেদ করে উঠে গেল হয়তো সদ্য ভেলোর থেকে ফেরা কোনও বৃদ্ধ হার্ট পেশেন্ট। কারও প্রেমিকা হয়তো ঝুলছে লেডিস কামরায়। বাড়ি ফেরার তাড়া ছাড়া কারও মুখেই আলাদা কোনও অভিব্যক্তি নেই। বাড়ির লোক যেন তাদের জন্য অধীর অপেক্ষায় আছে।

অনেকেরই থাকে না। বাড়ি ফিরে শুরু হয় অন্য লড়াই। আসলে মানুষ ভীষণ ভাবে বাঁচতে চায়। কেন, সে নিজেই জানে না। কত সামান্য উপকরণে মানুষ তার

জীবনটা দিব্যি কাটিয়ে দেয়। এই ক্ষুদ্র আয়োজনের মধ্যে নিশ্চয়ই অদৃশ্য কোনও মায়াবন্ধন আছে। যার খোঁজ এখনও পায়নি কাজল।

মজিদপুরের কোনও কলোনি দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে কাজল দেখেছে, কোনও বাড়িতে দক্ষযজ্ঞ ঝগড়া লেগেছে। দু' দিন পরে সেখানে গিয়ে দেখে, একই বাড়ি থেকে ভেসে আসছে সন্ধ্যাকালীন গানের রেওয়াজ। ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত কাজলের কাছে ব্যাপারটা বড় রহস্যময় লাগে। অথচ এই রহস্যের স্বাদ সে অনায়াসে পেতেই পারত।

ঘোষণা হল তিন নম্বরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনটি বর্ধমান লোকাল। এখনই ছাড়বে। সামনের দিকে উঠবে বলে এগিয়ে যায় কাজল। লেডিস কামরা পেরনোর সময় হোঁচট খায় দৃষ্টি, সামনের জানলায় আইরিন না!

দাঁড়িয়ে পড়ে কাজল। নিশ্চিত আইরিন। তবে আজ বেশ অন্যমনস্ক। বসার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় একা, সঙ্গে কেউ নেই। কোথায় এসেছিল এদিকে? কাজলের একবার মনে হয়, জানলায় গিয়ে জিজ্ঞেস করে, এই যে স্মার্ট মেয়ে, কী ভাবে আমার ফোন নাম্বার পেলে? পরক্ষণেই ভাবনাটা মাথা থেকে তাড়িয়ে দেয়, কী দরকার বাবা. হঠাৎ যদি চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। ইভটিজিং-এর বাজারে বেফালতু গণধোলাই খেয়ে যাবে কাজল।

একটা বিশমনি লোকের আড়াল বেছে লেডিস কামরা পার হয় কাজল। উঠে পড়ে ট্রেনে।

দু'-তিনটে স্টেশন যেতেই আলগা হতে শুরু করে শহর। ট্রেনের দু'পাশে মাঠ, পুকুর, গাছপালা দেখা যায়। চোখটাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। উত্তরপাড়া পেরোল ট্রেন। এরপরই হিন্দমোটর স্টেশন। এখানেই ভারতের বিখ্যাত অটোমোবাইল কারখানা। পশ্চিমবঙ্গের গর্ব। গতবছর দিল্লিতে গিয়ে এই গর্বটা ধূলিসাৎ হয়েছে কাজলের। ছোট পিসিরা চিত্তরঞ্জন পার্কে থাকে। পিসতুতো দিদি ঈশানীর সঙ্গে কাজলের ছোট থেকে একটা ব্যাপারেই কম্পিটিশন। কলকাতা আর দিল্লি নিয়ে। কোন শহরটা ভাল। কোনও কোনও সময় প্রতিযোগিতাটা রাজ্য স্তরে চলে যেত।

এখন দু'জনেই বড় হয়ে গেছে। ঝগড়াটা তুলতে লজ্জা পায়। ঈশানীদি কিন্তু সুযোগ পেলেই চোরাগোপ্তা লেগপুল করে। এই যেমন লাস্ট অক্টোবরে ঈশানীদি নিজে ড্রাইভ করে ঘোরাচ্ছিল দিল্লি। ওদের এখন ওয়াগানর গাড়ি। রাস্তায় যখনই কোনও অ্যামবাসাডার দেখেছে, বিরল প্রজাতি আবিষ্কারের মতন চেঁচিয়ে উঠেছে, ওই দেখ কাজল, তোদের অ্যামবাসাডর।

চারদিন ঘুরে মাত্র ছ'টা অ্যামবাসাডার চোখে পড়েছিল কাজলের।

হিন্দমোটর স্টেশন ছাড়ল ট্রেন। কারখানার বাউন্ডারিও শেষ হল। এরপর বিস্তীর্ণ জলাভূমি। জমিটা সম্ভবত কোম্পানির। কারখানাটা বাড়ানোর পরিকল্পনা ছিল হয়তো।

জলাভূমির ভেতর দিয়ে আঁকা বাঁকা পাকা রাস্তা। ড্রাইভওয়ে। দেবদারু গাছে মোড়া। ট্রেনে বসেই কাজল দেখতে পেল, ঘোমটা দেওয়া রাস্তায় একটা প্রাচীন মডেলের নতুন গাড়ি ট্রায়াল দিচ্ছে। যেন বাতিল নায়িকা অভাবের তাড়নায় ফের সেজেগুজে প্রস্তুতি নিচ্ছে দর্শকদের সামনে আসার।

পশ্চিমবঙ্গের কি সত্যিই আর নতুন কিছু দেওয়ার নেই? শিল্পক্ষেত্র কি এতটাই শুকিয়ে গেছে! তাই হয়তো হবে। না হলে বাবার হাতে তৈরি করা ছোটখাটো অ্যাড এজেন্সি এতদিন তো দিব্যি চলছিল। কোনওদিন বিজনেস নিয়ে বাবাকে টেনশান করতে দেখেনি কাজল। বাড়িতে থাকাকালীন অফিসের কথা তুলতই না প্রায়। সেই অফিসের এফিসিয়েন্ট ম্যানেজার নারায়ণকাকু হঠাৎ গোপনে ফোন করে কাজলকে কেন ডেকে পাঠাবে?

মজিদপুরের বাড়িতে ফোনটা এসেছিল পরশু রাতে। নারায়ণকাকু বলল, বাড়ি থেকে করছি। তোমাকে ফোন করেছি জানলে বস রাগ করবে। তুমি কবে আসছ কলকাতায়।

বুকটা ছ্যাৎ করে উঠেছিল কাজলের। নার্ভাস গলায় জানতে চায়, কেন, কী হয়েছে কাকু?

তেমন কিছু নয়। অফিসে একটা ক্রাইসিস চলছে। পুরনো এক ক্লায়েন্ট খুব ভোগাচ্ছে পেমেন্ট নিয়ে। বিগ অ্যামাউন্ট। তবে সমস্যাটা সেখানে নয়।

তা হলে কোথায়?

সমস্যাটা তোমার বাবাকে নিয়ে! এই ধরনের ক্রাইসিসে আমরা আগেও পড়েছি। বস-এর ক্যারিশমায় সেই গাঁট পার হয়েছি ইজিলি। কিন্তু এবার যেন বস একটু বেশি টেনশান করছে। লাঞ্চ ফাঞ্চ ঠিকমতো করছে না। ঘনঘন চা, সিগারেট। কাল তো ঘণ্টা দুয়েক খুব আপসেট ছিল। চেম্বার বন্ধ করে শুয়েছিল চুপচাপ। নারায়ণকাকুর কথা শুনে বাবার জন্য খুবই দুশ্চিন্তা হচ্ছিল কাজলের। কিন্তু তার ঠিক কী করণীয় বুঝে উঠতে পারছিল না। বাবার বিজনেসের ব্যাপারে কোনওদিনই সে নাক গলায় না। জানেও না কিছু।

কাজলকে ভাবতে দিয়ে নারায়ণকাকু আবার বলল, ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমাদের বিজনেসের স্কোপ চিরকালই কম। এখন কম্পিটিশান আরও বেড়েছে। এসব ব্যাপারে বস ভেরি মাচ অ্যাওয়ার। আমার ধারণা, তুমি এখানে নেই বলে, বস এত

সহজে ভেঙে পড়ছে। বস-এর ভেতর থেকে পজেটিভ ফোর্সটাই যাচ্ছে হারিয়ে।

আমি তো বেশিরভাগ সময় হোস্টেলে কাটিয়েছি কাকু। বাবা আমার কম্পানি না পেয়ে অভ্যস্ত।

তখন তোমার মা ছিল।

নারায়ণকাকুর ওই কথাটা শুনে চিলতে শ্লেষের হাসি ফুটে উঠেছিল কাজলের ঠোঁটে। কাকুকে তো বলা যায় না। বাবা-মাকে একসঙ্গে বসে কোনওদিন গল্প করতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না আমার। কাকু বলে যাচ্ছে, আসলে কী জানো, একটা বয়সের পর অতি ক্ষমতাবান মানুষেরও পাশে একজনকে দরকার হয়। তা ছাড়া ভবিষ্যতে এই কোম্পানিটা তো তোমাকেই দেখতে হবে। কাজটাজগুলো একটু বুঝে নাও।

ভবিষ্যৎ-এ কী হবে না হবে, সেটা পরের ব্যাপার। তবে কাল আমি যাচ্ছি। বলে ফোন রাখতে যাচ্ছিল কাজল। কাকু আবার সতর্ক করে দেয়, ঠিক আছে কাল এসো, পারলে অফিসেই চলে এসো। আমি ফোন করে ডেকেছি, বস বুঝতে না পারে।

বুঝতে দেয়নি কাজল। হঠাৎ উপস্থিত হয়েছিল তাদের বউবাজার অফিসে। বাবা যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না এমনভাবে তাকিয়েছিল, তুই হঠাৎ!

এমনিই। ঘুরে গেলাম।

বাড়ি গিয়েছিলি?

না।

চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বাবা বলল, থাকবি তো ক'টা দিন? ওখানে ক্লাস শুরু হয়েছে?

বাবার কথার উত্তর না দিয়ে কাজল বলেছিল, তোমাকে একটু শুকনো শুকনো লাগছে, শরীর খারাপ নাকি?

না না, শরীর খারাপ হবে কেন! একটু ট্রেস পড়ছে হয়তো। এসময় আমাদের ভীষণ কাজের চাপ। তুই বোস। আমি মিনিট পনেরোর মধ্যে একটা কাজ সেরে আসছি।

বাবার ছেড়ে যাওয়া সিংহাসন সদৃশ চেয়ারে গিয়ে বসেছিল কাজল। গদিমোড়া রিভলভিং চেয়ার। অল্প এপাশ ওপাশ করছে কাজল, চোখ পড়ে দরজায়। নারায়ণকাকু দাঁড়িয়ে মুগ্ধ চোখে দেখছে কাজলকে। কাকু যেন মন্ত্রী। দৃষ্টিতে আগামী রাজার সম্ভাষণ। যদিও কাজল জানে না, এই রাজ্যপাটের অবস্থা কতটা সঙিন।

নারায়ণকাকু এগিয়ে এসে বলে, আমি ফোন করেছিলাম, বস-কে বলোনি তো?

না। কিন্তু তিনি গেলেন কোথায়? চেহারাটা যা দেখলাম। সত্যিই খারাপ হয়েছে।

সামনের চেয়ারে বসে কাকু বলে, তুমি আসতেই বস-এর মুড ভাল হয়ে গেছে। অতুলের রেস্টোরেন্টে কফি খেতে গেল। মুড ভাল কি না বোঝার এটাই সাইন। অফিস অ্যাটমোসফেয়ারের বাইরে গিয়ে কফি খেয়ে আসে।

কাজলের খুব মজা লাগে। কাজ-পাগল বাবার এরকম একটা ইন্টারেস্টিং হ্যাবিট আছে জানত না সে।

দেখতে দেখতে বাবার চেম্বারে সব স্টাফ চলে আসে। স্টাফ বলতে, সাত, আটজন। অফিসের আবহাওয়া একদম পারিবারিক। সবাই কাজলকে ঘিরে বসে, দাঁড়ায়। হালকা আড্ডা চলে। মূলত বাবার নানারকম অভ্যেস, আচরণ নিয়েই কথা হয় বেশি। স্টাফেদের মুখে কিন্তু কোনও টেনশানের ছাপ নেই। ওদের মধ্যে একটা অল্প বয়সি, সুন্দরীকেও দেখতে পেল কাজল। নতুন রিক্রুট বোধহয়। অদূরে দাঁড়িয়ে সম্ভ্রম আর মুগ্ধতা মেশানো দৃষ্টি নিয়ে আগামী মালিককে দেখে যাচ্ছে।

তখনই কাজলের একবার মনে হয়, এরা যদি কখনও জানতে পারে তার জন্মপরিচয়ের হদিস। তা হলেও কি এতটা সম্ভ্রম দেখাবে? হয়তো দেখাবে, ওপর ওপর।

ট্রেনের বাইরে এখন খোলা প্রান্তর। পড়ন্ত রোদে চোরা বিষণ্ণতা। মন খারাপ হতে গিয়েও হয় না কাজলের। খেয়াল হয় এই ট্রেনেই আইরিন আছে। জার্নিটা বেশ রোমাঞ্চকর লাগে। ভাগ্যিস আইরিন তাকে দেখেনি, নইলে এতক্ষণে হয়তো দু' কামরা এগিয়ে এসে বসত এখানে। বলত, আমাকে দেখে বারবার পালিয়ে যান কেন বলুন তো!

কাজলের ধারণা ভুল। মোটা লোকটার আড়ালে যাওয়ার আগেই আইরিন ওকে দেখেছে। মেয়েরা যে ত্রিনয়নের অধিকারী কাজল জানে না। এক নয়ন অদৃশ্য থাকে।

ইচ্ছে থাকলেও কাজলের কম্পার্টমেন্টে যায়নি আইরিন। তার আজ মন খারাপ। ফোনে মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে, আইরিন আজ গিয়েছিল বেলেঘাটায়। যদিও জানত মা অফিসে থাকবে। তবু খোঁজ তো পাওয়া যাবে।

অফিসের নাম্বারটাও নিয়ে নেবে মামির কাছ থেকে। আজ কার মুখ দেখে উঠেছিল কে জানে! গিয়ে দেখে, মা অফিস যায়নি। বলল, শরীর ভাল লাগছিল না। তোর জন্যেও চিন্তা হচ্ছিল। কেন যে বোকার মতো ফোন নাম্বারটা দিলাম না সেদিন। এ বাড়ির লাইনটা সেই যে খারাপ হয়েছে, এখনও ঠিক হওয়ার নাম নেই। ভাগ্যিস তুই আজ এলি। না হলে কাল আমিই চলে যেতাম মজিদপুরে।

মজিদপুরে গেলেও বাড়ি যেত না মা। নয় স্যারের ওখানে, নাচের স্কুলে অথবা রাস্তায় দেখা করত। ব্যাপারটা ভাল লাগে না আইরিনের। তাই দরকার বুঝলে, নিজেই চলে আসে মামার বাড়িতে। এ বাড়িতে বড়মামা আর মামি থাকে। এক ছেলে সুমিতদা বাঙ্গালোরে। কোন একটা কলেজে পড়ায়।

মামা-মামি দু'জনেই শুধু ভাল নয়, রীতিমতো উঁচু মনের শিক্ষিত মানুষ। আইরিন এলে যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করে, কখনওই কোনও অপ্রিয় প্রসঙ্গ তুলে আইরিনকে অস্বস্তিতে ফেলে না। মাকেও যথেষ্ট কেয়ারে রেখেছে। তাও কেন যে মা আজ হঠাৎ ওই কথাটা বলল, এখনও পরিষ্কার হচ্ছে না আইরিনের কাছে।

মামি খাবার দিয়ে চলে যাবার পরই মা চাপা গলায় বলল, খুব শিগগিরি আমি একটা ফ্ল্যাট নিচ্ছি বাইপাসে। হায়ার সেকেন্ডারির পর তুই এখানে এসে থাকবি। ভর্তি হবি কলকাতার কলেজে।

আইরিনকে নিজের কাছে রাখার জন্য, এই ধরনের কথা মা আগেও বলেছে। কিন্তু ফ্ল্যাট নেওয়ার পরিকল্পনা এই প্রথম। তা হলে কি মামা-মামি মায়ের সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করেছে? বিষয়টা একটু ঘুরিয়ে জানতে চায় আইরিন, ফ্ল্যাট কেনার এত টাকা কোথায় পাবে তুমি?

—হাউস বিল্ডিং লোন নেব। এই অফিসের স্যালারিটা ভাল। শোধ করতে অসুবিধে হবে না।

—তুমি তো এক অফিসে বেশিদিন চাকরি করো না। এ চাকরিটাও যদি কোনও কারণে ছেড়ে দিতে হয়।

কী যেন ভেবে নিয়ে মা বলে, মনে হচ্ছে এই অফিসে টিকে যেতে পারব।

মায়ের চাকরি টেকা না-টেকা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই আইরিনের। চিন্তা হচ্ছে ফ্ল্যাট নেওয়ার ব্যাপারটায়। ফ্ল্যাট থেকে উপড়ে মাকে মজিদপুরে নিয়ে যাওয়া বেশ সমস্যার হবে। এতদিন আইরিন অপেক্ষায় থেকেছে ভাল সময়ের, যদি বাবার ফ্যাক্টরিটা আবার খুলে যায় অথবা স্থায়ী কোনও রোজগারের সন্ধান পায় বাবা। মাকে জোরজার করে মামার বাড়ি থেকে নিয়ে যাবে। কিন্তু ফ্ল্যাট নেওয়া মানে তো আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে যাওয়া।

কী রে, কী ভাবছিস? থাকবি তো আমার সঙ্গে এসে?

আমি তো ওখানে খারাপ নেই মা।

যথারীতি বিরক্ত হয় মা। বলে, আমি বলেছি, তুই ওখানে খারাপ আছিস? মজিদপুরে ভাল কলেজ নেই। পড়াশোনার পরিবেশ নেই ওখানে। তোর কেরিয়ারের জন্যেই বলছি, কলকাতার কলেজে এসে ভর্তি হতে।

মজিদপুরে না থাকুক বর্ধমানে ভাল কলেজ আছে। অনেকেই ভাল রেজাল্ট করেছে ওখান থেকে।

মা একটু দমে যায়। বোঝানোর মতো করে বলে, সেটা মানছি। কিন্তু যাতায়াতের খরচা, প্রফেসারের কাছে পড়া, তোর বাবার ওপর চাপ পড়ে যাবে না?

বিনয়ের পোশাকে মা আবার নিজের জেদের দিকে চলে যাচ্ছে দেখে, একটু কঠোর হয় আইরিন। বলে, বাবার হাতে তো আজকাল টাকাপয়সা থাকে। আমাদের কোনও অসুবিধে হয় না।

তাই না কি! তা এখন সে করে কী? শ্লেষের সুরে জানতে চায় মা। আইরিন বলে, বিল্ডিং মেটেরিয়াল সাপ্লাই। —জমির দালালিটা বলে না আইরিন। 'দালালি' শব্দটা বাবাদের পাশে মানায় না।

বিল্ডিং মেটেরিয়াল মানে তো অনেক টাকার ব্যাপার। ক্যাপিটাল পেল কোথায়? ভ্রূ কুঁচকে জানতে চায় মা। আইরিন উত্তর দিতে পারে না। ইদানীং বাবা একটু সচ্ছল হয়েছে, বাড়ির বাজার দোকান করে। আইরিন কিছু চাইলে সঙ্গে সঙ্গে টাকা বার করে দেয়।

অবাক হয়ে আইরিন একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, বাবা এখন তুমি কী করো?

বাবা বলেছিল, ইট, বালি সাপ্লাই, জমির দালালি।

সংসারের কথা ভেবে, 'দালালিটা ছেড়ে দাও' বলতে পারেনি আইরিন। অন্য সব বন্ধুদের বাবারা কেউ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাঙ্ক, রেলে চাকরি করে। তার বাবা কী করে? 'বিজনেস', এরকমটাই বলে সে। কিন্তু বাবা টাকা কোথায় পেল, এই প্রশ্নটা মাথায় কেন আসেনি! নিজেকে ভীষণ স্বার্থপর মনে হয় আইরিনের। তার প্রয়োজনটুকু মিটে যাচ্ছে দেখে, আর কিছু লক্ষই করে না। কত কষ্ট করে, কী ভাবে টাকাটা জোগাড় করছে বাবা, সে ব্যাপারে খোঁজই নেয় না।

আইরিনকে চুপ করে থাকতে দেখে মা বলে, আজ হয়তো ওর কাছে টাকা আছে, কতদিন থাকবে ঠিক নেই। অল্প পুঁজির ব্যবসা বেশিদিন স্থায়ী হয় না। কিন্তু তোর হায়ার এডুকেশনের রেগুলার একটা খরচা আছে। হুট করে বন্ধ হয়ে গেলে

তো চলবে না। তেমন হলে তুই বাবাকেই জিজ্ঞেস কর, এখানে এসে থাকবি কি না? দেখবি হয়তো সে রাজি হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করছিস না বলে, নিজে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছে না।

কথাটায় তীব্র খোঁচা আছে। কারণ, তা খানিকটা হলেও সত্যি। আইরিন যদি বাবাকে বলে কলকাতায় গিয়ে থাকব। বাবা হ্যাঁ, না কিছুই বলবে না। আইরিন তো নিজের ইচ্ছেতেই মজিদপুরে আছে। মাথা পেতে নিয়েছে দুঃসময়। বাবা, ঠাম্মাকে ছেড়ে পালিয়ে আসেনি। এই উদারতাটাই মা হয়তো সহ্য করতে পারে না। মায়ের খোঁচাটা হজম করে আইরিন বলে, বাবা নয়, আমাদের জায়গাটা ছেড়ে কোথায় যেতে ইচ্ছে করে না আমার।

মা চুপ করে যায়। একটু সময় নিয়ে বলে, ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখ কী করবি। ফ্ল্যাটটা তোর কথা ভেবেই নিচ্ছিলাম। এখন পিছিয়ে আসা মুশকিল। লোন স্যাংশান হয়ে গেছে। —তারপরই মা প্রতিবারের মতো সেই খোঁজটা নেয়, পাশের বাড়ির সব কেমন আছে রে?

ভালই। বলে উঠে পড়ে আইরিন। বাড়ি ফিরতে হবে বাবা ফিরে আসার আগেই। বাবা জানে না আইরিন গোপনে মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। আর মায়ের কাছে এখন বসে থাকলেই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পুতুলপিসির সম্বন্ধে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করবে। ব্যাপারটা বাতিকের পর্যায়ে চলে গেছে।

বাসে হাওড়া স্টেশন আসতে আসতে আইরিন ভাবছিল, কেন সে সবসময় বাবার পক্ষই নেয়? বাবার খারাপ অবস্থাই কি এর একমাত্র কারণ। হঠাৎ যদি বাবার আর্থিক পরিস্থিতি ভাল হয়ে যায়, সে কি বাবাকে ছেড়ে চলে আসতে পারবে? পারবে না। তা হলে কি সে মাকে ভালবাসে না? তাই যদি হবে, মায়ের খবর না পেয়ে এতদূর ছুটে এসেছিল কেন?

ট্রেনে ওঠার পরও ধাঁধাটা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিছুক্ষণ হল সে বুঝতে পেরেছে, 'ভাল' মানে হল মা। 'বাসা' মানে হল বাবা। এই দুটোকেই আপ্রাণ মেলাতে চাইছে আইরিন। কিছুতেই পারছে না।

আর একটা স্টেশন পরেই মজিদপুর। বাড়ি ফেরার সময় প্রত্যেক মানুষের যেমন একটা তাড়া থাকে, আইরিনের থাকে না। মজিদপুর ছেড়ে তার কোথায় যেতে ইচ্ছে করে না, কথাটা মাকে আজ সে মিথ্যেই বলেছে। মজিদপুরের ওপর তার আলাদা কোনও টান নেই। বাবা-মা দু'জনে মিলে তাকে নিয়ে যদি নিরুদ্দেশেও চলে যায়, আপত্তি নেই।

প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে ট্রেন। তখনই আইরিনের খেয়াল হয়, মজিদপুরে সামান্য

হলেও তার একটা টান তৈরি হচ্ছে। যার ওপর, সে এখন এই ট্রেনেই। মজিদপুরেই নামবে। কিন্তু আজ একদম মুড নেই তার মুখোমুখি হওয়ার। গেটে সবার পেছনে গিয়ে দাঁড়ায় আইরিন। সব থেকে শেষে নামবে।

একই রকম ভেবে কাজলও ট্রেন ছাড়ার শেষ মুহূর্তে নামল। পেছন ফিরে দেখে আইরিন। দু'জনেই হেসে ফেলে।

পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসছে আইরিন। কাজল আর পালানোর চেষ্টা করে না। যেন এমনই কথা ছিল, এইভাবে দু'জন পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। কাজল বলে, কলকাতায় কোথায় গিয়েছিলে?

কাজ ছিল। বিজ্ঞের মতো বলে আইরিন। দু'চার পা হাঁটার পর আবার আইরিন বলে, আপনি তো বাবার কাছে গিয়েছিলেন,না?

বেশ অবাক হয়ে কাজল বলে, তুমি কী করে জানলে! উত্তর না-দিয়ে মিটিমিটি হাসছে আইরিন। সঙ্গে সঙ্গে সেই কথাটাও মাথায় আসে কাজলের, এ বাড়ির ফোন নাম্বারটা পেল কী করে মেয়েটা! জানতে চাওয়ার আগেই আইবিন বলে ওঠে, আচ্ছা, আপনার সঙ্গে তো একবার আমার আলাপ হয়েছে, ফাংশানে। কিছু বলার থাকলে, অনায়াসে বলতে পারেন। পোস্টাফিসের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন কেন?

এর ঠিক কী উত্তর হওয়া উচিত কাজল নিজেই জানে না, ভাগ্যিস গেটের মুখে চেকার দাঁড়িয়েছিল। প্রশ্নটা পাশ কাটাতে, যেচেই নিজের টিকিটটা চেকারকে দেখাল কাজল। গেট পেরিয়ে আইরিনকে বলল, তুমি আমার সম্বন্ধে এত খোঁজখবর পেলে কোথায়?

দুষ্টুমির হাসি চেপে আইরিন বলে, ক'দিন আগে আপনার ছবি দিয়ে কাগজে 'নিরুদ্দিষ্টের প্রতি' বেরিয়েছিল, দেখেননি?

কাজলের এক্সপ্রেশন দেখে খিলখিল করে হেসে ওঠে আইরিন। মেয়েটা যে ভারী ফিচেল, বুঝতে বাকি থাকে না কাজলের। নিজেদের এলাকা বলে আরও সাহস পেয়েছে। হাওড়া স্টেশনে এমনভাবে ট্রেনে বসেছিল, যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না।

এখনও হাসি শেষ হয়নি আইরিনের। তার মধ্যেই বলে, আপনি রূপাকাকিমার ভাইপো। কলকাতায় গ্রাজুয়েশন করে, বর্ধমান ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হয়েছেন। এবং আপনার নাম কাজল।

এতক্ষণে কাজল বুঝতে পারে, কাকির ক্লাবের খুবই ক্লোজ মেম্বার আইরিন। ফাংশানের আলাপ থেকেই কাজলকে চিনে রেখেছে। সম্ভবত সব খবরাখবর

নিয়েছে কাকির কাছ থেকেই। কিন্তু কাকি তো কিছু বলেনি! অবশ্য কাকির যা ভুলো মন।

স্টেশনচত্বরের বাইরে অটোরিকশার ড্রাইভাররা তারস্বরে যাত্রী ডাকছে। রিকশাওলারা যাত্রীদের জন্য মরিয়া ভাবে চঞ্চল। অথচ প্যাসেঞ্জার নেমেছে সামান্যই।

হইহট্টগোল পেরিয়ে ওরা বড় রাস্তায় এসে পড়ে। রাস্তাটা রজার কোম্পানির তৈরি। দু'পাশে সারি সারি প্রাচীন গাছ। বিকেল উতরে যাচ্ছে দেখে, পাখিরা ফিরছে বাসায়। অটো ড্রাইভার, রিকশাওলাব থেকে শিখে, ওরাও খুব হইচই ফেলেছে।

রাস্তাটা এ শহরের মূল শিরার মতন। শীর্ণ চেহারায় যা বড্ড দৃশ্যমান। আইরিন হাঁটতে শুরু করেছে দক্ষিণ মজিদপুরের দিকে। কাজলও সঙ্গে সঙ্গে যায়। এদিকটা তুলনামূলক ফাঁকা ফাঁকা। আগে কখনও আসেনি কাজল। আইরিন হঠাৎ বলে ওঠে, আপনার নাম কাজল কেন? আপনি তো কালো নন। কে রেখেছিল নামটা?

এই ছেলেমানুষি প্রশ্নের কী উত্তর দেবে কাজল! কপট নিরাসক্তিতে বলে, ছোটবেলায় সম্ভবত কালো ছিলাম। এখন ঠিক মনে পড়ছে না।

ধ্যাৎ, ইয়ার্কি মারবেন না। যিনি আপনার নাম রেখেছিলেন, চোখে কি কম দেখতেন?

প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে কাজল বলে, তোমার নামটা কিন্তু খুব রেয়ার। এবার আইরিনের অবাক হওয়ার পালা, অ্যাই, আপনি আমার নাম জানলেন কী করে?

ভেরি সিম্পিল। তোমাদের নৃত্যনাট্য শেষ হওয়ার পর, অ্যানাউন্সমেন্ট থেকে সুরূপার আসল নামটা শুনে নিয়েছিলাম। এখন একটাই প্রশ্ন. এরকম বিদেশি নাম তোমাকে কে দিল? গলসওয়ার্দির নাটক অথবা উপন্যাসে এই নামের এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র আছে। আমাদের ইংরেজির প্রফেসর গলসওয়ার্দির লেখার খুব ভক্ত। ওঁর লেকচার থেকেই নামটা শুনেছি।

একটু লজ্জা পেয়ে আইরিন বলে, আমি অতশত জানি না বাবা। দাদু আদর করে নামটা দিয়েছিল, এখন তো আর বাদ দিতে পারি না। তবে একটা সূত্র আছে। আমাদের পাড়ার নাম খ্রিস্টানপাড়া। এখনও কিছু খ্রিস্টানপরিবার আছে। আমাদের পাড়ার অনেক ছেলেমেয়ের এরকম বিদেশি নাম। ... আরও কী সব বলে যাচ্ছে আইরিন। 'খ্রিস্টানপাড়া' নামটা মাথায় বসে গেছে কাজলের। অদ্ভুত একটা তিরতিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছে শরীর জুড়ে। গন্তব্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে কাজল। মা হয়তো এই পাড়াটার কথাই বলত, একটু অন্য নামে।

আইরিনের কথার মাঝে কাজল বলে ওঠে, তোমাদের পাড়াটাকে কি অনেকে সাহেবপাড়া বলে ডাকে?

ভ্রূ কুঁচকে আইরিন বলে, না! সেরকম তো কাউকে বলতে শুনিনি। অনেকে উচ্চারণ করতে না পেরে খেরেস্তানপাড়া বলে ডাকে। কেন বলুন তো?

উত্তর না দিয়ে কাজল আর একটা ঠিকানা জানতে চায়, সাউথ গেট বলে, তোমাদের ওখানে কোনও জায়গা আছে?

ঠোঁট উলটে মাথা নাড়ে আইরিন। তারপর জিজ্ঞেস করে, কাদের খোঁজ করছেন বলুন তো? আপনার বোধহয় ভুল হচ্ছে কোথাও।

কাজল নিশ্চিত, ভুল তার হচ্ছে না। অনেকবার জিজ্ঞেস করার পর, মা একদিন চুপিচুপি বলেছিল, সাহেবপাড়া সাউথ গেটে মায়েদের বাড়ি, মানে কাজলের মামার বাড়ি। সে বাড়ির কী হয়েছে কে জানে! দাদু-দিদা কেউ বেঁচে আছে কি না মা জানে না। মায়েরা দু'ভাই, দু'বোন। কে কোথায় আছে, তাও অজানা। এতটুকু বলে থেমে গিয়েছিল মা। তারপর ভয় ধরা গলায় বলেছিল, তোকে এসব বলেছি বাবাকে বলিস না যেন।

কেন মা? বাবার কি মামার বাড়ির ওপর খুব রাগ? বয়স মানানসই সরল প্রশ্ন করেছিল কাজল।

হ্যাঁ বাবা। তোমার মামার বাড়ির লোকেরা বাবার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছিল।

মা সত্যি বলেনি। মায়ের শেষ অসুখের সময় সেটা জানতে পেরেছিল কাজল। সেদিনই প্রথম বড়মামাকে দেখেছিল সে। উনিই গোপন সত্যটা ফাঁস করে দেন।

কী হল, চুপ করে গেলেন যে!

আইরিনের কথায় মন ফিরে আসে। কাজল বলে, আর কতদূর তোমাদের পাড়া?

এই তো, সামনের মোড়টাতে। আপনি যাবেন আমাদের বাড়ি?

তোমার বাড়ির বড়রা কিছু মনে করবেন না?

বাবা-ঠাম্মা কিছু বলবে না। আমাকে ভীষণ ভালবাসে। পাড়ার লোকরাই পিএনপিসি করবে। আপনাদের কলকাতায় এসব নেই, না?

খ্রিস্টানপাড়ার মোড় এসে গেছে। পাড়াটার ওপর চোখ বোলায় কাজল। আলো আঁধারি ঘেরা পুরনো পাড়া। এখানেই হয়তো কোনও এক দরমার বাড়িতে কাজলের দুঃখী দাদু-দিদা বেঁচে আছে! যারা নিজের মেয়ের মৃত্যুশয্যায় গিয়ে দাঁড়ানোর অধিকার পায়নি।

কী, যাবেন আমাদের বাড়ি?

আজ থাক। অন্য কোনওদিন বলে দাঁড়িয়ে যায় কাজল।

মিষ্টি হেসে আইরিন বলে, সামনের বুধবার যদি বৃষ্টি হয়, পড়তে যাচ্ছি না। টা টা।

আইরিনের যাওয়ার পথে অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়ে থাকে কাজল। পরোক্ষে আইরিন যে তাকে বুধবার সিগারেট-গুমটির সামনে দাঁড়াতে বলল, বুঝতে অসুবিধে হয়নি। কিন্তু তার থেকেও বড় একটা সম্ভাবনার আকাঙ্ক্ষায় কাজল উৎসাহিত। এতদিন মজিদপুরের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে দোকান্দার, রিকশাওলা, পোস্টাফিসে জিজ্ঞেস করেছে, সাহেবপাড়া, সাউথ গেট কোথায়? কেউ বলতে পারেনি। এইদিকটায় আজ প্রথম এল, তার কেন জানি মনে হচ্ছে এটাই সাহেবপাড়া। কিন্তু সাউথ গেট?

তাও নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে শিগগিরি। আইরিনই তাকে খোঁজ এনে দেবে। তারপর সেই জীর্ণ বাড়িতে গিয়ে দাদু-দিদার সামনে দাঁড়াবে কাজল। বলবে, আমি তোমাদেরই লোক। এটাই আমার মাতৃভূমি। এবার খুশি তো?

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে গরিব বৃদ্ধ-বৃদ্ধার ঝাপসা চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। মেয়ের মুখের সঙ্গে মিলিয়ে নেবে উত্তর পুরুষের মুখ। দেরি করে হলেও তারা ফিরে পাবে লুণ্ঠিত একমাত্র সম্পদ, আত্মসম্মান।

কিছু বাড়ি থাকে, বাইরে থেকে দেখলেই মনে হয় ভেতরে পেল্লাই মার্কা কুকুর আছে। ধ্রুব সেরকমই একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। আজ সকালে ফুচা এল একটা চিরকুট হাতে। ভাগ্যিস মেয়ে ছিল না বাড়িতে। পরে নিশ্চয়ই জবাবদিহি করতে হত। চিরকূটে লেখা, ১৮/বি ফকির চাঁদ রোড, কনক ভিলায় চলে এসো। কথা আছে। বিকেল চারটে। সোনা।

মেয়েকে নিয়ে শুটিং থেকে ফেরার পথে সেই যে গোপলার দোকানে দেখা হয়েছিল ফুচাদের সঙ্গে, সেদিনই সন্ধেবেলা সোনাদের ঠেকে গিয়েছিল ধ্রুব। হোমিওপ্যাথি দোকানটার সামনে এসে চক্ষু চড়কগাছ! পুরো দোকানটাই যেন পাগলা হাতি দিয়ে তোলপাড় করিয়েছে কেউ। দুরু দুরু বুকে ধ্রুব পটলার পানের দোকানে ভেড়ে। কাস্টমারের পান সাজতে সাজতে পটলা মন্ত্র পড়ার মতো বলে, কেটে যাও। সিভিলে নজর রাখছে। এস ডি পি ও-র কাণ্ড।

স্যাট করে সরে যায় ধ্রুব। চারদিন পর সোনার চিরকুট। হাতের লেখাটা ভাল। কাউকে দিয়ে লিখিয়েছে বোধহয়।

গ্রিল মোড়া বারান্দার ভেতরের দেওয়ালে কলিং বেল। ধ্রুব হাত বাড়িয়ে বেল দেয়। কুকুরের ঘেউ ঘেউ ভেসে আসে না। এটা সোনার বাড়ি নয়। সোনার বাড়িতে গেছে ধ্রুব। ওর ছেলের দু'বছরের জন্মদিন। ভারী ফুটফুটে ছেলে সোনার। বউটিও স্বভাব সুন্দর মিষ্টি দেখতে। মুখ দেখলেই বোঝা যায় বরের আর্নিং সোর্স সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয়।

দরজা খুলে যায়। ত্রিশ বত্রিশের একটা মেয়ে, আধখানা শরীর বার করে জানতে চায়, কাকে চাই?

বিশেষ বিবেচনায় ধ্রুব পকেট থেকে সোনার চিরকুটটা বার করে। মেয়েটি ততক্ষণে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। পরনে স্লিভলেস ম্যাক্সি, ওপরে পাতলা ওড়না জড়ানো। সম্ভবত বিবাহিত, হাতে পলা সদৃশ চুড়ি। সিঁদুর খোঁজার পণ্ডশ্রম না করে ধ্রুব কাগজটা এগিয়ে দেয়।

দ্রুত চোখ বুলিয়ে বউটা গ্রিলের তালা খোলে। বলে, আসুন।

সোনা তা হলে এখানে সেল্টার নিয়েছে। বউটাকে অনুসরণ করে ধ্রুব অন্ধকার ড্রয়িংরুম পার হয়। তারপর আলো জ্বলা ঘর। জানলা সব বন্ধ। টেবিলে বোতল গ্লাস সাজিয়ে বসে আছে সোনা। ধ্রুবকে দেখেই উঠে দাঁড়াল, এসো ধ্রুবদা, এসো। তারপর বউটাকে বলল, এ হচ্ছে আমাদের গুরু ধ্রুবদা। আমাদের ব্রেন। —এবার ধ্রুবকে বলল, ইনি হচ্ছেন আমার ভালবাসা তুতো বউদি। রুবি বউদি।

বউটা নির্লজ্জ হাসি সমেত নমস্কার জানায়। তারপর পাশ দুলিয়ে চলে যায় অন্য ঘরে। সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে সোনা বলে, বসো। মাল খাবে তো?

ধ্রুব চেয়ারে বসে। হ্যাঁ, না কিছুই বলে না। সোনার উদোম গায়ে পৈতে দেখে, তার ভারী অস্বস্তি হচ্ছে। গলায় মোটা সোনার চেনটাও আছে। ধ্রুব বলে, তুই খুব ভগবান বিশ্বাস করিস, না রে সোনা।

ওরে বাবা, না করে উপায় আছে। সেদিন রণজয় শালা আর একটু হলে পেড়ে ফেলছিল। জোর বাঁচান বেঁচে গেছি। কে শালা খবর দিল বলো তো! পুলিশ জানত সেদিন আমাদের মিটিং আছে। ... তা তুমি হঠাৎ ভগবানের কথা তুললে কেন?

এমনি। তোর পৈতে দেখে, অনেকদিন পর তাঁর কথা মনে পড়ল। বলে, কিছুটা বাদাম তুলে মুখে দেয় ধ্রুব। শেষবার মদ খেয়েছে সোনার সঙ্গেই। স্টেশনবাজারে বার কাম রেস্টোরেন্টটা যেদিন ওপেনিং হল। মজিদপুরে এই প্রথমবার।

কারখানাগুলো বন্ধ থাকুক, বার খোলার পারমিশন বেরিয়ে যাচ্ছে। সোনার চেলারা বার-এ যেতে না পারলেও, রোজ খায়। যখন যা পায়। সোনা ওদের সঙ্গে খায় না। ধ্রুবকে মাঝেমধ্যে আলাদা খেতে ডাকে। মেয়ের ভয়েই খাওয়া হয় না ধ্রুবর। গন্ধ পেলে বাড়ি মাথায় তুলবে।

টেবিলে ফাঁকা দুটো গ্লাসের একটা নিয়ে নাড়াচড়া করছে ধ্রুব। সোনা বলে, ওটা থাক। তারপর গলা তোলে, বউদি। ধ্রুবদার জন্য একটা গ্লাস দাও। তুমি কি আর এক পেগ নেবে?

পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে বউটা। বলে, না, আমি আর খাব না। তোমরা খাও।

টেবিলে কাচের গ্লাস রাখে বউটা। ঝড়াক করে একটা কামগন্ধ লাগে ধ্রুবর নাকে। মুখ তোলে ধ্রুব। চোখাচোখি হয় মেয়েটার সঙ্গে। অদ্ভুত বেপুথে চাইনি। এরকম একটা ঠান্ডা পাড়ায় কার ঘর পোড়াতে এসেছে মেয়েটি।

দুটো গ্লাসে জল, মদ ঢেলে চলে যায় বউটা। গন্ধটা ঘিরে থাকে ধ্রুবকে। শরীরে মধ্যে ঘুমন্ত সিংহটা কি পাশ ফিরল? সিংহটাকে ফের ঘুম পাড়াতে চোঁ মেরে গ্লাস শেষ করল ধ্রুব। সোনা বলল, আর খেয়ো না, অনেক কথা আছে। আউট হয়ে গেলে কিছুই মনে রাখতে পারবে না।

—এটা কাদের বাড়ি? কার বউ? বিস্ময়ের সঙ্গে জানতে চায় ধ্রুব। সোনা বলে, তোমার তো নয়। তুমি নিশ্চিন্তে মাল খাও।

ধ্রুব ভাবে, সোনা ঠিকই বলেছে। তার তো বউ নয়। কী যায় আসে। শ্রীতমার কথা মনে পড়ে, ভদ্র শিক্ষিত মেয়ের কী বিপুল দায়। ঘাড় গুঁজে কোনও অফিসে কাজ করে যাচ্ছে, বিকেলে ফ্ল্যাটে বসে কোনও লাফাঙ্গার সঙ্গে মাল খাওয়ার কথা শ্রীতমা ভাবতেই পারবে না।

শোনো ধ্রুবদা, যে জন্য তোমায় ডাকা।

সোনার কথায় মনোযোগ দেয় ধ্রুব। সোনা বলে, এস ডি পি ও শালা আমাকে মার্ক করে নিয়েছে। ঠিক আমাকে নয়, মার্ক করেছে মামার পার্টিকে। আসলে রুলিং পার্টি কিছুতেই কবজা করতে পারছে না মজিদপুরকে, দশ বছর ধরে মামাদের পার্টিই জিতছে। করে কম্মে খাচ্ছে পার্টির ছেলেরা। সহ্য হচ্ছে না গভর্মেন্টের। তাই শালা খতরনাক এস ডি পি ও-কে পাঠিয়েছে এলাকা ঠান্ডা করতে। ঠান্ডা করবি কর। বড় বড় রাঘব বোয়াল ধরগে যা। আমাদের মতো ছোট্ট গ্যাং-এর ওপর হুজ্জোত করে দিল। ভাগ্যিস সেদিন পাঁচ মিনিট আগে মোবাইলে ফোন এল। পুলিশের রায়দাই করেছে। বলল, ভাইটি খবর দিতে দেরি হয়ে গেল,

এক্ষুনি সরে যাও ঠেক ছড়ে। —কী বলব মাইরি ধ্রুবদা, এর আগে যে ক'বার পুলিশ রেড হয়েছে, পেছনের গলি দিয়ে কেটে গেছি। এবার কেন জানি মনে হল, ওরা পেছন দিক থেকেই আসবে। সবাই মিলে দোকানের সামনে দিয়ে বেরিয়ে বাজারে মিশে গেলাম। আন্দাজ একদম মিলে গেল। শালারা পেছন দরজা দিয়ে ঢুকে তোড়ফাড় করে দিল ঠেক। মাঝখান থেকে বকুলদির অনেক ক্ষতি হল। অফিসারটার কোনও মায়াদয়া নেই। বকুলদি কাউন্টারে বসে আছে, চোখের সামনে ফার্নিচার শো কেস ভাঙছে এস ডি পি ও-র গার্ডরা। অনেক পুলিশ দেখেছি, কিন্তু...

আরও কী সব বলে যাচ্ছে সোনা। আসলে সোনাদের এতদিন ধরে গড়ে তোলা নিরাপত্তার বেড়াটা ভেঙে দিয়েছে অফিসার। সেটাই ওর আক্ষেপ। দাদা, মামার ঘেরাটোপ ছাড়াও, সোনা নিজের ঠেকটা করেছিল খুব বুদ্ধি করে। প্রথম দিন ধ্রুব কাউন্টারে মহিলা দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল। ভুল জায়গায় এল নাকি। চলেই যাচ্ছিল, মহিলা বললেন, আপনি কি কাউকে খুঁজছেন?

আমতা আমতা করে সোনার নাম বলেছিল ধ্রুব। বকুলদি ইশারায় পেছনের ঘরটা দেখিয়ে দেয়।

তারপর থেকে ওই ঠেকে বসলে ধ্রুবরও খুব নিরাপদ মনে হত নিজেকে। সোনা বলে যাচ্ছে, আমার নিজেকে নিয়ে চিন্তা নেই। কিছু না কিছু ধান্ধা করে চালিয়ে নেব। ব্যবসা করার ক্যাপিটালও আছে। কিন্তু আমার গ্রুপের ছেলেগুলোর কী হবে! সব ক'টাই গরিব ঘরের ছেলে। ছোটখাটো বিজনেসের চেষ্টা যে করছে না, তা নয়। কিন্তু যা মার্কেট। একটু আধটু রংবাজি না করলে শালারা চালাবে কী করে।

সোনার এরকম একটা নরম মন আছে, জানত না ধ্রুব। ইংরাজিতে যাকে বলে ফেলোফিলিং। কিন্তু একটা কথা মাথায় ঢুকছে না ধ্রুবর, সোনার চ্যালার যে রোজ নেশা করে, এটা কি ওদের জীবন ধারণের জন্য খুব দরকারি? তোলাবাজি বন্ধ হয়ে গেলে কোথা থেকে ওরা নেশার টাকা জোগাড় করবে? এসব প্রশ্ন করে এখন লাভ নেই। সোনাদের সঙ্গে সম্পর্ক তার বেশি দিনের নয়। ওদের নিজস্ব একটা জগৎ আছে। সেই জগতে ধ্রুব অতিথি। ফ্যাক্টরি খুলে গেলেই সে বেরিয়ে আসবে। কারখানা খোলার ক্ষীণ একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, স্বপনের স্টেপিং-এর ওপর নির্ভর করছে সব কিছু।

ইতিমধ্যেই তিন পেগ সাঁটানো হয়ে গেছে ধ্রুবর। শিরায় শিরায় মদ আর রক্তের কোলাকুলি চলছে। তুমুল আমুদে ব্যাপার। একবারটির জন্য এ বাড়ির

বউটাকে দেখতে ইচ্ছে করছে এই সময়। মেয়েটার মধ্যে কেমন একটা আদরখাকি ভাব আছে।

নিজের যৌনচেতনা এখনও সক্রিয় আছে দেখে, ধ্রুব পরম নিশ্চিন্ত হয়। কারখানা বন্ধের তিনবছরের মাথায় চেতনাটা প্রায় মরেই গিয়েছিল।

এরকম মিঠে ধুনকির মধ্যে একটা চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে, সোনা কেন ডেকে পাঠাল? এখনও অবধি বলেনি। তখন থেকে আটভাট বকে যাচ্ছে। ওর কথা মাথায় না ঢুকলেও মাঝপথে ধ্রুব বলে বসে, আমায় এখন কী করতে হবে?

থতমত খায় সোনা। সম্ভবত একদম অন্য প্রসঙ্গে ছিল। ধাতস্থ হয়ে বলে, ঠেকে ঝামেলা হওয়ার পর মামা আমাকে ডেকে বলেছে, অ্যারেস্ট হলে বার করতে পারবে না। ভাগ্নে বলেই পারবে না। অপোনেন্ট পার্টি ইস্যুটাকে কাজে লাগাবে। আমাকে কয়েক মাসের জন্য গা ঢাকা দিতে বলেছে মামা। কত মাস সেটা তো বুঝতে পারছি না। দলটাই ফাটলা হয়ে যাবে।

তুই কিন্তু এখনও বলিসনি, আমায় কেন ডেকে পাঠিয়েছিস।

কথা এবং চার নম্বর পেগদুটোই শেষ করে টেবিলে গ্লাস রাখে ধ্রুব। সোনা বলে, ততদিন তুমিই দলটাকে চালাও ধ্রুবদা।

পাঁচ নম্বর ঢালতে গিয়েও বোতল নামিয়ে রাখে ধ্রুব। অবাক বিস্ময়ে বলে, আমি! তুই কি পাগলা হলি নাকি? আমার সে ক্ষমতা আছে? এই তো ক'দিন আগে ছোট একটা অপারেশন লিড করতে দিলি, ধেড়িয়ে চলে এলাম। সেই লজ্জায় এতদিন তোকে মুখ দেখাইনি। (ঢপটা নেহাত ভয় পেয়েই মারল ধ্রুব)

সোনা বলল, ওই কেসটার পর থেকেই তোমার ওপর আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেছে। তোমার মধ্যে এমন কিছু একটা আছে, যার জন্য ওরা তোমায় পুলিশের হাতে তুলে দিল না। তুমি পারবে। ঠিক পারবে। আর যদি কোনও ভাবে ধরা পড়, পার্টি তোমায় বার করে নেবে। তুমি তো আর মামার নিজের ভাগ্নে নয়। মামার সঙ্গে আমার সেই রকমই কথা হয়ে আছে। আর তুমি হয়তো জানো না, আমার মামার সঙ্গে পার্টির হাইকমান্ডের দিনে একবার ফোনে কথা হয়। মামার হাত অনেক দূর পর্যন্ত ছড়ানো।

একটা শিরশিরে ভয় ধ্রুবর পিঠ বেয়ে নেমে গেল। তার নাম কতদূর কী পরিচয়ে ছড়িয়ে গেছে কে জানে! আত্মরক্ষার্থে ধ্রুব বলে, তোর মামা যতই ইনফ্লুয়েনশিয়াল হক, আমার তো নেতা হওয়ার ক্ষমতা নেই।

ক্ষমতা আমি দেব তোমায়। কোথায় কী ভাবে অপারেট করতে হবে বলে

দেব। শুধু স্পটে যাব না। একটা মোবাইল ফোন থাকবে তোমার কাছে। ওটাতেই দু'জনের কথাবার্তা হবে। নতুন একটা ঠেকের বন্দোবস্ত করেছি।

অপারগ ভঙ্গি মাখা মুখ তোলে ধ্রুব। চোখে প্রশ্ন, কোথায়?

তোমাদের পাড়ার পেছনে সাউথ গেট বস্তি আছে না, লোকে যেটাকে বাঙালবস্তি বলে। সেখানকারই একটা ঘরে। পুলিশ ঢোকার আগেই বস্তির লোকেরা খবর দিয়ে দেবে।

তবুও গোঁজ হয়ে বসে থাকে ধ্রুব। মাঝে একবার বউটা এসে পাঁপড় ভাজা দিয়ে গেল। ধ্রুব ঘুরেও দেখল না। সোনা বলছে, কী হল, এখনও সাফিশিয়েন্ট মনে হচ্ছে না?

ধ্রুব প্রায় মরিযা হয়ে বলে ওঠে, তুই আমায় ছেড়ে দে সোনা। আমি তোদের যোগ্য নই।

পা গুটিয়ে এবার স্টেডি হয়ে বসে সোনা। স্থির দৃষ্টিতে ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি কীসের জন্য যোগ্য?

এ যেন সোনা নয়, ধ্রুবর বিবেকই প্রশ্ন করছে। বড় বড় চোখ করে তাকায় ধ্রুব। সোনা বলে যায়, তুমি তো ভাল খেলতে, আদর করে কেউ কোনওদিন কলকাতার টিমে চান্স করে দিয়েছে? দেয়নি। কারখানার কাজে কোনও দিন ফাঁকি মারোনি। মালিকের স্বার্থে কারখানা বন্ধ হল। কী করতে পারলে? অথচ দেখোগে যাও, তোমাদের পাড়ারই কোনও লোক ঘুষ খেয়ে চারতলা বাড়ি হাঁকিয়ে ফেলল। তার মেয়ে গাড়ি চড়ে ইংলিশ মিডিয়ামে যায়। তোমার মেয়ে হেঁটে হেঁটে বাংলা স্কুলে। এমনকী এই যে আমি, বাপের দু'-নম্বরি পয়সায় বড়লোক। পরের বউয়ের সঙ্গে বসে মাল খাচ্ছি। কী যোগ্যতা আছে আমার?

বিস্ময়ে বিভোর চোখে সোনার দিকে তাকায় ধ্রুব। ছেলেটাকে যতটা গাড়ল শ্রেণীর মনে হত, তা নয়। লোয়ার গ্রেডের ছেলেগুলোর সঙ্গে ডিক্লাস হয়ে মেলে। এসব পলিটিকাল ট্রেনিং মামার কাছেই নিয়েছে হয়তো।

তোমার যোগ্যতা, ক্ষমতা দুটোই আছে। খালি হাতে পাবলিককে ধস খাইয়ে দিতে পারো। ডাক্তার রক্ষিতের ওখানে দেখেছি। আবার ভদ্রলোক সেজে পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পারো। তোমার যেটা নেই, সাহস। খারাপ হওয়ার সাহস।

কথাটা একটু শক্ত ঠেকল ধ্রুবর কাছে। দুম করে এতটা মাল খাওয়া ঠিক হয়নি। হাতে ফাঁকা গ্লাস তুলে ধ্রুব উদাস দার্শনিক ভঙ্গিতে জানতে চায়, কীরকম!

তুমি হচ্ছ সেই ধরনের লোক, প্যান্টুল খুলে গেলেও যারা নিজেদের

ভদ্দরলোক মনে করে। চুরি চামারি করছ, তোলা আদায়, আমার সঙ্গে বসে এখন মাল খাচ্ছ, কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারছ না তুমি ভদ্রলোক। গণ্ডগোলটা এখানেই।

কথাটা আঁতে লাগে ধ্রুবর। থমথমে মুখে বলে, পিওর ছোটলোক হতে গেলে আমায় কী করতে হবে?

ওই যে বললাম, সাহস। সাহস আনতে হবে মনে।

ধ্রুব ভাবল জিজ্ঞেস করবে, সাহস কোথায় পাওয়া যায়? কত করে কিলো? পাছে সোনা মনে করে ধ্রুবর নেশা হয়ে গেছে, তাই সে বলে, সাহসের জন্য অনেক কিছু লাগে, ভাল ফুড, স্বাভাবিক পরিবার, তোর মামার মতো একজন রিলেটিভ। নইলে মেড়া লড়বে কীসের জোরে।

গলাটা হঠাৎ পালটে ফেলে সোনা বলে, সাহসের জন্য আর একটা জিনিসও লাগে। এই নাও।

সোনা টেবিলের ওপর যে জিনিসটা নামিয়ে রাখল, দেখে পিলে চমকে ওঠে ধ্রুবর। ঠিক যেন কাল কেউটের বাচ্চা। এখনও ঝাঁপির আড়ষ্টতা কাটেনি।

কী হল ধসকে গেলে! আগে দেখোনি?

কাঁপা গলায় ধ্রুব বলে, দেখেছি। তোর কাছেই। এটা কি সেটাই?

না। আমারটা 'মাউজার' জার্মান মেড। বাজারে শর্ট আছে। দাম বেশি। তোমার জন্য 'ব্রাউনিং' পেলাম।

রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গেছে ধ্রুব। সোনা এমন ভাবে কথাগুলো বলছে, যেন জামাইকে মোটরবাইক কিনে দিয়েছে। কথা খুঁজে না পেয়ে ধ্রুব বলে, এটি কোথাকার তৈরি?

চেকোশ্লোভাকিয়া। কমন বোর। দানা পেতে অসুবিধে হবে না।

পিস্তলটা একবার ছুঁতে ইচ্ছে হয় ধ্রুবর। ঝুঁকি নেয় না। পাছে অধিকারবোধ এসে যায়। ওই যে বলে না, যে একবার হেরোইনের নেশা করে, জীবনে ছাড়তে পারে না। এটাও অনেকটা সেরকম।

কী, সাহস আসছে মনে? জানতে চায় সোনা।

নিরুপায় গলায় ধ্রুব বলে, আমার তো কোনও ট্রেনিং নেই সোনা।

পিস্তল চালাতে ট্রেনিং লাগে না। আমারও ছিল না। ফায়ারিং-এর সময় সফট একটা জার্ক হয়। সেক্সি জার্ক। ব্যাপারটা মেয়েরা ভাল বোঝে। কেন না ওই মিঠে পুসটা তো ছেলেরাই বলে খ্যাক খ্যাক করে হেসে নেয় সোনা। নেশা ফেশা কেটে গিয়ে ধ্রুবর মাথা এখন ফর্সা। তবুও কিছু বুঝতে পারছে না। হাসা শেষ করে সোনা

বলে, ট্রিগার টানার আগে কবজি আর কনুইটা স্টেডি রাখবে। দরকার পড়লে কনুইয়ের নীচে হাত রাখতে পারো।

এবার রীতিমতো ঘামতে শুরু করেছে ধ্রুব। বলে, আমার দ্বারা কাউকে খুন করা সম্ভব নয় সোনা। আমাদের বংশে কেউ কখনও বন্দুক ধরেছে বলে শুনিনি।

বিপ্লবীদের বাবারাও কোনওদিন বন্দুক ধরেনি। তা ছাড়া আমি তো তোমাকে ফায়ার করতে বলছি না। শুধু সঙ্গে রাখা। জাস্ট লাইক মাদুলি। আমিই কোনওদিন মার্ডার করেছি নাকি?

গোয়েন্দা জেরার মতো ধ্রুব বলে, এই যে বললি সফট জার্ক।

সে তো প্র্যাকটিস করার সময় বুঝেছি। তুমিও দু'চার রাউন্ড চালিয়ে দেখে নিয়ো।

শেষ চেষ্টার সুরে ধ্রুব বলে, খামোকা কেন এসবের মধ্যে আমাকে জড়াচ্ছিস। তোর ছেলেগুলোর কাছে তো আর্মস থাকে।

ওগুলোকে তুমি আর্মস বলছ। ছুরিটুরি নিয়ে আজকাল স্কুলের ছেলেরা খেলে। আর ওই কান্ট্রিমেড ওয়ান শাটার তো প্রস্তর যুগের মাল। মারতে যাবে কানাকে মরে যাবে ধনা। দু'-তিন ফুটের বাইরে টার্গেট চলে গেলে, মারাই যাবে না।

তা হলে ওগুলো নিয়ে তোরা ঘুরিস কেন?

শুধু পাবলিককে চমকানোর জন্য। কিন্তু তাতেও কাজ হচ্ছে না। এই মালটা তোমার কাছে রাখো ছেলেগুলোও তোমাকে মানবে। তাবড় তাবড় লোক ধস খাবে। এটার যে কী মাহাত্ম্য যতক্ষণ না কাছে রাখছ বুঝবে না। মাস খানেক রেখে দেখো, যদি স্যুট না করে ফেরত দিয়ো। নাও তুলে নাও। সেল ফোনের ব্যবস্থা আমি পরে করছি।

ব্রাউনিং-এর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ধ্রুব। মনের চোখে ঘুরছে অনেকটা শত্রুর মুখ। হেড অফিসার সেই অফিসার, যার মুখ দেখেই বোঝা যেত, ফ্যাক্টরি এবার বন্ধ হচ্ছেই। মালিকের দালাল ইউনিয়ন লিডার নবদা। কোম্পানির দেওয়া গাড়িতে ঘুরে বেড়াত। পুতুলের জন্য ঠিক হওয়া সেই পাত্র, ধ্রুবরা গিয়ে বলতে. রাজি হয়ে গিয়েছিল নগদ না নিয়ে বিয়ে করতে। বিয়ের দু'দিন আগে খবর পাঠাল ওর বাবা নার্সিং হোমে। বিয়ে আপাতত ক্যানসেল। বাড়ির দুধওলাটার কথাও মনে পড়ে যাচ্ছে, দু'মাসের টাকা বাকি পড়াতে দুধ দেওয়া বন্ধ করল... এদের ওপর প্রচণ্ড রাগ হলেও কোনওদিন খুন করার কথা মাথায় আসেনি। পিস্তলটা সঙ্গে থাকলে যদি ইচ্ছেটা মাথায় চাগাড় দেয়। এই ভয়ে ধ্রুব বলে ওঠে, এটার কি বিষ দাঁত পোরা আছে?

এবার সোনার থতমত খাওয়ার পালা। বলে, ঠিক বুঝলাম না।

এটা কি লোড করা আছে?

হো হো করে হেসে ওঠে সোনা। বলে, তুমি না মাইরি একটা জিনিস।

হাসতে হাসতেই পিস্তলটা তুলে নেয় সোনা। লক খুলে লোডেড ম্যাগাজিন বার করে। ধীরে ধীরে বোঝাতে থাকে হাউ টু অপারেট।

হাঁটতে বেশ অসুবিধে হচ্ছে ধ্রুবর। বাঁ পাটা বড্ড ভারী বোধ হচ্ছে। গোলমালিয়ে গেছে স্টেপিংটা। পথ চলতি মানুষ এক পলক ওর দিকে তাকালেই কেমন জানি একটা সলজ্জভাব এসে যাচ্ছে। যদিও প্যান্টের বাঁ পকেটটা পাঞ্জাবিতে ঢাকা। বোঝার উপায় নেই পকেটে কী আছে।

সোনার আস্তানা থেকে ফুচার গুমটি দশ মিনিটের রাস্তা। এর মাঝে বার ছয়েক বাঁ পকেটে হাত চলে গেছে। ঘুমুচ্ছে খোকা।

সোনা বলেছে, এখান থেকে বেরিয়ে সোজা ফুচার গুমটিতে চলে যাবে। ও তোমাকে নিয়ে যাবে বাঙালক্যাম্পের নতুন ঠেকে। আশপাশটা ভাল করে ঝেঁকে নেবে। পুলিশ কোন গলি দিয়ে আসতে পারে পালাবে কোন দিক দিয়ে। সব বুঝে নিয়ো। তারপর কাল পরশু একটা মিটিং ডাকো। আমি সরে যাচ্ছি দেখে, ওরা বলছিল এবার বাজারে তোলা তুলবে। এখন তো আর প্রেস্টিজের ব্যাপার নেই। আমি হ্যাঁ, না কিছু বলিনি। তুমি রাজি হয়ে যেয়ো। তা হলে প্রথমেই ওদের বিশ্বাস আদায় করতে পারবে। পরের অপারেশন কী হবে না হবে পরিস্থিতি বুঝে ডিসিশান নিয়ো। আমি টাইম মতো কন্ট্যাক্ট করে নেব।

সব শুনে বাধ্য ছাত্রের মতো দরজার দিকে ঘুরে গিয়েছিল ধ্রুব। সোনা পেছন ডাকে, আর, হ্যাঁ আমার পার্সেন্টেজটা তোমার কাছেই রেখে দেবে। সময় মতো চেয়ে নেব।

ঘাড় হেলিয়ে, অন্ধকার ড্রয়িং পেরোল ধ্রুব। বউটাও সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। দরজা দেওয়ার আগে নিপাট সৌজন্যে বলল, আবার আসবেন।

এবার আর ঘাড়টা হেলাতে পারল না। শক্ত হয়ে গিয়েছিল। হাসিটাও নিশ্চয়ই দেখাচ্ছিল বড় করুণ। আর কি কখনও দেখা হবে মেয়েটার সঙ্গে। যা জিনিস পকেটে দিয়ে দিল সোনা! মেয়েটার গন্ধ বুক ভরে নিয়ে পথে নেমেছিল ধ্রুব।

ওই তো ফুচার গুমটিটা দেখা যাচ্ছে। একটা মাত্র কাস্টমার। বাকি সার সার গুমটিতে তাও নেই। বেশির ভাগই রেডিমেড জামা কাপড়ের দোকান। জুটমিলগুলোর ওপর ভরসা করে গুমটিগুলো হয়েছিল। মিলগুলো ছ'মাস বন্ধ

থাকে। দুটো মিল তো আর খুললই না। ফুচা বলে, আদ্ধেক দিন নাকি ওদের বউনি হয় না।

সন্ধে নেমে গেছে। গুমটির সামনে নির্লজ্জের মতো জ্বলছে ডুমগুলো। যেন লাইনে দাঁড়ানো উৎকট সাজের মেয়ে। বাঁ পা টেনে টেনে ফুচার গুমটির সামনে দাঁড়ায় ধ্রুব। কাস্টমারটাকে দেখে ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে যায়। অঘোরকাকা, পুতুলের বাবা। দুখী দুখী মুখ করে টাটের এক কোনায় চুপটি করে বসে আছে।

এই তো ধ্রুবদা এসে গেছো। তোমার জন্যই ওয়েট করছিলাম। যা শালা বাজার পড়েছে, দোকান খোলার থেকে না খোলা অনেক ভাল। বলে দোকান বন্ধ করার উদ্যোগ নেয় ফুচা।

পাছে গা, মুখ থেকে মদের গন্ধ পেয়ে যায় তাই অঘোরকাকার থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকে ধ্রুব। অঘোরকাকা তার দিকে তাকিয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু দেখতে পেয়েছে কিনা বলা মুশকিল। চোখে বোতলের পেছনের মতো ঘোলাটে চশমা। ওই চশমাটাই অঘোরকাকার সঙ্গে কমিউনিকেট করার প্রধান অন্তরায়। ঘষা কাচের ঘন চশমাটা দেখলে মনে হয়, কিছু বললে কাকা হয়তো শুনতেও পাবে না ঠিকঠাক।

গলা ঝেড়ে ধ্রুব বলে, তুমি এখানে, কী ব্যাপার!

এর সঙ্গে একটু দরকার ছিল। ভাবলেশহীন মুখে বলে অঘোরকাকা। জামাকাপড়ের প্যাকেট গোছাতে গোছাতে ফুচা বলে, তুমি চেনো নাকি দাদুকে!

'দাদু' কথাটা কানে লাগে ধ্রুবর। কী আর করা যাবে। অঘোরকাকার চেহারাটা সত্যিই খুব বুড়িয়েছে। ধ্রুব বলে, হ্যাঁ, ইনি আমাদের বাড়ির পাশেই থাকেন। আমরা দু'জনেই রজার কোম্পানির স্টাফ।

ও, বুঝেছি। বলে ফুচা এবার অঘোরকাকাকে আশ্বাস দেয়, ভেবো না দাদু। তোমার কাজ হয়ে যাবে। ধ্রুবদা যখন মাঝখানে আছে, কোনও প্রবলেম হবে না।

কাজটা কী? জানতে চায় ধ্রুব। ফুচা বলে, দাদু একটা গুমটি কিনতে চাইছে। সাত হাজার দিতে পারবে। লাগবে দশ। ছ' হাজার নেবে গুমটির মালিক। বাকি চার নেবে গুমটি-মন্ত্রী।

'গুমটি-মন্ত্রী' কথাটা প্রথম শুনল ধ্রুব। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, সেটা আবার কে?

সে কী, জানো না! অমরদা গো। লোকাল কমিটির মেম্বার। ওই তো স্টেশনবাজারের গুমটিগুলো দেখভাল করে। ওগুলো তো সব রেলের জমির ওপর হয়েছে। অমরদা কীভাবে যেন লাইন করেছে রেল কোম্পানিকে। এখনও

তো আমাদের তোলেনি। তুমি গিয়ে বললে, হাজার দুয়েক হয়তো কমাবে। গুমটি মালিক এক পয়সাও কম নেবে না। ওর ছেলের অপারেশন। ম্যাড্রাস যাবে।

আবার অবাক হয় ধ্রুব। বলে, আমি বললে অমরদা কমাবে কেন? সে তো আমাকে চেনেই না। আলাপই হয়নি কোনওদিন।

আলাপ পরিচয়ের তো দরকার নেই। তুমি হচ্ছ গিয়ে সুদর্শন ঘোষালের লোক। ওটাই যথেষ্ট। বলে, দোকানের ঝাপ ফেলতে থাকে ফুচা। অঘোরকাকা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ধ্রুব সরে দাঁড়াতে ভুলে গিয়ে ভাবে, সুদর্শন ঘোষাল মানে সোনার মামা। তিনিও তো ধ্রুবকে কোনওদিন দেখেননি। অথচ ধ্রুব তার লোক হয়ে গেল! শালা আজব ব্যাপার! পাশে দাঁড়ানো অঘোরকাকা বলে, তোর এত সোর্স আছে জানলে, তোকেই প্রথমে বলতাম। একটু দেখিস ব্যাপারটা যেন হয়ে যায়। সাত হাজারেই ব্যবস্থা করিস। দশ হাজার নিয়ে নামছি। বাকি টাকায় মালপত্তর কিনতে হবে। ফাঁকা গুমটিতে বসে তো কোনও লাভ নেই।

ধ্রুবর কনুইটা ধরে আছে অঘোরকাকা। এই নিয়ে জীবনে দ্বিতীয়বার। প্রথমবার ধরেছিল পুতুলকে বিয়ে করার জন্য, ধ্রুব পুতুলকে এভাবে ঠকাস না। তোর সঙ্গে ওর সম্পর্ক পাড়ার কারুর অজানা নয়। তা ছাড়া নিজের চোখকে... বলে থেমে গিয়েছিল অঘোরকাকা। সেদিনের কথা আর আজকের অনুরোধ সব গোলমাল পাকিয়ে কানে ঢুকছে ধ্রুবর। একদিন অসময় ডিউটি থেকে ফিরে এসেছিল অঘোরকাকা। পুতুলের সঙ্গে আনাড়ি শরীর খেলায় এতই মগ্ন ছিল ধ্রুব। সিঁড়ির নীচে অঘোরকাকা সাইকেল ঢোকাচ্ছে, টেরই পায়নি। পুতুল চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, মুখ চেপে ধরে ধ্রুব। তার তখন একমাত্র ভরসা, অঘোরকাকার ঘোলাটে চশমা।

সাইকেল রেখে অঘোরকাকা চলে যেতে, ভেবেছিল, এ যাত্রায় বেঁচে গেল। টেপফ্রকের বোতাম লাগাতে লাগাতে ফোঁপাচ্ছিল পুতুল, বাবা দেখে নিয়েছে। কেটে ফেলবে আমায়।

কাঁদিস না। কিচ্ছু দেখেনি। বলে আশ্বাস দিয়েছিল ধ্রুব। সেটা কতটা মিথ্যে বোঝা গেল শ্রীতমাকে বিয়ে করতে যাওয়ার আগে। সিঁড়ির নীচের অনাচারটা চোখ এড়ায়নি অঘোরকাকার। পুতুলকে হয়তো মেরেওছিল খুব। পুতুল চুপচাপ সয়ে গেছে অথবা বাবাকে বোঝাতে সমর্থ হয়েছিল, ধ্রুবদা একদিন তাকে বিয়ে করবে।

কিছুই ঠিকঠাক মেলেনি। প্রতারণা করে পার পেলেও সুখী হয়নি ধ্রুব। অপমান ভুলে আজও যেন অঘোরকাকা তাকে বলছে, দোকানটার ব্যবস্থা করে দে ধ্রুব। মেয়েটাকে বাঁচাই।

অযথাই বাঁ পকেটে একবার হাত চলে যায়, জিনিসটা বেখাপ্পা উঁচু হয়ে আছে। মালটা বাড়ির কোথায় লুকোবে ভাবতে থাকে ধ্রুব। অঘোরকাকা কনুই ছেড়ে মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ধ্রুব বলে, দেখছি কতটা কী করা যায়। তোমাকে বাড়িতে গিয়ে বলব।

বউনি না হওয়া দোকান বন্ধ করে জ্বলন্ত কাগজ তালায় ঠেকায়, একবার আরতি মতো করে নেয় ফুচা। এটা হল দেবতার কাছে সম্পদ গচ্ছিত রাখার সংস্কার। হাতটাত ঝেড়ে, চাবি পকেটে পুড়ে ফুচা বলল, চলো।

পাশের দোকানের ছেলেটা হিড়িক দিল ফুচাকে, কীরে হেভি বিক্রিবাটা দিয়েছিস মনে হচ্ছে। ব্যাঙ্কে যাচ্ছিস টাকা ফেলতে?

ফুচা হাত মুঠো করে অশ্লীল ইঙ্গিত করে ছেলেটাকে। অঘোরকাকা মাথা নামিয়ে উলটো পথে হাঁটা দেয়।

কে যে পথ দেখিয়ে এ পাড়ায় নিয়ে এল বুঝতে পারে না কাজল। অদৃশ্যে থাকা কোনও পাখি অথবা বিশেষ কোনও হাওয়া, যার মধ্যে মন ভাল হয়ে যাওয়া গন্ধ। যেভাবেই হক কাজল পৌঁছে গেছে তার গন্তব্যে। এতদিনের অন্বেষণের হয়েছে অবসান।

সময়টা বিকেল। পাড়ার ক্যানভাস জুড়ে বিকেলের বর্ণাঢ্য রং-ই বেশি, বাড়িগুলো একতলা। সব থেকে যেটা আশ্চর্যের, প্রতিটি বাড়িই নতুন রং করা হয়েছে। গাছপালা, ল্যাম্পপোস্ট, টাইমকলগুলোও এমন চকচক করছে, যেন বৃষ্টি হয়ে গেছে গতকাল। গোটা পাড়াটাই এমনভাবে সেজেছে, নির্ঘাত কোনও পুজোপাবণ আছে।

পথ চলতি মানুষ খুব কম। যে ক'জনকে দেখা যাচ্ছে, নতুন ধুতি কাপড় পরে তারা কোনও বিশেষ কাজে অতি ব্যস্ত। কাজলের দিকে তাকানোর সময় নেই তাদের।

আরও কিছুটা হাঁটার পর কাজল দেখতে পায়, এক দঙ্গল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। পরনে তাদের নতুন পোশাক। ছোটদের দলটাকে লক্ষ করে পা চালায় কাজল।

এই যে শোনো! বলে ডাকতেই বাচ্চাগুলো মুখ ফেরায়। ওদের মধ্যে তোতা তাতান অলি, কলিকে দেখে খুব অবাক হয় কাজল। ওরা কিন্তু কাজলকে চিনতে

পারে না। কাজলও আর ঘাঁটায় না ওদের। নিজেদের মধ্যে খেলতে খেলতে হয়তো ভুলে গেছে কাজলকে। ওদের মধ্যে একটা মিষ্টি ছেলে বলে, আপনিই কি কাজল?

অবাক হয়ে ঘাড় হেলায় কাজল। তারপর বলে, তুমি কী করে জানলে আমার নাম কাজল?

সে কথার উত্তর না দিয়ে ছেলেটা বলে, আপনার মামার বাড়ি খুঁজছেন তো? ওই যে।

ছেলেটার আঙুল বরাবর তাকাতে কাজল দেখতে পায়, একটা হলুদ রঙের বাড়ি। ওই বাড়িটাই বোধহয় পার্বণের কেন্দ্রস্থল। বাড়ির কার্নিশ জুড়ে আম্রপল্লব টাঙানো। সদর দরজায় ঘট, কলাগাছ। এটাই তা হলে আমার মামার বাড়ি। এ বাড়িতে কী পুজো আজ?

ছোটদের দলটাকে জিজ্ঞেস করতে যাবে কাজল, দেখে, ওরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতে করতে অনেকদূর এগিয়ে গেছে।

পায়ে পায়ে কাজলও এগিয়ে যায় হলুদ বাড়িটার দিকে। সদরে আসতেই ঘোমটা দেওয়া কয়েকজন মহিলাকে দেখা গেল। তারাও দেখেছে কাজলকে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটল ভেতরবাড়িতে। হয়তো কাজলের আসার খবরই দিতে গেল। কিন্তু কাজল তো এদের কাউকে চেনে না। এটা কি সত্যিই তার মামার বাড়ি? নাকি অন্য কারও অপেক্ষায় আছে এরা! কাজলকে সেই লোক বলে ভুল করছে। তা হলে মিষ্টি ছেলেটা তার নাম বলে দিল কী করে!

দ্বিধাভরা পা চৌকাঠে রাখে কাজল। তখনই বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে আসে উলু, শঙ্খধ্বনি। কারা যেন তাকে নিতে আসছে। কাজল এগিয়ে যায়।

বেশ কয়েকজন মহিলা-পুরুষ কাজলকে আপ্যায়ন করে বারান্দায় এনে বসিয়েছে। টানা বারান্দার পাড়ে আলপনা, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কাজল বসেছে একটা পিঁড়ির ওপর। তার সামনেও গোল আলপনা। বাড়ির বাতাসে ভাসছে পবিত্র পুজো পুজো গন্ধ। এই মানুষগুলো কেন যে তাকে এখানে এনে বসিয়েছে জানে না কাজল। তবে পরিবেশটা তার মন্দ লাগছে না। জিন্সটার জন্যই পা গুটিয়ে বসতে যা একটু অসুবিধে হচ্ছে। এমন জানলে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে আসত। মানিয়েও যেত এই পরিবেশে। কিন্তু কাজলের এখন কী করণীয় বুঝতে পারছে না। কেনই বা তাকে এত খাতির করা হচ্ছে, তাও অজানা। কাউকে যে জিজ্ঞেস করবে সেরকম নির্ভরযোগ্য মুখও আশেপাশে নেই। সরল সাধারণ

মানুষগুলো যেন নতুন জামা-কাপড় পরে আরও বোকা বোকা হয়ে গেছে। কত বুড়োবুড়ি, মাঝবয়সি, নতুন বউ যে এসে কাজলকে দেখে গেল তার ইয়ত্তা নেই। সবার মধ্যেই চাপা আনন্দ, তার মধ্যে মিশে আছে প্রচ্ছন্ন অহংকার। ওরা কাজলকে দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে।

কিন্তু কতক্ষণ এভাবে বসে থাকা যায়। অধৈর্য হয়ে কাজল এদিক ওদিক তাকায়। খোঁজে একটা অন্তত চেনা মুখ। তখনই চোখে পড়ে উঠোনের প্রান্তে বসে একজন দা দিয়ে নারকোল ছাড়াচ্ছে। পাশ থেকে কেন জানি চেনা-চেনা ঠেকছে মানুষটাকে। অন্যদের তুলনায় লোকটা অচঞ্চল। নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। কাজলের উপস্থিতি যেন গ্রাহ্যই করছে না। ওই লোকটাই বলতে পারবে, এতসব খাতির-যত্নের অর্থ কী? এ বাড়িতে কীসের উৎসব, যার রেশ সারা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

পিঁড়ি থেকে উঠে কাজল উঠোনে নামে। সবার মধ্যে একটা গুঞ্জন শুরু হয়। কেউ কেউ এগিয়ে আসে। দা পাশে রেখে মানুষটা মুখ ফেরায়। একচান্সেই চিনতে পারে কাজল। বড় মামা! এই মানুষটাকে জীবনে সে একবারই দেখেছে। মায়ের মৃত্যুর সময় নার্সিং হোমে। মামার বাড়ির তরফে এই একজনকেই সে চেনে। আর কেউ কোনওদিন তাদের বাড়ি গেছে কি না জানে না। এই মানুষটাই সেদিন জানিয়ে ছিল কাজলের জন্ম-পরিচয়ের একটা অংশের কথা। ভিজিটারস প্যাসেজে কাজল বসেছিল একা। বাবা, কাকারা ওষুধ আনতে হয়তো বাইরে। উলটোদিকের সোফায় বসা একটা লোক একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল কাজলের দিকে। অস্বস্তি হচ্ছিল। লোকটা কেমন যেন বেমানান এই দামি নার্সিং হোমে। নিজের কোনও আত্মীয়র জন্য নিশ্চয়ই আসেনি লোকটা। হয়তো মালিক ভর্তি আছে এখানে। কাজল অন্যমনস্ক থাকার চেষ্টা করেও পারছিল না। বারবার চোখ চলে যাচ্ছিল লোকটার ওপর। কী দেখছে মানুষটা। এক সময় লোকটা পাশে এসে বসে। সতর্ক হয় কাজল। অসৎ লোকের তো অভাব নেই শহরে। সসংকোচ লোকটা বলে, তুমি লীলার ছেলে না?

অবাক হয়ে কাজল বলে, আপনি কী করে মা-কে চিনলেন?

নিজের বোনকে ভুলে যাব! তা তোমার নামটি কি?

কাজলের তো বেসামাল অবস্থা। এই অপরিচ্ছন্ন লোকটা তার মামা! হতেই পারে না। তবু ভদ্রতার খাতিরে কাজল নিজের নামটা বলে। লোকটার মুখে এক ধরনের বিষণ্ণ হাসি খেলে যায়। শ্লেষ মিশ্রিত কণ্ঠে বলে, যাক, তবু মামার বাড়ির নামটা রেখেছে। বাকি সব তো ধুয়ে মুছে সাফ। তোমার চেহারা দেখলেও বোঝার উপায় নেই যে, তুমি ঝিয়ের ছেলে।

খালি পিঠে চাবুক মারলেও বোধহয় এত লাগত না। সোফা থেকে তড়াক করে উঠে দাঁড়ায় কাজল। লোকটা একই সঙ্গে তাকে আর মাকে গালাগালি দিচ্ছে! কাজল ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল, এই যে মশাই কী সব উলটো-পালটা বলছেন! আপনার ধান্দাটা কী বলুন তো?

কিছুই উলটোপালটা বলছি না। লীলা মারা যাচ্ছে। এ সময় সত্যটা তোমার জেনে রাখা ভাল। যদি কিছুক্ষণের জন্যেও মেয়েটার জ্ঞান ফেরে, গিয়ে বোলো, তোমার মামার বাড়ি গরিব বলে, সমাজের নীচের লোক বলে তোমার কোনও আক্ষেপ নেই। তুমি সব মেনে নিয়েছ। তা হলেই আমার বোনটা শান্তিতে মরতে পারবে।

কাজল পাথর হয়ে গিয়েছিল তখন। কথা বলার অবস্থা ছিল না। মামা তখনও বলে যাচ্ছে, লীলার এত শরীর খারাপ, তোমার বাবা আমাদের জানায়নি পর্যন্ত। ভাগ্যিস তোমার বাবার অফিসে কাজ করে আমার এক বন্ধু ওর মারফত খবর পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম তোমার বাবাকে। তিনি শুধু আমাকে আসার পারমিশন দিলেন। বাবা, মা, মেজো ভাই কাউকে কিছু না বলে, দৌড়তে দৌড়তে এখানে এসে দেখি এই অবস্থা! লীলা জানেই না আমি এসেছি। একটু থেমে মামা আবার বলে, পারমিশান, বুঝলে পারমিশন নিতে হবে নিজের বোনকে হাসপাতালে দেখতে আসতে। এতই যদি তোমার বাবার আমাদের ওপর ঘেন্না, তা হলে কেন বিয়ে করতে গেল লীলাকে! আমরা তো জোর করিনি। আমাদের বিপদ আমরা সামলে নিতাম। বড়জোর তুমি জন্মাতে না।

এই কথাটার মানে তক্ষুনি না-বুঝলেও, পরে সব কিছুই জানতে পারে কাজল। মামার তখনও বলা শেষ হয়নি। এই যেন শেষ সুযোগ ক্ষোভ উগরে দেওয়ার, নাকি বিষ! মামা বলছে, বিয়ে করার সাহস যখন ছিল, কেন তোমার বাবা থাকতে পারল না মজিদপুরে? দূর থেকে হলেও বোনটাকে তবু দেখতে পেতাম। আমাদের মা যেহেতু তোমাদের বাড়িতে কাজ করত, সেই অপরাধে আমরা একমাত্র ভাগ্নেকে আদর করার অধিকার হারালাম। তোমার বাবা বোধহয় এখনও জানে না, 'কাজল' নামটা আমার মায়ের দেওয়া। তোমার বাবার থেকে পারমিশন নিয়ে লীলা যখন শেষবার আমাদের বাড়ি আসে, মা বলেছিল, আর তো দেখা হইব না। প্যাট দ্যাইখা মনে হইতাছে পোলাই হইব। অর নাম রাখিস কাজল। লীলা কথা রেখেছে। তারপর তো...

কথার মাঝে বাবা এসে পড়ে। কাজলের সঙ্গে বড় মামাকে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতে দেখে, বিচ্ছিরি রকমের রেগে যায়। মামার সামনে এসে বলে, কী বলছ

ওকে? কী কথা? তোমাকে বলেছিলাম না, আসবে, দেখবে, কারও সঙ্গে কোনও কথা বলবে না।

মাথা নিচু করে সরে গিয়েছিল বড় মামা। তারপর এক ঝলক দেখা হয়েছিল বার্নিং ঘাটে। সবাই যখন ভেজা চোখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মামার চোখে মায়ের চুল্লির আভা।

সেই আভা আজ নিভে গেলেও, ছাইয়ের মতো অভিমান লেগে আছে মুখে। নারকোল, দা রেখে মামা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বিষণ্ণ গলায় বলে, শেষমেশ তা হলে এলে!

আমি তো আসতেই চেয়েছি মামা। তাই মজিদপুরে এসে আছি। জায়গাটা খুঁজে পেতে যা একটু দেরি হয়ে গেল।

তুমি যে আজ আসবে, আমরা জানতাম। তাই তো এত আয়োজন।

কথাটা ঠিক মাথায় ঢুকল না কাজলের। দরকারও নেই ঢোকার। তার এখন দু'জনকে দেখার জন্য ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে। তাই সে বলে, দাদু-দিদা কোথায় মামা?

—তারা সব সরস্বতী নদীতে স্নান করতে গেছে। আজ সংকটার ব্রত উদযাপন। এখনই এসে পড়বে। সরস্বতী নদীর নাম শুনে খটকা লাগে কাজলের। যতদূর জানে, সে নদী মরে হেজে বিলুপ্তির পথে। সেখানে কী এমন জল আছে যে, দাদু-দিদারা চান করতে গেল! ভাবনার মাঝে আবার শাঁখ-উলু বেজে ওঠে। সদরের দিকে ঘুরে তাকায় কাজল। অবাক হয়ে দেখে, দু' পাশে বুড়োবুড়ি নিয়ে মধ্যমণি মা। হাতে পুজোর থালা নিয়ে এগিয়ে আসছে। মায়ের পরনে সস্তার হলেও, নতুন শাড়ি। হলুদের ওপর লালপাড়। কলকাতার বাড়ি হলে, বাবা কিছুতেই এই শাড়ি পরতে দিত না মাকে।

ঠিক যতটা মা-কে দেখে অবাক হওয়ার কথা কাজলের, ততটা হচ্ছে না। এর কারণ সম্ভবত মায়ের সাবলীল ভঙ্গি আর সেই অমলিন হাসি, যার কখনও মৃত্যু হয় না।

মা সামনে এসে বলে, কখন এলি? আসতে কষ্ট হয়নি তো?

এই তো কিছুক্ষণ হল এলাম। বলে দাদু, দিদার দিকে তাকায় কাজল। সদ্যোস্নাত বুড়োবুড়ির চোখে আকুল তৃষ্ণা। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা উচিত, ভাবতেই, মা বলে ওঠে, এখন থাক। আগে ব্রত উদযাপন হোক, তারপর। তুই ওই পিঁড়িটায় গিয়ে বস।

বারান্দার দিকে হেঁটে যেতে যেতে কাজল বিহ্বল আবেশে বলে ওঠে, মা, তুমি বেঁচে আছ আমি ভাবতেই পারছি না!

তুই কি ধরে নিয়েছিলি, আমি সত্যিই মরে গিয়েছিলাম! না রে। আমার বাবা-মা সংকটা ব্রত করত। তাই তো ফিরে এসেছি। যেমন তুইও এসেছিস। এই ব্রত রাখলে হারানিধি ফিরে আসে।

কিন্তু শ্মশানঘাট। দাহপর্ব। সেটা তো মিথ্যে নয়।

ধুর বোকা, ওটা তো লোক দেখানো দাহপর্ব। কোনও এক বেওয়ারিশ মেয়ের লাশ। যার মা, বাবা আত্মীয়স্বজনের খোঁজ ছিল না। আমার তো সবাই ছিল, নাকি?

বারান্দার পিঁড়িতে গিয়ে বসেছে কাজল। সামনে মা। বাকি সবাই তাকে ঘিরে আছে। সবার চোখেই অধীর আকুলতা, কী যেন প্রার্থনা করছে।

একটা শূন্য ডালা সামনে রেখে মা বলে, দে।

আশ্চর্য হয়ে কাজল জানতে চায়, কী?

টাকা।

কীসের টাকা!

সে কী তোর বাবা কোনও টাকা পাঠায়নি।

কাজল অসহায় কণ্ঠে বলে, কোন টাকার কথা বলছ? কেন বাবা টাকা পাঠাবে, কিছুই তো বুঝতে পারছি না মা!

কাজলকে ঘিরে থাকা ব্যাকুল ও কৌতূহলী মুখগুলোয় অনিশ্চয়তা ছড়িয়ে পড়ে। মায়ের মুখে উদ্বেগ, বলে, তা হলে কী হবে আমাদের! পাড়ার লোক তাদের শেষ পয়সা খরচ করে আজকের ব্রত উদযাপন করছে। সবাই আশা করে বসে আছে, তুই ঢের টাকা নিয়ে আসবি। সেই দিয়েই চলবে আমাদের আগামী দিনগুলো।

এবার সামান্য বিরক্ত হয়ে কাজল বলে, আমি তো কিছু জানি না। বাবা আমায় কিছুই বলেনি। কোন টাকার কথা বলছ তুমি?

আমি যে তোদের বাড়ি এতদিন কাজ করলাম, তার টাকা। তোর বাবা যখন আমায় এখান থেকে কিনে নিয়ে যায়, কোনও টাকা দেয়নি। পুরোটাই ধার। সেটা আজ শোধ করার কথা।

কাজল বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। কী করবে ভেবে পায় না। মায়ের কাছে যে পরামর্শ চাইবে তার উপায় নেই। মা-ই আঁচল পেতে বসে আছে। এতদিন বাদে মাকে পেয়েও এখন কেমন পর পর লাগছে!

দেখ বাবা কাজল, তোর কাছে কিছু আছে কি না। সবাই তোর মুখ চেয়ে বসে আছে। কিছু না থাকে, তোর নামটাই দিয়ে দে। ওটা তো এ বাড়ির দেওয়া।

রীতিমতো ঘাবড়ে যায় কাজল! নামটা দিয়ে দেওয়া মানে প্রকৃতই নিঃস্ব হয়ে যাওয়া। কোনও পরিচয়ই তার থাকবে না। নন-এনটিটি হয়ে যাবে!

পায়ের তলার মাটি সরতে থাকে। এ পকেট, ও পকেট হাতড়াতে থাকে কাজল। কিছুই পায় না।

ঘেমে নেয়ে একসা হয়ে কাজলের ঘুম ভাঙে। অনেকক্ষণ সকাল হয়েছে। ঘর ভর্তি আলো। বিছানায় উঠে বসে কাজল। খুব ধকল গেল স্বপ্নটার মধ্যে। একটু ধাতস্থ হতে, দেখে, মালতীদি ঘর মুছছে। তার মানে প্রায় আটটা।

মশারির ভেতর থেকে নেমে আসে কাজল। মালতীদি ঘুরে তাকায়। কাজল খুঁটিয়ে দেখে, এই মুখটা কি মায়েদের পাড়ায় ছিল? মালতীদিকে কি জিজ্ঞেস করবে, সাহেবপাড়া, সাউথ গেট কোথায়? দরকার নেই বাবা, এক্ষুনি হয়তো কাকিকে গিয়ে লাগিয়ে দেবে।

কাজলকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে মালতীও অবাক হয়ে গেছে! পরিস্থিতিটা সহজ করতে কাজল বলে, মালতীদি, তুমি 'সংকটা ব্রত' বলে কোনও ব্রত আছে কি না জানো?

কাজলের মতো যুবকের মুখে ব্রত পুজোর নাম শুনে আরও বিস্মিত হয় মালতী। ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নিয়ে বলে, নামটা শুনেছি শুনেছি বলে মনে হচ্ছে। কেন গো কাজলদাদা, স্বপ্নে কোনও ব্রতট্রত পেলে নাকি তুমি?

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে যেতে কাজল ভাবে হয়ে গেল। এক্ষুনি কথাটা রাষ্ট্র হয়ে যাবে।

ভীষণ চা তেষ্টা পেয়েছে। দোতলা থেকে নেমে সোজা কিচেনে যায় কাজল। কাকি রান্নায় ব্যস্ত। কাজলের উপস্থিতি টের পেয়ে ঘাড় ঘোরায়, এতক্ষণে ঘুম ভাঙল! দুবার চা নিয়ে ঘুরে এসেছি। পুলিশও বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছে অ্যারেস্ট করার জন্য। গায়ে একটা কিছু চড়িয়ে এসো। স্যান্ডো গেঞ্জি পরে থানায় গেলে লোকে পাক্কা চোর-ছ্যাঁচোড় ভাববে।

পুলিশ! কাজলের কপালে ভাঁজ।

হ্যাঁ, অলি. কলির বাবা। সম্মানদক্ষিণা দিতে এসেছে বোধহয়।

কাকির কথার সূত্রে একসঙ্গে অনেক কিছু মনে পড়ে, বিশাল একটা ভুল হয়ে গেছে। আজ বুধবার। আইরিনের সঙ্গে দেখা করবে ঠিক করেছিল। পরোক্ষে এই রকমই কথা হয়ে আছে। ঘুমই ভাঙল ন'টায়। মেয়েটা হয়তো অপেক্ষা করে চলে যাবে। অথচ ওর জন্যই আজ ছোট্টগুলোকে পড়ায়নি কাজল। কালকেই বলে

রেখেছিল আজ সকালে একটা কাজ আছে। এত লম্বা আর অস্বস্তিকর স্বপ্ন দেখল...

তোমার চা।

কাকি হাতে চায়ের কাপ ধরিয়ে দিল। কাজল বলল, রণজয়বাবুকে দিয়েছ?

হ্যাঁ, দিয়েছি। তুমি যাও, অনেকক্ষণ বসে আছেন। তোমার কাকাও তো নেই। বাজারে গেছে।

গায়ে কিছু চাপানোর কথা ভুলে, চা হাতে বসার ঘরের দিকে যায় কাজল। অলি, কলির বাবা সত্যিকারের ভদ্রলোক। মাসের ঠিক পাঁচ তারিখে মেয়েদের হাতে খাম পাঠিয়ে দেন। আজ ওদের ছুটি দেওয়া হয়েছে বলে, নিজে এসেছেন।

রণজয়বাবুর পরনে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। কাকার কোনও একটা বই পড়ছিলেন। দৃশ্যটা দেখলে, চোর-বদমাইশরা একটু শান্তি পেত। গলা ঝাঁকি দিয়ে কাজল বলে স্যরি, আমার জন্য আপনাকে অনেকক্ষণ বসতে হল।

বই পাশে রেখে রণজয়বাবু বলেন, আরে না না, স্যরির কী আছে! ইনফ্যাক্ট আমি বেশিক্ষণ আসিওনি। তারপর চা-টা খেলাম।

পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়েছেন রণজয়বাবু। কাজলের চোখ চলে গেছে রণজয়বাবুর পাশে রাখা বইটায়। এটা কেন এত মন দিয়ে পড়ছিলেন! এ বাড়িতে তিনটে নিউজপেপার আসে। টেবিলেই রাখা আছে সেগুলো। একটাতেও চোখ বোলাননি!

এটা ধরো। বলে, খাম বাড়িয়েছেন রণজয়বাবু।

কাজল খামটা নিয়ে বলে, এটার জন্য মিছিমিছি এতক্ষণ সময় নষ্ট করলেন। কাল দিলে কী এমন ক্ষতি হত।

না, সে আমি রূপাবউদির কাছে দিয়ে গেলেও পারতাম। তোমার সঙ্গে কিছু পরামর্শ আছে আমার।

কাজল স্বভাবতই অবাক হয়, তার মতো একটা নিরীহ ছেলের কাছে জাঁদরেল পুলিশ অফিসার কী পরামর্শ থাকতে পারে? প্রশ্নটা কাজলের চোখ থেকে পড়ে নিয়ে রণজয়বাবু বললেন, মেয়েদুটোকে ভাবছি কলকাতায় রেখে পড়াব। তোমার ওপিনিয়ন কী?

হঠাৎ এই ডিসিশানের কারণ?

এখানকার যা পরিবেশ আর ওদের ইংলিশ মিডিয়ামের যা স্ট্যান্ডার্ড, তোমার কি মনে হয় এখানে রাখা ঠিক হবে? বেসটা কাঁচা হয়ে যাবে না?

উত্তরটা তো রণজয়বাবুর কথাতেই লুকিয়ে আছে। এর আর কী মতামত দেবে

কাজল। আসলে ভদ্রতার খাতিরেই কাজলকে ইনফরমেশনটা দিতে এসেছেন। সিদ্ধান্ত যখন হয়েই গেছে, একটা মজা করার সুযোগ হাতছাড়া না করে কাজল বলে, মেয়েদের ইংলিশ মিডিয়াম নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, অথচ ঘরে এসে দেখলাম বাংলা ডিকশনারি পড়ছেন। এই পরস্পর বিরোধী আচরণের অর্থ?

যেন ধরা পড়ে গেছেন এইভাবে হেসে রণজয়বাবু বলেন, বই পড়া বলতে, আমি ওই বাংলা ডিকশনারিই পড়ি। কত অব্যবহৃত শব্দ, যা প্রায় মরেই গেছে। আবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ব্যাপারটা খুব থ্রিলিং। নইলে চারপাশে খালি ইংরেজি নয়তো গুন্ডা-বদমাইশদের ভাষা। হাঁপিয়ে উঠি।

কিন্তু মেয়েদের ভাল ইংরাজি স্কুলে পাঠানোর বিষয়টা তো ক্লিয়ার হল না।

ওটা ওদের মায়ের ইচ্ছে। সেটা যে শুধু ভাল স্কুলের জন্য তাও নয়। আসল ব্যাপার হচ্ছে, ইদানীং একটা প্যানিক তৈরি হয়েছে শ্বেতার। ওর ধারণা, আমার অ্যাডামেন্সির কারণে অ্যান্টিসোশালরা খেপে গিয়ে মেয়েদের কোনও ক্ষতি করবে। তাই এখান থেকে ওদের সরিয়ে দিতে চাইছে।

সত্যিই তো। এদিকটা কখনও ভেবে দেখেনি কাজল। রণজয়বাবুর স্ত্রী কিন্তু খুব একটা ভুল কিছু বলছেন না। এমনিতে দু'-চারদিন অন্তর রণজয়বাবুর নাম কাগজে বেরোয়। তারপর কাকা হচ্ছে আর এক সাংবাদিক। রোজ রাতে খেতে বসার সময় রণজয়বাবুর নাম একবার উঠবেই। সেই প্রসঙ্গেই শেষ হবে ডিনার। কাকা বেশ গর্বের সঙ্গে রণজয়বাবুর কীর্তিকলাপ বলে যাবে। রণজয়বাবুর প্রতিবেশী হওয়া যেন অধ্যাপক হওয়ার থেকেও বড় ব্যাপার। কাকা বলে, রণজয়ের চোখটা লক্ষ করবি, একদম ডিফারেন্ট। এমনিতে তো ব্যাঙ্ক অফিসাবদের মতো দেখতে। চোখদুটোই বলে দেয়, কত সাংঘাতিক লোক। কাজলের সেরকম কিছুই মনে হয় না। ওর বরং সন্দেহ হয়, রণজয়বাবুর ভেতরে হিরো হওয়ার ছেলেমানুষি রয়ে গেছে। কাকা তার থেকেও বেশি ছেলেমানুষ, তাই এত ভক্তি করে। রণজয়বাবুর এই হিরোইজমটাকে খোঁচা দেওয়ার জন্য কাজল বলে, আপনি এত ডেসপারেট কেন? আপনার কী ধারণা, আপনি একাই মজিদপুরের সব ক্রাইম বন্ধ করে দিতে পারবেন?

না রে ভাই, নিজের স্বার্থেই আমি এত অ্যাডামেন্ট। বলতে পারো, প্রায় বাধ্য হয়েই এ সব করি।

কী রকম।

যাতে সরকার আমাকে বদলি করে দেয় কোনও নির্জন টেরিটরিতে অথবা চাকরিটাই খেয়ে নিক। আমার আর ভাল লাগে না। বদলে উলটোটাই হচ্ছে। যত

খারাপ জায়গাগুলোয় বেছে বেছে পাঠাচ্ছে আমাকে।

আপনি এই চাকরি নিলেন কেন? ভাল ছাত্র ছিলেন, অন্য জব পেতে পারতেন অনায়াসে।

হতাশ সুরে রণজয়বাবু বলেন, তখন কি আর জানতাম, পশ্চিমবঙ্গ এত তাড়াতাড়ি কোরাপটেড হয়ে যাবে। পুলিশের কোরাপশনের দিকেই নজর দেব ভেবেছিলাম। আমার স্কুলের স্যার বলতেন, দেশের সর্বক্ষেত্রে শিক্ষিত মানুষ কাজ করছেন। পুলিশের চাকরিতে সেটার খুব অভাব। অথচ পুলিশই প্রশাসনের অস্ত্র। —যা হয় গুরুদেবের কথা শিরোধার্য করে পুলিশে জয়েন করলাম। এখন ঠেলা সামলাও। চারপাশে কোরাপশান। পুলিশের ভেতরে, সমাজে, সর্বত্র। আমি ইচ্ছে করে এলোপাথাড়ি রেড করি, যদি কোনওভাবে প্রভাবশালী কারওর ল্যাজে পা পড়ে যায়, রেগে গিয়ে তিনি যদি আমার একটা হিল্লে করে দেন, বড় উপকার হয়।

মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই রণজয়বাবু মজা করছেন, নাকি সিরিয়াসলি বলছেন। তবে আসল কারণটা যে চেপে যাচ্ছেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যেই রণজয়বাবু এরকম। লোকটাকে ভারী ইন্টারেস্টিং লাগে কাজলের। একই সঙ্গে কাজলের খেয়াল পড়ে রণজয়বাবু তো এলাকার নাড়িনক্ষত্র জানেন, নিশ্চয়ই সাহেবপাড়া, সাউথ গেটের খোঁজও দিতে পারবেন। কথায় কথায় পরে জেনে নেওয়া যাবে'খন। আপাতত অন্য গল্প শুরু করে কাজল, কাকা বলছিল, সেদিন নাকি আপনারা একটা হোমিওপ্যাথি দোকান রেড করেন। কেউ অবশ্য অ্যারেস্ট হয়নি। ওখানে কী ধরনের অসামাজিক কাজ হত?

ও, সেটা একটা ছোট গ্যাং। বেশি দিনের নয়। ছোটখাটো চুরিচামারি তোলাবাজি করে হাত পাকাচ্ছে। একটা সময় এরাই ডেনজারাস হয়ে উঠতে পারে। গোড়াতেই নির্মূল করে দেওয়া ভাল। ওদের দলের লিডার ছোট এক নেতার ভাগ্নে। নিচুতলার পুলিশের সঙ্গে ভালই আঁতাত করে রেখেছে। সেই জন্যই সেদিন পালাতে পারল। ব্যাটাকে রেড হ্যান্ড যদি ধরা যায়, ওপর মহলে নড়াচড়া হবেই...

কথা চলতে থাকে। কাজল ভুলেই মেরে দিয়েছে, তার আজ কারও সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল।

আর পাঁচ মিনিট দেখব। তারপরেই চলে যাব। এই ভেবে ভেবে পোস্টাফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আধঘণ্টা কাটিয়ে ফেলল আইরিন। কাজলের দেখা নেই।

রাস্তাটা মোটামুটি নির্জন। আইরিনকে সেভাবে কেউ লক্ষ না করলেও, গুমটির

দোকানদার বারবার তাকাচ্ছে। ব্যাপারটা ভারী অস্বস্তিকর। কাজলের ক্যালাসনেস দেখে, হতবাক হয়ে গেছে আইরিন। মাঝে মাঝে এটাও মনে হচ্ছে, ওদের পাড়ায় কি বৃষ্টি হচ্ছে এখন। দূরে উত্তর মজিদপুরের মাথায় একখণ্ড হিংসুটে কালো মেঘ দাঁড়িয়ে থাকলেও, বৃষ্টি হওয়ার ক্ষমতা নেই তার। তা হলে কেন আসছে না কাজল! আইরিন কি ভুল বন্ধু নির্বাচন করল?

কাজলকে মনে হয়েছিল, আর পাঁচটা ছেলের থেকে আলাদা। মেয়ে দেখলেই প্রেমে পড়ে যায় না সে। বন্ধুত্বের জন্য একটা দীর্ঘ নির্জন রাস্তা ওর বুকের মধ্যে আছে। সেই রাস্তায় অফুরন্ত নির্মল বাতাস আর গাছপালার গন্ধ। সেখানে গিয়ে প্রাণ ভরে নিশ্বাস নেবে ভেবেছিল আইরিন। তার আশপাশের বাতাস ক্রমশ ভারী হয়ে আসছে। বাবা ক'দিন হল ভীষণ গম্ভীর। কেন বোঝা যাচ্ছে না। পরশু অনেক রাত অব্দি পুতুলপিসিদের বাড়িতে ছিল। অধৈর্য হয়ে আইরিন ডাকতে গেল বাবাকে; দেখে, বাবা আর অঘোরদাদু বসে কী সব আলোচনা করছে। ফ্যাক্টরি বন্ধ হওয়ার পর, কয়েকটা বছর বাবারা প্রায়ই এরকম আলোচনায় বসে যেত। পরশুদিন কারখানা নিয়েই কথা বলছিল বাবারা। ওপর ওপর শুনে আইরিন যতটুকু বুঝেছে, অঘোরদাদু কোনও ব্যবসা করতে যাচ্ছে। বাবার তাতে সায় নেই। বাবা বলছে, কারখানা খোলার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ক'দিন দেখে ইনভেস্টমেন্ট করুন।

অঘোরদাদুর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, বাবার কথায় ঠিক ভরসা পাচ্ছে না। অস্ফুটে বলল, এর আগেও তো বহুবার এরকম কথা শুনেছি।

মেঝেয় বসা পুতুলপিসি হাঁ করে বাবাদের কথা গিলছিল। চৌকাঠে দাঁড়ানো আইরিনের কেন জানি মনে হয়, বাবা হয়তো ওদের হয়ে যাচ্ছে। নিরাপত্তাহীন নার্ভাস গলায় আইরিন বলেছিল, অনেক রাত হয়েছে বাবা। খেতে চলো।

তুই যা। আমি আসছি। বলে বাবা আবার ওদের সঙ্গে কথায় মেতে গেল। খুবই খারাপ লেগেছিল আইরিনের। অভিমানে উঠোন পেরোতে পেরোতে ভাবছিল, বেকার বাবা আমায় কী নিরাপত্তা দেবে! তার থেকে মায়ের কাছে গিয়েই থাকব।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই সে অবশ্য সিদ্ধান্ত বদলায়। এত তাড়াতাড়ি নিজের জেদের কাছে হেরে যাব! একবার যদি মায়ের কাছে গিয়ে থাকা শুরু করি, মা আর কোনওদিন এখানে আসবে না। বাবার কারখানাটা এবার যদি সত্যিই খুলে যায়, মাকে ফিরে আসার জন্য বলা যাবে। এ কথাও বলবে আইরিন, মিছিমিছি তুমি পুতুলপিসিকে সন্দেহ করো মা। মাঝে মধ্যে দু'-এক বাটি তরকারি নিয়ে আসা ছাড়া পুতুল পিসি এ বাড়িতে পা রাখে না। বাবাকে নিয়ে কোনও বাচালতাও

করতে দেখিনি। আর বাবার নাম করে যে সব রান্না আনে, আমি দিই-ই না। নিজেই খেয়ে ফেলি। রাঙাদিদা রাঁধে খুব ভাল তো। —এত সব ভাবনার মাঝে একটাই সন্দেহ মাথায় উঁকি মারে। সত্যিই যদি ফ্যাক্টরি খোলার সম্ভাবনা দেখা যায়, তা হলে বাবা এত গম্ভীর কেন? কারখানায় গেট মিটিং থাকলে বাবা ইদানীং যায় না। স্বপনকাকু নিজে এসে সেদিন বলে গেল, তোর বাবার কী খবর রে, কোনও মিটিংয়ে যায় না। বউদি এসেছে না কি?

না, মায়ের সঙ্গেই দেখা করতে গেছে বাবা। মিথ্যেটা বলে যে কী ভাল লেগেছিল আইরিনের, সত্যিই সে দেখতে পেয়েছিল, বাবা হঠাৎ মায়ের অফিসে গিয়ে হাজির। মা ভীষণ অপ্রস্তুত। বলছে, এ কী, চার বছর আগের জামা পরে চলে এসেছ!

কী করব। আমি তো নিজে কোনওদিন নিজের জন্য জামা-কাপড় কিনিনি। আগে মা কিনে দিত। এখন আইরিন।

বাবার মুড অফ দেখে, আইরিনের ধারণা হয়েছিল, দালালি বা সাপ্লাইয়ের কারবার বোধহয় ভাল চলছে না। নতুন করে দুশ্চিন্তায় পড়েছে বাবা। যদি কোনও সাহায্য করা যায়, এই ভেবে স্টুডিয়োতে গিয়ে নিজের দু'কপি ছবি তোলাল আইরিন। বাবার কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, পাঠিয়ে দেব ওদের অফিসে? ডিরেক্টার সেরকমই বলেছিল তো?

ইচ্ছে হলে দাও। বলে দায়সারা উত্তর দিয়েছিল বাবা। বোঝা গিয়েছিল সমস্যাটা তা হলে আর্থিক নয়। ছবিদুটো পাঠায়নি আইরিন। কিন্তু এখন তার কী করা উচিত কিছুই বুঝতে পারছে না। মাকেও ক'দিন ধরে ফোন করা হয়নি। নিশ্চয়ই একটা উত্তরের অপেক্ষায় আছে। আইরিনের এ কথাও মনে হচ্ছে, বাবাকে এবার বলে ফেলা উচিত, মায়ের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। ফ্ল্যাট কিনতে যাচ্ছে মা। তুমি গিয়ে আটকাও। বাবার থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে সাহস পাচ্ছে না। ক্রমশ ভারী হয়ে আসছে আশপাশের বাতাস। মনে হচ্ছে কিছুদিনেব মধ্যেই আইরিনদের পরিবারে বড় কোনও পরিবর্তন ঘটে যাবে। কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে আইরিনের। এই পরিস্থিতিতে একজন বন্ধুর খুব প্রয়োজন হয় মানুষের। যাকে সব কিছু খুলে বলা যায়। আইরিনের তো সেরকম কোনও বন্ধু নেই। ঘনিষ্ঠ যে দু'-একজন ক্লাসমেট আছে, তাদের বলতে গেলে, খুব সতর্ক থাকতে হবে। না হলেই কেচ্ছার গন্ধ পেয়ে ছলবল করে উঠবে তারা। এই জন্যেই কাজলের বন্ধুত্ব চাইছিল আইরিন। ওর চেহারায় আপাত যে উদাসীনতা দেখা যায়, ওটা শিষ্টাচার। আসলে ওর মনের মধ্যে অসাধারণ একটা

সহানুভূতিশীল মানুষের বাস। এরকমটাই বিশ্বাস করে আইরিন। কেন না পুরুষদের মধ্যে যে চিরাচরিত আগ্রাসনের প্রয়াস, ডমিনেট করার আকাঙ্ক্ষা, কোনওটাই ওর আচরণে নেই। অনেকটা আমার বাবার মতো ভেবেই, নিজেকে ধমকায় আইরিন। কেন মিছিমিছি ওর সঙ্গে বাবাকে গুলিয়ে ফেলছি। ওকে যেন কখনও বাবার মতো দুঃখ পেতে না হয়।

দোকানদারটা এখনও দেখেই যাচ্ছে আইরিনকে। কোনও ক্লান্তি নেই! হঠাৎই আইরিনের মাথায় আসে, কাজল এসে ফিরে যায়নি তো? হয়তো খুব পাংচুয়াল ছেলে। ওর হ্যাবিট আইরিনের অজানা। এখানে আসতে মিনিট পনেরো দেরি হয়েছে আইরিনের। হয়তো ফিরেই গেছে। এর উত্তর দিতে পারে একমাত্র দোকানদার। ওর দোকানের সামনে দাঁড়িয়েই সিগারেট খায় কাজল।

আইরিন দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে একটা মিন্ট লজেন্স দিতে বলে। জার নামিয়ে কোলের ওপর বসায় দোকানদার। ঢাকনা খুলতে খুলতে বাতাসকে বলার ভঙ্গিতে বলে, আজ আর আসবে না। শরীরটরীর খারাপ হয়েছে হয়তো।

মজা পেয়ে আইরিন বলে, আমায় কিছু বললেন?

না না, তোমাকে নয়। আমার সাপ্লায়ারের কথা বলছিলাম।

হাসিটা কষ্ট করে চেপে, আইরিন লজেন্স নিয়ে পয়সা দেয়। তারপর উদ্দেশ্যহীন হাঁটতে থাকে। উত্তরটা সে পেয়েই গেছে। এখন কী করা যায়? ফোন করবে কি? উত্তর আকাশের দিকে তাকায়। হিংসুটে মেঘটা আকাশের অনেকটাই দখলে নিয়ে নিয়েছে।

রণজয়বাবু খুবই গল্পে মানুষ। উঠি উঠি করেও দশ মিনিট হয়ে গেল। কাকি ইতিমধ্যে আর এক রাউন্ড চা দিয়ে গেছে। কাজলেরও বেশ ভালই লাগছে আড্ডা মারতে। অনেক পরে হলেও মজিদপুরে একজন গল্প করার লোক পাওয়া গেল। ভদ্রলোক অবশ্য সাহেবপাড়া, সাউথ গেটের খোঁজ দিতে পারলেন না। বললেন, কত গলি ঘুঁজি, পাড়া! কত ধরনের নাম। বিশেষ কোনও ইনসিডেন্স না হলে মনে থাকে না। তবে আমি খোঁজ নিয়ে জানাব।

নানান কথার মাঝখানে রণজয়বাবু একবার করে জিজ্ঞেস করে নিচ্ছেন, মেয়েদুটোকে তা হলে এখানকার স্কুলেই রেখে দিই, কী বলো?

কিছু কিছু বড় পদের মানুষ থাকেন, ছোটখাটো সিদ্ধান্ত নিতে তাদের ভীষণ দ্বিধা হয়। অফিসের আর্দালি থেকে শুরু করে কনস্টেবলকে পর্যন্ত ক'দিন ধরে পরামর্শ চেয়ে উত্ত্যক্ত করে ছাড়বেন।

সোফা ছেড়ে এবার উঠেই পড়েছেন রনজয়বাবু। এমন সময় কলিং বেল। কাকা ফিরল বোধহয়। দরজা খুলতে যায় কাজল।

দরজার মুখে বাবাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেও কাজল এতটা অবাক হত না, আইরিনকে দেখে যতটা হয়েছে। বাইরে ভীষণ রোদ। আইরিনের নীল রং পুড়ে বেগুনি হয়ে গেছে।

রূপাকাকিমা আছেন? প্রশ্নের ধরন, ভাবলেশহীন মুখভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কাজলকে চিনতে চাইছে না। খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ওর এ বাড়িতে চলে আসাটা তার থেকেও বেশি অস্বাভাবিক। মেয়েটা নির্ঘাত খেপি আছে। কাজল বলে, কাকি আছে। বসো, ডেকে দিচ্ছি।

কাজল ভেতরঘরের দিকে যাচ্ছিল, রণজয়বাবু বলে ওঠেন, ও, আর একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। তুমি দাবা খেলতে পারো?

কাজল হেসে বলে, পারি।

চলে এসো তা হলে আজ রাত্তিরে। দু'-এক হাত খেলা যাবে। তখনই আমার মিসেসকে কনভিন্স কোরো, যাতে অলি, কলিকে এখানে রাখা যায়।

আচ্ছা যাব।

আমি তা হলে চলি। বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন রণজয়বাবু। আইরিন সোফায় এসে বসে।

কাকিকে ডাকতে গিয়েও দাঁড়িয়ে যায় কাজল।

আইরিন এখন একলা আছে, এইবেলা স্যরিটা চেয়ে নেওয়া যায়। পরে হয়তো সুযোগ পাওয়া যাবে না।

আইরিনের কাছে এগিয়ে আসে কাজল। চাপা গলায় বলে, আই অ্যাম সো স্যরি। ভোরবেলায় এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিলাম। সেখানেই এত দেরি হয়ে গেল, ভাবলাম তুমি হয়তো ...

দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে আইরিন বলে, রূপাকাকিমা কি খুব ব্যস্ত? পরে আসব আমি?

কাজল অপ্রস্তুত হয়। বলে, না না আমি এক্ষুনি ডেকে দিচ্ছি।

কাজল বেরিয়ে যেতে দম ছাড়ে আইরিন। দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার পেছনে দুটো কারণ ছিল। এক, কাজলকে উপেক্ষা করা। দুই, নিজের নির্লজ্জ চাউনিটাকে সরিয়ে রাখা। এলোমেলো চুলে, স্যান্ডো গেঞ্জি, পাজামা পরা কাজলকে এত সুইট লাগছিল যে, না তাকিয়ে পারা যায় না। চুম্বকের মতো টান ছিল উন্মুক্ত দুই বাহু, গেঞ্জির আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা নরম ঘাসের অরণ্য

আহ্বান। খোলা কাঁধ, গ্রীবা যেন সূর্যাস্তের মায়াবী মরু-পাহাড়। ছেলেদের থেকে এত তীব্র আকর্ষণ আগে কখনও বোধ করেনি আইরিন। ছেলেটাকে নিয়ে তো মুশকিলে পড়া গেল! প্রেমে পড়িয়ে ছাড়বে। পরে আবার আর এক সমস্যা, বন্ধু-বান্ধবদের আলাপ করাতে ভয় পাবে আইরিন। পাছে কেউ নজর দেয়।

রূপাকাকিমা একাই এল, এ কী রে, তুই এখানে এসে বসে আছিস! ভেতরে যাসনি কেন?

যেতাম। যা একখানা পালোয়ান মার্কা ছেলে দরজা খুলল। ভেতরে যাওয়ার সাহস পাইনি।

কথার শেষে কাজল এসে দাঁড়ায়। পরনে ঢোলা মার্কা একটা গেঞ্জি। রূপা বলেন, আয় তোদের আলাপ করিয়ে দিই। এ হচ্ছে কাজল। আমার ভাশুরপো। আর এ হচ্ছে ...

কথা কেড়ে নিয়ে কাজল বলে, আইরিন। তোমাদের ক্লাবের মেম্বার, সুরূপা হয়েছিল।

কারেক্ট, তুই বেশ মনে রেখেছিস তো! অবাক হয় রূপা। তারপর আইরিনকে বলে, তা কী ব্যাপার বল? হঠাৎ কী মনে করে! বহুদিন হয়ে গেছে, এ বাড়িতে আসিসনি।

অজুহাত আইরিনের ঠিক করাই ছিল। আবদারের সুরে বলে, একটা সোলো প্রোগ্রাম আছে। তোমার বাসন্তী রঙের সাউথ ইন্ডিয়ানটা দেবে?

কেন দেব না! নিশ্চয়ই দেব। অবশ্য কেউ যদি না নিয়ে গিয়ে থাকে। কিছুই তো মনে থাকে না আমার। তোরা ততক্ষণ বসে গল্প কর, আমি খুঁজে দেখি। চা খাবি তো?

সম্মতির অপেক্ষা না করেই চলে যায় কাকি। দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামির মতো বসে থাকে কাজল। আইরিনই শুরু করে, একটা নিরীহ মেয়েকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখতে খুব মজা লাগল, না আপনার।

কাজল মুখ তুলে একবার আইরিনকে দেখে নেয়। এই যদি নিরীহর নমুনা হয়, তা হলে অভিধানে মানেটা পালটে লিখতে হবে। আইরিন আবার বলে, মিথ্যে কথা বলতেও গলা কাঁপে না আপনার! বললেন, সকালে কোথাও গিয়েছিলেন। একদম মিথ্যে কথা। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন। এরকম অলস ছেলে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

আইরিনের সরল রাগ, অভিমান দেখে হাসি পেয়ে যায় কাজলের। মেয়েটার মধ্যে তোতা, অলি, কলিদের থেকেও ছোট একটা মেয়ে লুকিয়ে আছে। তাই এত

অকপট। দুষ্টুমির হাসি হেসে কাজল বলে, আমি কিন্তু সত্যিই গিয়েছিলাম। তবে স্বপ্নে।

এবার আইরিনও হেসে ফেলে। তারপর বলে, আপনি নিশ্চয়ই ভাবতে পারেননি, আমি এ বাড়িতে চলে আসব। অন্য বাড়ি হলে হয়তো পারতাম না। রূপাকাকিমার বাড়িতে আমরা বহুবার রিহার্সাল দিয়েছি। তাই ভাবলাম, আপনাকে একটু অবাক করে আসি।

কথার মাঝে কাকি আবার ঘরে আসে। দুশ্চিন্তার গলায় বলে, পাচ্ছি না রে আইরিন। কাউকে দিলাম নাকি বল তো শাড়িটা!

আইরিন বলে, তা হলে থাক, আমি অন্য শাড়ি পরে কাজ চালিয়ে নেব।

না না সে কী কথা, আমার তো আরও অনেক শাড়ি আছে। যেটা ইচ্ছে নিয়ে যা। বলে কী একটা ভেবে নেয় রূপাকাকিমা। তারপর বলে, দাঁড়া আর একবার দেখি। কাজলকে বলে, আইরিনকে তোর ঘরটায় নিয়ে যা না। এক্ষুনি তো তোর কাকা এসে, কাগজ নিয়ে বসবে এ ঘরে। কিন্তু তিনি যে কেন এখনও ফিরছেন না! কোনও ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি ঢুকে গেছে বোধহয়। তারা হয়তো জলখাবার খাইয়ে দিয়েছে, ভুলেই গেছে বাড়ির কথা।

বকবক করতে করতে কাকি আবার বেরিয়ে গেল। কাজল আইরিনকে বলে, যাবে আমার ঘরে?

আইরিন এখন কাজলের ঘরের জানলায়। এ বাড়িতে আগে এলেও, এই ঘরটায় আসেনি। জানলা দিয়ে বাইরেটা কী সুন্দর দেখাচ্ছে। গাছপালা, পুকুরঘাট, আকাশেব হিংসুটে মেঘটাও তার দখলদারি ছেড়ে চলে গেছে। মজিদপুরে যে এরকম সজল একটা জায়গা আছে, এ ঘরে না এসে দাঁড়ালে বোঝা যেত না, নানান ধরনের পাখির ডাকও ভেসে আসছে। পাখির ডাক নিজেদের বাড়িতে বসেও কিছু কম শুনতে পায় না আইরিন। ওদের বাড়ির গায়েই বিশাল আমগাছ। ও পাড়ার পাখি এ পাড়ায় অনায়াসে যাতায়াত করে। মানুষ এত সহজ হতে পারে না।

ঘরটা এত পছন্দ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আইরিনের এ কথাও মাথায় আসে, কাজল চলে গেলে তো আবার এ ঘরটা বন্ধ হয়ে যাবে।

ঘাড় ঘুরিয়ে কাজলের দিকে তাকায় আইরিন। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আইরিনকেই দেখছিল কাজল। আইরিন বলে, আপনি হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে বর্ধমান ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হলেন কেন? আপনি কি এখানে থাকবেন ঠিক করেছেন?

সেই ইচ্ছেই তো ছিল। কিন্তু থাকা যাবে না মনে হচ্ছে।

'কেন' জানতে চাইলে, বেশি আগ্রহ দেখানো হয়ে যাবে বুঝে আইরিন বলে. না থাকাই ভাল। কী আছে এখানে! ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট। আনস্মার্ট লোকজন, দুটো সিনেমা হলের একটা বন্ধ। অন্যটায় ভদ্রলোকেরা যায় না। মার্কেট বলে কিছু নেই। যে যেখানে পারছে, বসে গিয়ে ব্যবসা করছে। একটা স্ট্যান্ডার্ড দোকান নেই। থাকবে কী করে, বেশিরভাগ কারখানাই তো লকআউট। মজিদপুরের লোকেরাই মজিদপুরে থাকতে চায় না। আপনি আবার ... বলতে বলতে থেমে গেল আইরিন। কাজল বলে, এসব সত্ত্বেও আমি এখানে থাকতেই এসেছিলাম।

কেন? এবার আর না জিজ্ঞেস করে পারে না আইরিন।

একটা কারণ, এটা আমাদের আদি বাড়ি। টান তো থাকবেই। দ্বিতীয় কারণটা পরে কখনও বলব।

আইরিন জানে, দ্বিতীয় কারণটা সে। এখনই বলতে হয়তো লজ্জা পাচ্ছে কাজল। ওকে আর অপ্রস্তুত না করে আইরিন বলে, চলে যেতে হবে কেন?

বাবা কলকাতায় একা। আমি না থাকাতে, একটু আপসেট হয়ে পড়ছে। অ্যাফেক্টেড হচ্ছে আমাদের বিজনেস। ছোট ব্যবসা হলেও, কিছু পরিবার তো ডিপেন্ড করে থাকে। তাদের কথা ভেবেও অন্তত আমার যাওয়া উচিত।

মালিক শব্দটার ওপরই এতদিন একটা বিরূপ ধারণা ছিল আইরিনের। এই প্রথম সেটা ভাঙছে। মুখ ফুটে বেরিয়ে আসতে চাইছে একটা কথা, নিয়ে যাবে আমাকে? সেটা না বলে আইরিন অন্য আবদার করে, এখানে থাকার সেকেন্ড আকর্ষণটা কী আজ বলা যাবে না?

তখনই সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে রূপাকাকিমার গলা, পেয়েছি, আইরিন তোর শাড়ি পেয়েছি।

কাকিমাটা সত্যিই ভীষণ ভাল মানুষ। নিজের শাড়িকে বলছে, তোর শাড়ি। এদের বাড়ির পরিবেশটাই অন্যরকম। আইরিনদের বাড়িটা কি এরকম হতে পারত না? পারত। যদি বাবাদের মালিক মনে করত তাদের স্টাফেদের একটা করে পরিবার আছে।

এই নে তোর শাড়ি, এটাই তো? রূপাকাকিমা ঘরে ঢুকে এসেছে। আইরিন শাড়িটা নিয়ে মিথ্যে উচ্ছ্বাস দেখায়। কাজল চলে গেছে নিজের চেয়ার টেবিলে। কী যেন লিখছে।

আইরিন বলে, আমি তা হলে আসি কাকিমা।

আচ্ছা আয়।

আড়চোখে কাজলকে দেখে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায় আইরিন। কাকিমা পাশে এসে চাপা গলায় বলে, এবার থেকে এরকম চলেই আসবি। খামোকা ফোন করতে যাস কেন! মিছিমিছি খরচা। আমাকেও হ্যান্ডসেট নিয়ে কাজলকে খুঁজে মরতে হয়।

প্রচণ্ড অস্বস্তিতে পড়ে গেছে আইরিন। রূপাকাকিমা সেদিনের ফোনের গলাটা আজ মিলিয়ে নিয়েছে। ওদিকে ভান করে, কিছুই মনে রাখতে পারে না।

মিটিমিটি হাসছে কাকিমা। আইরিন লজ্জায় মাথা নামিয়ে নেয়। অবস্থা সামাল দেয় কাজল। চেয়ার থেকে উঠে এসে বলে, চলো তোমায় একটু এগিয়ে দিই।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে বেশিদূর এল না কাজল। ছোট্ট একটা চিরকূট আইরিনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, এতেই লেখা আছে, আমার এখানে থাকতে চাওয়ার দ্বিতীয় কারণ।

বিকেল যত গড়ায় দিল্লি রোড প্রাণ পেতে শুরু করে। নিরুদ্দেশের লক্ষ্যে আপনা থেকেই এঁকেবেঁকে এগিয়ে যায়। ওই যাওয়ার ভঙ্গিতে অদৃশ্য এক ইশারা আছে। সব ছেড়ে চলে আসতে রাস্তাটা যেন ডাকে। ধ্রুব যাবে। একদিন ঠিক যাবে। আর বেশিদিন হয়তো বাকি নেই। মজিদপুরের মায়াবন্ধন ক্রমশ খসে পড়ছে গা থেকে। বলা যেতে পারে, খসিয়ে দিচ্ছে ধ্রুব নিজেই। সোনাদের দলটাকে অনায়াস দক্ষতায় নেতৃত্ব দিচ্ছে। আর কিছুদিন পরেই প্রকাশ হয়ে পড়বে ধ্রুবর স্বরূপ। সমাজের চোখে সে তখন ব্রাত্য, অবাঞ্ছিত। নিজের চোখে, ব্যর্থ স্বামী, প্রতারক প্রেমিক, ভণ্ড পিতা। মায়ের কুসন্তান। একে একে প্রমাণ হলেই সে বেরিয়ে পড়বে এই ভ্রান্ত মায়াপাশ থেকে।

আপাতত সে এখন নেপালের ধাবায়। দিল্লি রোডের ওপারে বিস্তীর্ণ জলা পেরিয়ে আবছা জঙ্গল-রেখায় সূর্যদেব ঘটা করে অস্ত যাচ্ছেন। আকাশে পাখিদের ঘরে ফেরার ব্যস্ততা। এরকম একটা মায়াময় পরিবেশে কয়লা চুরি হচ্ছে ধাবার একটু দূরে। ধ্রুব নিজের গোল বক্সের মধ্যে বসে পুরো অপারেশনটায় নজর রাখছে।

ধ্রুবর ছেলেরা ট্রাক ঘিরে দাঁড়িয়ে। ট্রাকের কুলিরা নামিয়ে দিচ্ছে লিগনাইট কয়লা। ধ্রুবদের ফিট করা কুলিরা তুলে দিচ্ছে পিট কয়লা। টোয়েন্টি পার্সেন্ট কয়লা ঘাপলা হয়ে যাচ্ছে। এগুলোই গিলবে ব্যান্ডেল থার্মাল, কোল ইন্ডিয়া।

অপারেশনটায় ঝামেলা কম, লাভ বেশি। ধ্রুব এসে যাওয়াতে কাজটা আরও স্মুথ হয়েছে। ফুটবল জ্ঞানের সূত্রে ধ্রুব সমস্ত মুভমেন্ট আগে ছক কষে বুঝিয়ে দেয়। কে কোন পজিশনে দাঁড়াবে। কে মুভ করবে আগে। তার সাপোর্টিং লাইনে আর একজন। ম্যান মার্কিং-এরও ব্যবস্থা রেখেছে ধ্রুব। নিজে থাকে সব থেকে পেছনে। প্রিয় জায়গা গোলবক্স। ধ্রুবর প্ল্যানিং-এ সফলতাও আসছে। খুব এনথু পেয়ে গেছে সোনার ছেলেরা। অচিরেই ধ্রুব যে একজন কেউকেটা হয়ে উঠবে, এ ব্যাপারে ওদের কোনও সন্দেহ নেই। ছেলেগুলোর ওপর খুব একটা বসিং করে না ধ্রুব। ওরা নির্বিবাদে সপ্তাহে একদিন শীলবাজারে তোলা চুলছে। ঝেড়ে ফাঁক করে দিচ্ছে প্রমোটারদের ইট, বালি, ধ্রুবর কিছুতে না নেই। শুধু বলেছে, যা করবি কর, দুম করে চালিয়ে দিবি না। সেরকম সিচুয়েশন হলে, আমি গিয়ে সামলাব। সেই পরিস্থিতি এখনও আসেনি। সোনার দেওয়া মালটা পকেটে শুয়ে মাঝেমধ্যে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। গরম গরম ঠেকে পকেটটা। জিনিসটা সত্যিই মাদুলির মতো কাজ করে। এই তো সেদিন, এমন একটা কথা বলল পুতুল। মাথাটা দপ করে জ্বলে উঠল। অন্য সময় হলে পুতুলের সামনে থেকে সরে যেত ধ্রুব। সেদিন সপাটে জাপটে ধরল, ওর ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে দিতে দিতে বলেছিল, তুই এটাই তো চাস, নাকি? নে। আমার বউমেয়ে নিয়ে কথাগুলো বলা বন্ধ কর।

সেদিন হয়তো আরও কিছু হয়ে যেত। হাত চলে গিয়েছিল বহুদিন আগে ফেলে আসা বর্ষার পুকুরঘাটে পড়ে থাকা যমজ তালের ওপর। ধ্রুব পিছলে যাচ্ছিল নরম কাদায়। শরীরের আরও সব বিপজ্জনক বিভাজন ডাকছিল ধ্রুবকে। মাটির গন্ধের মতো পুতুলের সদ্য কিশোরীবেলা পেরনোর গন্ধ নাকে এসে লাগছিল। এত অবহেলা সত্ত্বেও সেই পুকুর পাড়, ঘন মেঘের আকাশ, গন্ধ আজও হারিয়ে যায়নি। প্রাকৃতিক নিয়মেই পরিপূর্ণতার শেষ সীমায় পৌঁছেছে। ওই ভরা পুকুরে পাল্লা টানতে টানতে যেতে একটুও ভয় পাচ্ছিল না ধ্রুব। অথচ এই ভয়টাকে ভুল বুঝে শ্রীতমা চলে গেছে। তা হলে আজ কী করে পারছে ধ্রুব। তখনই খেয়াল পড়েছিল পকেটে থাকা পিস্তলটার অস্তিত্ব। সত্যিই তাবিজ, মাদুলির মতো কাজ করছে।

বাদ সাধল ওই মালটাই। পুতুল বলে উঠল, তোমার পকেটে ওটা কী গো? গায়ে ফুটছে।

ছিটকে সরে গিয়েছিল ধ্রুব। পুতুল 'দেখি না, দেখি না' করছিল। দ্রুত প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেয় ধ্রুব। বলে, তুই এবার বিয়েয় বস পুতুল। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। যা খরচ লাগে আমি দেব।

পুতুল ফোঁস করে ওঠে, ছোট ছিলাম, ভুলিয়েভালিয়ে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছিলে, আর আমি যাচ্ছি না। আইরিন মায়ের কাছে চলে গেলেই জিনিসপত্তর নিয়ে আমি এ ঘরে এসে উঠব।

এই কথার আগের সূত্রেই মাথাটা গরম হয়েছিল ধ্রুবর। পিওন চলে যাওয়ার পর ধ্রুব রেস্ট নিচ্ছিল। পুতুল এসে বিছানায় বসে, মা পাশের ঘরে। মেয়ে হয়তো স্কুলে। পুতুল বলল, ধ্রুবদা, মেয়েকে বোধহয় আর আটকাতে পারবে না।

উদ্বেগে সামান্য উঠে বসে ধ্রুব। চোখে প্রশ্ন। পুতুল বলে যায়, টেলিফোন বুথে প্রায়ই আইরিনকে ফোন করতে দেখি। তুমি যখন থাক না। মাঝে মধ্যেই কলকাতায় চলে যায়।

কার কাছে? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চায় ধ্রুব।

কার কাছে আবার, শ্রীতমা বউদির কাছে নিশ্চয়ই। মা-মেয়ের মধ্যে ভালই ষড় আছে। তোমার চোখে ধুলো দিয়ে রাখে। বউদি ইচ্ছে করেই মেয়েকে এখানে রেখেছে। তোমাকে পাহারা দেওয়ার জন্য। কোনও একদিন দেখবে, মেয়ের বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। তোমাকে নেমন্তন্নও করেনি, বলে বিচ্ছিরি ভাবে হাসছিল পুতুল। গা জ্বালানো হাসিটা বন্ধ করতেই, ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ধ্রুব।

ধ্রুবদা চা। নেপালের ডাকে সংবিৎ ফেরে। চায়ের গ্লাস নিয়ে ধ্রুব অপারেশনের ওপর চোখ বোলায়। কেমন একটা খটকা লাগে। ট্রাক ঘিরে লোকজন একটু বেশি মনে হচ্ছে। চা-টা তিন ঢোঁকে শেষ করে খাটিয়া থেকে উঠে পড়ে ধ্রুব। বাইরের কিছু ছেলের সঙ্গে ধ্রুবর গ্রুপের কোনও ব্যাপারে খিচাইন হচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি সেটা হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যাবে।

বাঁ পকেটে একবার হাত বুলিয়ে ধ্রুব এগিয়ে যায়। হঠাৎ দেখে, ফুচা ঊর্ধ্বশ্বাসে এদিকে দৌড়ে আসছে। ট্রাকের পেছনে চলছে গা ধাক্কাধাক্কি। ফুচা হাঁপাতে হাঁপাতে সামনে এসে বলে, ধ্রুবদা, তাড়াতাড়ি কেটে যাও। ভোলা পালের গ্রুপ। তোমাকে খুঁজছে।

এই এলাকাটা ভোলা পালের। তবে এসব ছোটখাটো কাজে ওরা হাত নোংরা করে না। তেল টানা ওদের মেন কারবার। দিল্লি রোডের গায়ে লাইসেন্সবিহীন একটা বার কাম হোটেলের নীচে ওদের আন্ডার গ্রাউন্ড বিশাল গ্যারেজ আছে। সেখানেই অয়েল চেম্বার। তেলের ট্যাঙ্কারগুলো যাওয়ার পথে একবার আন্ডার গ্রাউন্ড চেম্বারে ঘুরে যায়। ভোলা পালের নেটওয়ার্ক অনেক দূর ছড়ানো। টাকা খায় পলিটিকাল লিডার থেকে শুরু করে ওপর তলার পুলিশ অব্দি। এ হেন ভোলা পালের কী এমন অভাব পড়ল, ভিখিরিদের ভাতে ভাগ বসাতে এসেছে।

কী ভাবছ বলো তো। বলছি কেটে যাও। ওরা তোমায় খুঁজছে। কোনওরকমে ঠেকিয়ে রেখেছি আমরা।

আমায় খুঁজছে কেন?

সে পরে বলব। এখন পালাও।

ফুচার কথা শেষ হতে না হতে নেপালের চায়ের মাচায় একটা পেটো এসে ফাটল। চমকে গিয়ে পকেট থেকে মালটা বার করে ফেলে ধ্রুব। পজিশন নিতে গেলে ধাক্কা মারে ফুচা। বলে, পাগল হয়ে গেলে নাকি। ভোলা পালের ছেলে মাটি নিলে, আমাদের বংশসুদ্ধু লোপাট করে দেবে।

ধোঁয়া, বারুদের গন্ধের ভেতর দিয়ে পরের পেটোটা ধাবার খাটিয়ায় এসে পড়ে ফাটেনি। দড়ির ওপর দোল খাচ্ছে। দৌড়ে আসছে ভোলা পালের ছেলেরা। ধ্রুবর কনুই ধরে টানে ফুচা। বলে, দৌড়ও ধ্রুবদা।

দৌড়তে দৌড়তে কখন যেন ছিটকে গেছে ফুচা। বাকি ছেলেগুলোর কী হল কে জানে! তবে যে যেখানেই পালাক, ঠেকে এসে জমা হবে। সেরকমই নির্দেশ দেওয়া আছে। ধ্রুবও বাঙালবস্তি লক্ষ্য করে দৌড়ে যাচ্ছিল। ডিস্ট্রিক্ট মাঠে এসে দৌড় থামিয়ে দেয়। এ মাঠেই কতবার কত গোল সেভ করেছে। মাঠ ঘিরে বসে থাকা সাপোর্টারদের উল্লাস। সতীর্থরা দৌড়ে এসে পিঠ চাপড়ে দিত। দূরে লাইব্রেরির বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকত শ্রীতমা। বই পালটাতে আসত। পাক্কা দু'মাস লাগিয়ে দিয়েছিল একটা মিষ্টি হাসি হাসতে। সেদিন কিন্তু একটা বিচ্ছিরি গোল খেয়ে গিয়েছিল ধ্রুব। কাদা মাঠে হড়কে, ভূত হয়ে উঠে দেখে, বিকেলের তারা জ্বলছে।

সন্ধে নেমে আসা লাইব্রেরির বারান্দার দিকে না তাকিয়েই বাঙালবস্তির দিকে হাঁটা দেয় ধ্রুব।

ঠেকে এসে দেখে, সবাই আগেই পৌঁছে গেছে। তবু একবার মাথা গুনতি করে নেয় ধ্রুব। তখনই চোখে পড়ে কানাইয়ের চোখের নীচে অনেকটা কেটে গেছে। রক্ত লেগে আছে ওখানে। উদ্বিগ্ন ধ্রুব বলে, সে কী রে, ডেটল-ফেটল কিছু লাগিয়েছিস?

দাঁত দিয়ে চুল্লুর প্লাস্টিক পাউচ ছিঁড়তে ছিঁড়তে কানাই বলে, এই শালা, বাকার্ডি বাংলাই একটু লাগিয়ে দেব।

ধ্রুব ধমকে ওঠে, খবরদার না। দেখছি এ ঘরে কিছু পাওয়া যায় কি না।

দেবা হাসতে হাসতে বলে, এ ঘরে কিছু পাবে না, এ শালা শিবু মাতালের ঘর।

ব্যাটা বাতেলাবাজ, বলে কিনা, ওর একবার টাইফয়েড হয়েছিল, চুল্লু খেয়ে সারিয়েছে।

সবাই খ্যাক খ্যাক করে হাসতে থাকে। ধ্রুব পাত্তা না দিয়ে ঘরের এ তাক ও তাক খুঁজতে শুরু করে। ধুলো পড়া অযত্নের গৃহস্থালির ওপর এখনও যেন কোনও মমতাময়ীর গুছিয়ে সংসার করার ছাপ লেগে আছে। শিবু মাতালের থেকে এই ঘরটা সোনা ভাড়ায় নিয়েছে। শিবু রাতে একবারই ফেরে। একদিন ভুল করে সন্ধেবেলা ফিরে এসেছিল। ধ্রুবদের দেখে জিভ কাটে। বলে, স্যরি বস, নিখিলদার ঘড়ির দোকানটা বন্ধ ছিল বলে, টাইমটা বুঝতে পারিনি। আমি তো ভেজালে বিশ্বাস করি না। ঘড়ির দোকানের টাইমই আমার টাইম।

শিবু সেদিন খুবই টলছিল। ধ্রুব বলে, তুমি ঘরে এসে শোও। আমাদের কোনও অসুবিধে নেই।

অসুবিধে আমার আছে। ভদ্রলোকের এক কথা। সোনাকে বলেছি রাত্তিরটুকু শুতে আসব। ব্যস। ফাইনাল। আমি গরিব হতে পারি, মাতাল হতে পারি, আমার রিলেটিভরা সব বড় বড় স্ট্যাটাসের। আমার বোনের কোথায় বিয়ে হয়েছে জানো? বললে ভাববে মিথ্যে কথা বলছি। নেশা হয়ে গেছে আমার।

এই শালা, ভাগ তো এখান থেকে। তখন থেকে বাওয়ালি করছিস। কে যেন ধাক্কা মেরে তাড়িয়েছিল শিবুকে। ধ্রুবর ইচ্ছে আছে শিবুকে নিয়ে একদিন আলাদা একটু বসবে। মন দিয়ে শুনবে ওর ভেঙে যাওয়ার উপাখ্যান। সে কাহিনী নিশ্চয়ই ধ্রুবর জীবনের থেকেও করুণ। বাবা বলতেন, যখনই খুব হতাশ হয়ে পড়বে, আগে খুঁজবে তোমার থেকেও খারাপ অবস্থায় কে আছে। তার কথা মন দিয়ে শুনলে, আপনা থেকে সামলে যাবে তুমি।

দেওয়ালে একটা পুরনো ক্যালেন্ডারের সামনে দাঁড়িয়ে যায় ধ্রুব। অভয়মুদ্রা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বিষ্ণু। ক্যালেন্ডারের পেছনে একটা তাক।

ক্যালেন্ডার সরিয়ে একটু খুঁজতেই পাওয়া গেল বহুদিন আগের একটা ডেটলের শিশি। এখনও তলানি পড়ে আছে। খুব একটা ভরসা হল না ধ্রুবর। শিশিটা যেন ওদেরই ফ্যাক্টরির পরিত্যক্ত হাসপাতালের। রুগির শুশ্রূষা করবে কী, নিজেই মুমূর্ষু!

ধ্রুবকে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে দেখে দেবা বলল, বললাম পাবে না। ছেড়ে দাও। আমরা চুন লাগিয়ে দিচ্ছি। তুমি বলো রিসর্টে কবে চমকাতে যাবে?

মেঝেয় এসে বসে ধ্রুব। বাচ্চু খৈনির ডিবে থেকে চুন বার করে কানাইয়ের গালে লাগিয়ে দিচ্ছে। আঃ উঃ কিছুই করে না কানাই। চোলাই বোধহয় কাজ শুরু

করে দিয়েছে। এরা সবাই এখন ভরপেট নেশা করবে। দুটো বাড়ি পরেই চোলাই মদ তৈরি হয়। ফুচারা বলে কুটির শিল্প। ধ্রুব খায় না। খেলে মাথা যদি কাজ না করে! নেশাগ্রস্ত মাথায় ছেলেগুলো কিন্তু ধ্রুবর প্রতিটি নির্দেশ, প্ল্যানিং মনে রাখে। এসব প্রতিভাধর যুবক দেশের প্রতিরক্ষার জন্য অ্যাসেট হতে পারত। ভেবে নিজের মনেই হেসে ফেলে ধ্রুব। ফুচা বলে, কী হল গুরু হাসছ কেন?

কথা ঘুরিয়ে ধ্রুব বলে, ওদের মাইরি সেকেন্ড পেটোটা ফাটল না। খাটিয়ায় দোল খাচ্ছে। হেভি লস।

লস ওরা জেনেবুঝেই করেছে। তেমন বুঝলে, বোতল বোম মারত। ফুচার ইঙ্গিত ধরতে না পেরে ধ্রুব বলে, মানে?

এটাই ভোলা পালের স্টাইল। যখনই কোনও দাদা উঠে আসে এলাকায়, ভোলা পাল নিজের পাওয়ারটা দেখিয়ে রাখে। আজ সেই জন্যই ওরা তোমাকে খুঁজছিল। তুলে নিয়ে যেত ভোলা পালের কাছে।

একটুর জন্য রোমহর্ষক কাহিনীর নায়ক না হতে পারার আক্ষেপে ধ্রুব জানতে চায়, তারপর?

তারপর আর কী, ভোলা পালের সামনে যদি তুমি তেরিয়া হয়ে থাকতে, কেলিয়ে নরম করে নিত। আর প্রথম থেকেই সারেন্ডার হয়ে গেলে, মালফাল আসত। গেলাস বদলাবদলি, হাহাহিহি, দোস্তি। ভোলা পাল নিজের ছোটামোটা অ্যাসাইনমেন্ট তোমাকে ছেড়ে দিত।

ইস, এসব তুই আমায় আগে বলবি তো। খামোকা পালিয়ে এলাম। ধ্রুবর গলায় হতাশা ও আক্ষেপ একসঙ্গে।

পালিয়ে এসে ভালই হয়েছে। সোনাদাও পালিয়েছিল। তারপর পার্টির কাছে শেল্টার নেয়, পার্টির শেল্টার অনেক সেফ। স্বাধীনভাবে কাজ করা যায়। ভোলার খপ্পরে পড়লে, পালতু কুত্তার মতো কাজ করাবে। তা ছাড়া দরকারই বা কী, আমাদের পেছনে সোনাদা, সুদর্শন ঘোষাল আছে।

সোনার নাম উঠতে, ধ্রুবর মনে পড়ে, ফোন করার কথা। আজকের অপারেশনের ডিটেল সোনাকে দিতে হবে। সেল ফোন দেবে বলেও, পরে ক্যানসেল করেছে সোনা। বলেছে, দরকার নেই। এই শালা মোবাইল ফোনের জালে রাঘব বোয়ালরা পর্যন্ত আটকে যাচ্ছে! তুমি আমাকে পাবলিক বুথ থেকে ফোন কোরো।

দুটো নম্বার দিয়েছে সোনা। একটা ওর নিজের বাড়ির। অন্যটা সেই বউটার।

প্রথমে বউটার বাড়িতেই ফোন করে ধ্রুব। ঘুম ভাঙা গলায় বউটি কোনওদিন বলে, ও তো নেই। কখনও বা, আছে, ডেকে দিচ্ছি। প্রতিবারই কিন্তু একটা কথা বলতে ভোলে না বউটা, আপনি ভাল আছেন ধ্রুববাবু?

কুশল নেওয়ার আপাত সরল কথাটা ধ্রুবর কানে দার্শনিক প্রশ্ন হয়ে ঢোকে। মেয়েটি যেন খেয়াল করিয়ে দিচ্ছে, বেঁচে থাকার একমাত্র শর্ত, ভাল থাকা। মেয়েটাও কি ভাল আছে?

অ্যাই, অনেক ভ্যাজারাং হয়েছে। রিসর্টের ব্যাপারে কী করবে ঠিক করো।

দেবার চিৎকারে ভাবনায় ছেদ পড়ে ধ্রুবর। দেখে, ছেলেগুলো নিজেদের মধ্যে আড্ডায় ব্যস্ত। অথচ সামনেই একটা বড় কাজ। মজিদপুরের শেষ সীমায় একটা রিসর্ট তৈরি হচ্ছে। গঙ্গার পাড়ে। সোনা বলেছে, কমপ্লিট হওয়ার মুখে গিয়ে ডিমান্ড কোরো। নইলে পাখি পালিয়ে যাবে। ডিমান্ডটা ভাল অ্যামাউন্টের রেখো। মালটার পয়সা আছে। জান পহেচানও আছে মন্ত্রী, পুলিশটুলিশদের সঙ্গে। একবার বিল্ডিং গেঁথে ফেলেছে যখন, সহজে উড়বে না। আমাদের খুশি করে ওকে চলতেই হবে। এখন তুমি ভাবো, মুরগিটা তুমি একবারে কাটবে, নাকি ধীরে ধীরে। তবে চেনাজানার সোর্সটা মাথায় রেখো।

খুবই জটিল অপারেশন। কেয়ারফুলি হ্যান্ডল করতে হবে। রিসর্টটা এখনও দেখা হয়নি ধ্রুবর। গ্রুপের ছেলেগুলো দেখে এসে বলেছে এখনই নাকি কাজ কারবার শুরু হয়ে গেছে। অথচ এখনও কনস্ট্রাকশনের কাজ শেষ হয়নি। বাবুরা আসছেন মেয়ে নিয়ে, ফুর্তি করে চলে যাচ্ছেন। কানাই বলছিল, দেখো ধ্রুবদা, ক'দিন পর আমাদের এলাকার মেয়েরাও সাপ্লাই হবে।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে চোয়াল শক্ত হয়ে গিয়েছিল ধ্রুবর। শালা কারখানার পর কারখানা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে, হারামিরা এসেছে এখানে রিসর্ট বানাতে! — আবার মাথাটা গরম হতে শুরু করে ধ্রুবর। ছেলেগুলোকে আলোচনার জন্য ডেকে নেয়। ফুচাকে বলে, তুই আর কানাই মিলে আর একবার জায়গাটা মেপে আয়। মালিক কবে আসে না আসে সব জেনে আসবি। সিকিউরিটি গার্ড যদি থাকে, বুঝে নিবি স্ট্রেংথটা।

বাধ্য ছাত্রের মতো মাথা নাড়ে ফুচারা। কোনও বাইরের লোক হঠাৎ যদি এখানে এসে পড়ে, মনে করবে, ধ্রুব বুঝি নাইট স্কুল খুলেছে।

. সোনার সঙ্গে কথা সেরে ফোন বুথ থেকে বেরিয়ে এল ধ্রুব। রাত প্রায় ন'টা। রাস্তার আলোগুলো কোনওটা জ্বলছে, কোনওটা না। কিছুদূর অন্তর আবছা

অন্ধকার ধ্রুবর চোখে যেন একটু বেশি কালো লাগছে। কিছুক্ষণ আগে ফোনের ওপারে বসে সোনা আতঙ্কটা মনে বুনে দিল। আজকের ঘটনা সব শুনে বলল, ভোলা পাল তোমাকে তোলার চেষ্টা করবেই। একটু সামলে থেকো। তেমন বুঝলে রাত্তিরবেলা বাড়ি ফেরার সময় দু'চারটে ছেলেকে সঙ্গে থাকতে বোলো।

সোনার কথার পিঠে বলতে ইচ্ছে করছিল, তা হলে তুই যে অস্তরটা আমায় দিলি, ওটার কী কাজ! ওটা কি শুধু পড়ে পড়ে ঘুমোবে? কথাটা গিলে নিয়ে ধ্রুব বলে, তুই কবে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসবি বাপ, আমার যে আর ভাল্লাগছে না। দল চালানো কি সোজা ব্যাপার!

সোনা বলল, আসব আসব। ইলেকশানটা যেতে দাও। আমাদের পার্টি মিনিস্ট্রিতে যাবেই। আগে শালা রণজয়টাকে এখান থেকে তাড়াব। সেদিন জানো, মামার অফিসে গিয়ে পর্যন্ত থ্রেট দিয়ে এসেছে। বলেছে, ভাগেকে একটু সামলে রাখবেন। মামাও উত্তর দিয়েছে ভালই, যদি বলেন, আপনার অফিসের সামনে ওকে চব্বিশ ঘণ্টা বসিয়ে রাখতে পারি। তারপরেও যদি মজিদপুরে তোলাবাজি কেস শুনতে পাওয়া যায়, আপনাকে আমি ছেড়ে কথা বলব না। —একটু থেমে সোনা হাসতে হাসতে বলে কেস মাইরি জমে উঠেছে। রণজয়ের থেকেও সাবধানে থেকো। মালটা কিন্তু গরম খেয়ে আছে।

আর কত সাবধানবাণী শোনাবে সোনা! সতর্কবার্তাগুলো যেন এক-একটা জয়মালা। এগুলো অর্জন করতে করতে একসময় প্রকৃতই ডন হয়ে উঠবে ধ্রুব। ভোলা পালের আতঙ্ক মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে ধ্রুব রাস্তায় নেমে আসে। যে কোনও মুহূর্তে আবছা অন্ধকার থেকে চার পাঁচটা অচেনা ছেলে বেরিয়ে আসতে পারে। আসুক।

কিছুদূর এগোতেই অন্ধকার থেকে যে বেরিয়ে এল, তাকেই যেন মনে মনে চাইছিল ধ্রুব। স্বপন! ধ্রুবকে দেখে সাইকেল দাঁড় করিয়েছে, এই তো ধ্রুবদা! ক'দিন ধরে তোমায় খুঁজছি।

স্বপনের সম্ভাষণে ধ্রুব যেন নিজের পুরনো পরিচয়টা খুঁজে পায়, বন্ধ কারখানার দুঃস্থ শ্রমিক। বলে হ্যাঁ, তুই বাড়ি গিয়েছিলি। মেয়ে বলছিল। কী ব্যাপার রে?

শোনো, কারখানা খোলার ব্যাপারটা অনেকটা এগিয়ে গেছে। ডিলফিল মোটামুটি রেডি। মালিকের ছেলে দুবাই থেকে ফিরলেই সাইন হবে। তার আগে সব স্টাফকে নিয়ে বসবে মালিক। তখন কিন্তু আমাদের একমত থাকতে হবে। দলবাজি চলবে না। ল্যাম্পপোস্টের অপ্রতুল আলোয় স্বপনের মুখটা ঠিক পড়তে

পারে না ধ্রুব। চোখ কুঁচকে বলে, দলবাজির কথা উঠছে কেন? আমাদের তো একটাই ইউনিয়ন।

কারণ আছে। ফ্যাক্টরি খোলার আগে অনেক শর্ত আছে, যার সবক'টাই আমি মেনে নিয়েছি। এটা অনেক নেতার পছন্দ নয়। স্বার্থে ঘা লাগছে. শ্রমিকরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকি, সে সব নেতা কিছু করতে পারবে না।

কারখানা খোলার শর্তগুলো কী কী? জানতে চায় ধ্রুব।

এক নম্বর হচ্ছে, সিকিউরিটি প্রাইভেট সেক্টারে দিয়ে দেবে। হাসপাতাল, দমকলও তাই। সাইকেল শেড ভাড়া দেবে। আর বেশ কিছু জমি বিক্রি করবে মালিক, যেগুলো অযথা পড়ে আছে। এর কোনও কিছুই ইউনিয়ন মারফত হবে না, নো দালালি।

এতে খারাপ কিছু তো দেখছি না। বলে ধ্রুব।

আরও আছে। বয়স্ক এবং অদরকারি স্টাফকে ভি আর এস দেবে মালিক। দু'-একটা ডিপার্টমেন্ট তুলে দেওয়ারও কথা হয়েছে। যেমন, ক্যান্টিন রাখবে না। অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের লোক কমিয়ে, কমপিউটার দিয়ে ঢেলে সাজাবে। এই সব জায়গাতেই সুড়সুড়ি মারবে কিছু স্বার্থান্বেষী নেতা। টাকাপয়সা পেলেও যে সব শ্রমিক ফ্যাক্টরিতে কাজ করার অধিকার হারাবে, তারা অবশ্যই ওই সব নেতাদের পক্ষে যাবে। কিন্তু বড় একটা কাজে কিছু ক্ষতি তো স্বীকার করতেই হবে আমাদের। তুমি কী বলো?

এ আর বলাবলির কী আছে। যে নেতা বেশি বেগড়বাই করছে, বল তো ঝেড়ে দিই।

ধ্রুবর কথায় রীতিমতো হোঁচট খায় স্বপন। বলে, এ কী গো ধ্রুবদা, তুমি তো একদম মস্তানদের মতো কথা বলছ।

বাঁ পকেটে হাত বোলাতে বোলাতে ধ্রুব লজ্জা পাওয়ার ভান করে। স্বপন বলে, শোনো, তোমার সঙ্গে যে যে স্টাফের দেখা হবে, আমার কথাগুলো বোলো। এ কথাও বোলো, যারা এই সাত বছরের মধ্যে অটোমেটিকালি রিটায়ার করে গেছে, তাদের টাকা মিটিয়ে দেবে মালিক। ভি আর এস-এর টাকা পেতেও দেরি হবে না। যারা জয়েন করবে, তারা কিন্তু লকআউটকালীন কোনও টাকা পাচ্ছে না। সব ভুলে যেতে হবে। এসব মেনে নিলে তবেই ফ্যাক্টরি খুলবে।

একসঙ্গে অনেক কথা বলে, দম নিচ্ছে স্বপন। ধ্রুবও কিছুটা বিষাদগ্রস্থ। ফ্যাক্টরি শেষমেশ যদি খোলেও, অনেক সহকর্মী আর থাকবে না। ধ্রুব নিশ্চয়ই থাকবে। কোয়ালিটি ডিপার্টমেন্ট উঠতেই পারে না। যাদের কাজ থাকবে না, কোন মুখে

তাদের সামনে ঘুরে বেড়াবে ধ্রুব! পরক্ষণেই ভাবে, এত তাড়াতাড়ি এসব চিন্তা করার কোনও মানে হয় না। ধ্রুবর কাঁধে হাত রেখে স্বপন বলে, মন খারাপ করছ কেন? কেউ তো ডিপ্রাইভড় হচ্ছে না। কাজ গেলেও টাকা পেয়ে যাচ্ছে। এখানে সেন্টিমেন্টাল হয়ে লাভ নেই। এই শর্ত মেনে না নিলে তো কিছুই পাব না।

গভীর আশঙ্কায় ধ্রুব বলে, হ্যাঁ রে, এত কিছু ভাবছি, সেবারের মতো হবে না তো? মাসখানেকের জন্য খুলে, কিছু অ্যাসেট বিক্রি করে, আবার বন্ধ করে দেবে না তো মালিক।

না, সে চান্স নেই। ভাল ল'ইয়ার দিয়ে ডিল করানো হচ্ছে। মালিকের প্রত্যেকটা কমিটমেন্ট যাচাই করে দেখছে তারা। চিফ মিনিস্টার পর্যন্ত এ ব্যাপারে ওয়েল কনসার্নড।

কিছুটা যেন আশ্বাস পায় ধ্রুব। বলে, ঠিক আছে, লড়ে যা। যখনই আমাকে দরকার পড়বে, ডাকবি। সামনে কোনও মিটিং আছে নাকি?

হ্যাঁ, আঠাশ তারিখে। ফ্যাক্টরি গেটে সকাল ন'টায় অবশ্যই চলে এসো। মিটিং-এ হামলা হওয়ারও চান্স আছে। সবাইকে আসতে বোলো। ওই দিনই সবাইকে গোটা ব্যাপারটা খুলে বলব। চলি।

সাইকেলে উঠে পড়ে স্বপন। ধ্রুব বলে, সাবধানে যাস। আঠাশ তারিখ যাচ্ছি। স্বপন হাত নেড়ে এগিয়ে যায়। ধ্রুব অবাক হয়ে ভাবে, একটু আগে সে নিজের সাবধানতা নিয়ে ভাবছিল, এখন স্বপনকে সাবধান হতে বলছে! কারখানা খোলার সম্ভাবনা কাছাকাছি চলে আসছে দেখে, এত নিরাপত্তা পেয়ে গেল! সত্যিই তো রজার ফ্যাক্টরির কাছে ভোলা পালের পাওয়ার তো নস্যি।

বাড়ি ঢোকার আগে চোখ যায় পুতুলদের বারান্দায়। আবছা অন্ধকারে কে যেন বসে আছে। এত রাত্তিরে কেউ তো বসে না ওখানে! একটু এগোতেই অবয়বটা চিনতে পারে, অঘোরকাকা। উঠোন পেরিয়ে সামনে যায় ধ্রুব— এত রাত্তিরে এখানে বসে আছো কেন?

পুতুল এখনও ফেরেনি। নিরাসক্তভাবে উত্তর দেয় অঘোরকাকা। কিন্তু এত রাতে, অন্ধকারে নিঃসহায় বাবা, তার সোমত্ত মেয়ের অপেক্ষায় বসে আছে, দৃশ্যটাই তো যথেষ্ট উদ্বেগজনক। দুশ্চিন্তা হতে শুরু করে ধ্রুবর। এমনিতে পুতুলের ডিউটির কোনও ঠিক নেই। তবে এত রাত কখনও করে না। ধ্রুব জানতে চায়, দেরি হবে, বলেছিল কিছু?

আমাকে আজকাল আর কিছু বলে না। ওর সময় অসময়ের ডিউটিটা বন্ধ

করার জন্যই দোকানটা দেব ভেবেছিলাম। বাড়ির পেছনের এককাঠা বিক্রি করার কথা পাকা হয়ে গিয়েছিল। তুই এসে ভেস্তে দিলি।

পুতুলের দেরি হওয়ার দায়টা ধ্রুবর কাঁধেই চাপিয়ে দিচ্ছে অঘোরকাকা। দুশ্চিন্তার ঘোরে মানুষ এমনটাই করে। গায়ে না মেখে ধ্রুব বলে, চিন্তা কোরো না, এসে যাবে। বাচ্চা মেয়ে তো নয়। —এরপর অন্য প্রসঙ্গে যায় ধ্রুব, একটু আগে স্বপনের সঙ্গে দেখা হল। ফ্যাক্টরি এবার খুলবেই, তবে কিছু স্টাফকে বোধহয় ভি আর এস নিতে হবে।

হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে অঘোরকাকা, দিক তাই অন্তত দিক। মরার আগে যেন দেখে যেতে পারি, বউমেয়ে পুরোপুরি ভেসে যায়নি। রোদবৃষ্টি শরীর খারাপ তোয়াক্কা না করে, দিনের পর দিন ফ্যাক্টরিতে গেছি। তার বদলে খালি হাতে তাড়িয়ে দিল। ওদিকে সরকারি অফিসগুলোয় দেখ, মাসের পর মাস কাজ না করে মাইনে পেয়ে যাচ্ছে স্টাফেরা। বউ-বাচ্চারা গায়ে হাওয়া দিয়ে বেড়াচ্ছে। আমরা যে বেঁচে আছি, কারুর কোনও খেয়াল নেই। নিত্যনতুন টিভি, ফ্রিজ, মোটর সাইকেল বেরোচ্ছে, বিক্রিও হয়ে যাচ্ছে।

ওদেরও অবস্থা খুব একটা ভাল নেই কাকা। স্টাফেদের মাইনে দিতে গিয়ে সরকারও দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে।

হবে না! নদী শুকোলে কি পুকুর বাঁচে? কোম্পানিগুলো যখন বিদেশে টাকা সরিয়ে রাখছিল, খেয়াল পড়েনি সরকারের? এখন জল শুকিয়ে গিয়ে খাবি খাচ্ছে।

অঘোরকাকার মুখে এই কথাগুলো খাপ খায় না। আবার একথাও ঠিক, বন্ধ কারখানার শ্রমিকরা অটোমেটিক অর্থনীতিবিদ হয়ে ওঠে। দেহাত থেকে আসা কোনও লেবারের মুখেও শোনা যায়, র' মেটেরিয়াল, সাইফোনিং, রিজার্ভ ফান্ড টাইপের কোট টাই প্যান্ট পরা ইংরেজি শব্দ। ভাবতে ভাবতেই দেখা গেল, আমগাছতলা দিয়ে হেঁটে আসছে পুতুল। নিশ্চিন্ত হয় ধ্রুব। বারান্দা থেকে নেমে দাঁড়িয়ে অঘোরকাকা পুতুলকে বলে, আজ এত দেরি হল!

কেন, তোমাদের বুঝি চিন্তায় ঘুম হচ্ছিল না। ঝাঁঝ দেখিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল পুতুল। ওর সাজপোশাক আজ যেন একটু কড়া লাগল ধ্রুবর চোখে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ধমক দেয় ধ্রুব। খামাকো কু গাইছ কেন?

রাতে খেতে বসে বারবার চোখ চলে যাচ্ছিল মেয়ের ওপর। আইরিন আজ যেন একটু গম্ভীর। মায়া হচ্ছিল মেয়েটার জন্য, আহা বেচারি জেদ করে বাপের কাছে পড়ে আছে। কোনওদিন হয়তো ওকেও পুতুলের মতো রাত করে বাড়ি

ফিরতে হবে। তার থেকে যাক না মায়ের কাছে চলে। পুতুল বলছিল, ও নাকি লুকিয়ে লুকিয়ে শ্রীতমাকে ফোন করে। এতে লুকোনোর কী আছে। ধ্রুব ঠিক করে, এখনই মেয়েকে বলবে, তোর যদি ইচ্ছে করে, ক'দিন মায়ের কাছে গিয়ে থাক। এখানে অভাবী মুখগুলোর সঙ্গে থেকে থেকে তোর মুখেও গ্রহণ লেগেছে। কলকাতায় কত হাসিখুশি মানুষজন। ফাংশান, সিনেমা, নাটক...।

বলা হয় না। হাতে বাটি নিয়ে মা ঘরে ঢোকে, নারকোলের বড়া করেছি। খেয়ে দেখ কেমন হয়েছে। আমি বাবা, বউমার মতো অত ভাল পারি না।

আমি খাব না। বলল আইরিন।

মা অবাক হয়ে বলে, সে কী রে। তুই ভালবাসিস বলেই তো করলাম।

ইচ্ছে করছে না। বলে এড়িয়ে গেল আইরিন। ধ্রুব, বোঝে এ সব বাবার মন ভোলানোর জন্যই করে আইরিন। বেকার। অর্থহীন। হঠাৎ মনে পড়েছে এভাবে মা বলে, ও, ভুলে গেছি। ধ্রুব তোর খোঁজে একদল ছেলে এসেছিল। সব মোটরবাইক চড়ে।

বিস্ময়ের দৃষ্টি বিনিময় হয় মেয়ের সঙ্গে। আইরিনের চোখে বিস্ময়ের সঙ্গে সন্দেহও ছিল।

পাশের ঘরে মা, আইরিন অনেকক্ষণ হল ঘুমোতে গেছে। ঘুম আসছে না ধ্রুবর। কারা ডাকতে এসেছিল? বাইক নিয়ে কারা আসতে পারে! ভোলা পালের ছেলেরা কি? বাড়ি অব্দি ধাওয়া করছে! নিজের জন্য যতটা না চিন্তা হচ্ছে, মেয়ের নিরাপত্তার কথাটাই ভাবছে বেশি ধ্রুব। সোনার দেওয়া পিস্তলে মাত্র এগারোটা গুলি। ম্যাগাজিনে বারোটার জায়গা আছে, স্প্রিং ভাল কাজ করবে বলে একটা কম। ক'টা ছেলে ছিল, মা ঠিক করে বলে উঠতে পারেনি। —ধুস্, কী সব উলটোপালটা চিন্তা করছি! ভেবে মশারি তুলে নেমে আসে ধ্রুব। পায়ে পায়ে মেয়ের পড়ার টেবিলে যায়। শ্রীতমার অফিসের ঠিকানা বা ফোন নাম্বার নিশ্চয়ই এখানে পাওয়া যাবে। অন্তত একবার শ্রীতমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, আমার কথা কি কখনওই মনে পড়ে না তোমার। খালি মেয়ের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখো। শত্রুর সঙ্গেও কেউ এত কম সম্পর্ক রাখে না। আমি তো ভুলতে পারি না তোমাকে। আজ যখন ডিস্ট্রিক্ট মাঠ দিয়ে আসছিলাম, লাইব্রেরির দিকে তাকাইনি, আমাকে দেখে যদি তুমি মুখ ঘুরিয়ে চলে যাও।

আলো জ্বালে ধ্রুব। জানে, এসব কথা কোনওদিনই সে শ্রীতমাকে বলতে পারবে না। শ্রীতমা বলত, খেলোয়াড় বিয়ে করে ভীষণ ভুল করেছি, তোমার

মধ্যে রোমান্স এত কম, মন রেখে বউয়ের চেহারার কোনওদিন প্রশংসা করলে না। আর বেড়াতে নিয়ে যাওয়া বলতে, সেই একবার পুরী। —ধ্রুব মনে মনে বলে, ফ্যাক্টরিটা খুলে গেলেই তোমায় নিয়ে আসব। আসতে না চাইলে লোভ দেখাব বেড়াতে যাওয়ার। সেবার চিলকায় রাত কাটাইনি আমরা। বিকেলে বোটে করে যেতে যেতে, জলের মধ্যে নির্জন একটা দ্বীপ দেখিয়ে তুমি বলেছিল, ওখানে রাত কাটাতে পারলে দারুণ হয়, কী বলো।

সেই দ্বীপটা আজও আমার মাথার মধ্যে ঢুকে আছে। স্বপ্নেই আমি মাঝে মাঝেই ওই দ্বীপে পা রাখি। নাকে এসে লাগে বনজ গন্ধ। মৃদু নোনা বাতাস। দ্বীপটাকে তোমার নির্জনতম নাভি বলেই ভ্রম হয়।

আবোলতাবোল ভাবতে ভাবতে হাতে একটা ছোট্ট কাগজ উঠে আসে। কী সব যেন লেখা তাতে। আলোর সামনে নিয়ে যায় ধ্রুব। কাগজে লেখা,

মায়ের সেই শেষ অসুখ, আমার হাত হাতে তুলে নিল
শক্ত করে: আমি সেই প্রথম জানলাম
মায়েদের বংশে কী কড়া পড়া হাত, আর আমারটা কী নরম।

কার লেখা এটা! আইরিনের মায়ের সঙ্গে তো এই মা'টা মিলছে না। এটা কি ওর কল্পনা? নাকি হাতের লেখাটাই ওর নয়। সব কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যায় ধ্রুবর। তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে অন্ধকারে আত্মগোপন করে।

চার্চের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায় ফুচা। পাশে হাঁটতে থাকা কানাই বলল, কী হল, দাঁড়িয়ে পড়লি যে!

ওই দেখ। বলে গঙ্গার পাড়ে হাত তোলে ফুচা। পলি পড়ে পাড় চওড়া হয়ে গেছে, হেঁটে যাচ্ছে এক যুগল। চঁরায় নোঙর করা ভাড়ার নৌকোটাই ওদের গন্তব্য। কানাই বলে, এ আর দেখার কী আছে, এ তো হরবখত দেখছি। একটা টাইমে ওদের কাছেও টাকা তুলেছি।

ধুর, সেটা বলছি না। মেয়েটাকে চিনতে পারছিস?

ঠোঁট উলটে মাথা নাড়ে কানাই। বলে, সালোয়ার-কামিজ পরলে, সব মেয়েকেই আমার সেম লাগে।

ওটা ধ্রুবদার মেয়ে। থমথমে গলায় বলে ফুচা। কানাই চমকে উঠে বলে, সে কী রে! ছেলেটা কে? মেয়েটা তো আজকেই মা কা ভোগ হয়ে যাবে। নৌকোয় উঠছে।

জানি। গাম্ভীর্য দেয় ফুচা।

জানি মানে! চল গিয়ে আটকাই। উদোম কেলাই ছেলেটাকে। বলতে বলতে কানাই এগিয়েই যাচ্ছিল। ফুচা হাত বাড়িয়ে আটকায়। বলে, সেই জমানা আর নেই রে ভাই। মেয়েটাই উলটে আমাদের চাপান দিয়ে দেবে। তা ছাড়া আমি দেখেছি, মেয়েটা বহুত খাড়িয়াল আছে। ছেলেটাকেই বরং ম্যাদামারা লাগছে। ছেড়ে দে। ও মেয়ের সহজে ক্ষতি হবে না। শুধু কথাটা একবার ধ্রুবদার কানে তুলে দিতে হবে। এটা আমাদের ডিউটি।

কানাই কনভিন্সড হয়। বলে, চ' তা হলে আমাদের যে ডিউটি দিয়েছে, করে আসি।

চার্চের পেছনে সদ্য নির্মিত রিসর্ট লক্ষ্য করে হাঁটতে থাকে দু'জনে। ধ্রুবদা তাদের রিসর্টটা মেপে আসতে বলেছে। কাল অথবা পরশু অ্যাকশানে নামা হবে।

নৌকোয় উঠে আসতে গিয়ে একবার টাল খেয়ে গেল কাজল। ছেলেটার পদে পদে ক্যাবলামি। হাত ধরে নৌকোয় তুলে নেয় আইরিন। মাঝিটা যে কোথায় গেল! থেকে থেকে হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। এ-রকমটাই নিয়ম, স্কুলের অভিজ্ঞ বান্ধবীদের থেকে শুনেছে আইরিন। ঘণ্টার হিসেবে নৌকো ভাড়া করে এখানে প্রেম করতে আসে কাপ্‌ল-রা। আইরিনেরও ইচ্ছে হয়েছিল আসার, প্রেমিক পায়নি।

যদিও কাজল তার প্রেমিক কি না, এখনও নির্ধারিত হয়নি। আইরিন্‌ই তাকে প্রস্তাব দেয়, চলুন, আজ ব্যান্ডেল চার্চ, ইমামবাড়া ঘুরে আসি। মজিদপুরের খারাপ দিকটাই তো এত দিন দেখলেন! এখানেও যে সুন্দর একটা জায়গা আছে, জানেন না।

প্রস্তাবটা পছন্দ করেছে কাজল। আইরিনের ইচ্ছে আছে ওকে নিয়ে আর একদিন রেললাইনের ও-পারের গ্রামে যাবে। যেখানে সূর্যমুখীর খেত আছে!

নৌকোর ছইয়ের ভেতরে গিয়ে বসল দু'জনে। তখনই কোথা থেকে মাঝি এসে উদয় হয়। আবার সেই একই কথা জিজ্ঞেস করে, পর্দা ফেলে দেব, দিদি? —এই নিয়ে তিনবার জানতে চাইল। মাঝিটা এটাও ধরে নিয়েছে, এই অভিসার কন্ডাক্ট করছে আইরিন। কখনওই কাজলকে জিজ্ঞেস করছে না। প্রতিবারে মতো

এবারেও আইরিন বলে, না দরকার নেই। মাঝি জানতে চায়, এবার কোথায় যাব?

তোমার যেখানে খুশি। বলে কাজলের দিকে তাকায় আইরিন। একই রকম উচ্ছ্বাসহীন হয়ে বসে আছে। কিছুটা যেন আড়ষ্ট। কাজলকে চার্চ দেখাল, মহসিনের ইমামবাড়া, গঙ্গায় ভ্রমণ, সব কিছুতেই কেমন যেন নিস্পৃহ ভাব। তা হলে কি ভুল জায়গায় নিয়ে আসা হল কাজলকে? চার্চের, সৌধের নির্জনতা কি ওকে গ্রাস করল? গঙ্গাও এখন শেষ বিকেলের বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন। ছেলেটা একটু কবি-স্বভাবের। ওদের ব্যবসার মালিক হলে, নিশ্চয়ই ডোবাবে। মজিদপুরে থাকতে চাওয়ার দ্বিতীয় কারণ হিসেবে সেদিন যে চিরকুটটা দিল, সেটা একটা কবিতা। মানেটা বুঝতে পারেনি আইরিন। কিন্তু পড়ার পর কার জন্য যেন খুব দুঃখ হচ্ছিল! কার জন্য? কবিতার মানেটা আজ জিজ্ঞেস করবে আইরিন।

নৌকো অনেকক্ষণ ছেড়ে দিয়েছে মাঝি। দু'পারের দৃশ্য দোল খাচ্ছে। মিষ্টি একটা হাওয়া বইছে নদীর বুকে। বাতাসে অপূর্ব একটা সন্ধের আভাস। এরকম একটা রোমান্টিক পরিবেশে থম মেরে বসে আছে কাজল। একটাও ন্যাকা ন্যাকা কথা বলছে না। অনেকক্ষণ পর আইরিনই বলে, তুমি যে সেদিন কবিতাটা আমায় দিলে, সেটা কি তোমার লেখা?

আইরিনের মুখে তুমিটা হঠাৎ ছিঁড়ে নেওয়া ফুল, চুলে গোঁজার মতো খাপ খেয়ে গেল। কাজল বুঝতে পারে, মেয়েটা সত্যিই তার বন্ধু হয়ে উঠেছে। আইরিনের ভুল ভাঙিয়ে দিয়ে কাজল বলে, না, ওটা আমার লেখা নয়। আমেরিকার বিশিষ্ট কবি চার্লস রেজনিকফ-এর। অনুবাদ করলে ওরকম দাঁড়ায়। আশ্চর্য মিল আমার বোধের সঙ্গে।

কিন্তু কবিতাটার মানে কী?

বলছি। বলে ছইয়ের মধ্য দিয়ে আকাশ দেখে কাজল। সদ্য কর্ষিত জমির মতো মেঘ, লালচে আভা ধরেছে সে মাটিতে। কাজল বলে ওঠে, আমার মা ছিল...

দ্বিধাহীন স্পষ্ট উচ্চারণে কাজল বলে যায় তার জন্ম বিবরণের কথা। হীনম্মন্যতার বদলে যা কখনও কখনও অহংকারের মতো শোনায়। কিছুই বাদ দেয় না সে। পরিবারের বড়রা কিছু না বললেও, ঈশানীদি বলেছিল সব। বন্ধুর মতো ছিল ঈশানীদি। কাজলের কাকুতি-মিনতি উপেক্ষা করতে পারেনি। তখন ঈশানীদির বয়স ও বুদ্ধি কোনওটাই পরিণত ছিল না। এখন হলে হয়তো চেপেই যেত। কাজলের দিদিমা বাবাদের বাড়ির কাজের লোক ছিল। মা কখনওসখনও আসত সাহায্য করতে। খুবই রূপসী ছিল মা। বাবার দুর্বলতায় সহজেই

আত্মসমর্পণ করে। বিয়ের আগেই পেটে আসে কাজল। গুরুজনরা টাকা দিয়ে চাপা দিতে চেয়েছিল উত্তরপুরুষের পদস্খলন। বাবা-ই হতে দেয়নি। বিয়ে করে মাকে। কিন্তু পরিবার পরিজনের কটূক্তিতে বেশিদিন এখানে টিঁকতে পারে না। কাজল জন্মানোর কয়েক মাস পর কলকাতায় চলে যায়। আত্মীয়দের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখেনি বাবা। কাজল আজও জানতে পারেনি তার মামার বাড়ি কোথায়। সেখানেও তো অর্ধেক শিকড় গাঁথা আছে কাজলের। মজিদপুরে এসেছিল তার সন্ধানেই। —জল, আকাশের দিকে তাকিয়েই কাজল বলে যাচ্ছিল। বলা শেষ হতে মনে হল গঙ্গার ঘোলাটে জল এখন অনেক স্বচ্ছ. আকাশও মেঘহীন। আইরিনের মুখের দিকে না তাকালেও কাজল জানে, স্বপ্ন ভেঙে খানখান হয়ে পড়েছে সেখানে। পরম মমতায় ভাঙা পুতুলের দিকে তাকায় কাজল। অবাক হয় আইরিনের বিস্রস্ত বসে থাকা দেখে। ওড়না খসে পড়েছে কোলে, চোখে অস্পৃশ্যের প্রতি করুণার বদলে অদ্ভুত এক ঘোর। নিশ্চিত হওয়ার জন্য কাজল বলে ওঠে, খুব খারাপ লাগল না, এ সব শুনতে?

অপলক চেয়ে আছে আইরিন। নৌকোটা দুলছে, কিন্তু এগোচ্ছে না। যেন আইরিনের উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। ছইয়ের বাঁদিকে বাইরেটায় তাকায় কাজল। ছোট্ট একটা চড়ায় নোঙর করা হয়েছে নৌকোটা। মাঝি আবার উধাও। নিষ্পত্র দ্বীপে পদচারণ করছে দু'-তিনটে পাখি। মাঝে মধ্যে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে সূর্য ডুবতে আর কত বাকি।

আইরিন পড়েছে মহা মুশকিলে, কিছুতেই মনের ভাষা অনুবাদ করতে পারছে না। ও কী করে বোঝাবে, চার্চ, মহম্মদ মহসিনের মাজার, গঙ্গা— এই তিন ধর্মের সাক্ষী রেখে কাজলকে ভালবাসার সঙ্গী করেছে আজ। কাজলের ছোটবেলার গল্প আইরিনের কাছে রূপকথার মতোই পবিত্র। —ঠোঁটের কাছে জমা হওয়া ভাষা বলতে না পেরে, কাজলের হাতটাই তুলে নেয়। হাতের পিঠে ঠোঁট রাখতেই, লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে গঙ্গা। সূর্যও টুপ করে ডুবে যায়।

তড়িঘড়িতে ফেলে যাওয়া সূর্যের রাঙা আলোয় নির্জন চর ভারী মোহময়। সেই ক্যানভাসে চিত্রিত হতে থাকে এক ঝিয়ের ছেলের সঙ্গে বন্ধ কারখানার শ্রমিকের মেয়ের প্রেম।

ডালহৌসি থেকে গাড়িতে মাত্র আধঘণ্টার মধ্যেই কলকাতার এরকম একটা ফাঁকা জায়গায় চলে আসা যায়, ধারণা ছিল না আইরিনের। ইস্টার্ন বাইপাস ছেড়ে গাড়িটা যেখানে এসে দাঁড়াল, সত্যিই স্বপ্নের বসত। চারপাশে মাঠ, ক্ষেত জমি, জলা, তেপান্তর। তার মাঝেই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ড্রিমল্যান্ড হাউসিং কমপ্লেক্স। কুড়িটা ছ'তলা বাড়ি নিয়ে কমপ্লেক্সটা। পার্ক, দোকানপাট সব ঝুলনের মতো সাজানো। পার্কের গা দিয়ে যে লাল রঙের রাস্তা ধরে মায়ের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছে আইরিন, কাঠের গুড়ো রং করে বাবার করে দেওয়া ঝুলনের রাস্তা মনে হচ্ছে এটা।

এখানকারই একটা ছ'তলা বাড়িতে মায়ের ফ্ল্যাট। এখনও অবশ্য হ্যান্ড ওভার করেনি, কিছু কাজ বাকি আছে।

হঠাৎই আজ মায়ের নতুন অফিসে চলে এসেছিল আইরিন। অনেকদিন হল ফোনে কথা হয়নি। মাও অপেক্ষা করছে, কলকাতায় থাকার ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নিল আইরিন। কোনও সিদ্ধান্তই নিতে পারেনি সে। কিন্তু কেন কী জানি মাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছিল। ইচ্ছেটা সেই ছোটবেলার মতন, যখনই কিছু দেখে আনন্দ বা সুখ হত, মায়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়াত সে। হয়তো ঠাম্মা নতুন জামা এনে দিয়েছে বা নাচের অনুষ্ঠানের পর কেউ এসে খুব প্রশংসা করল, লজ্জায় আরক্ত আইরিন ছুটে যেত মায়ের আঁচল জড়াতে। অনেকটা মুদ্রাদোষের মতো। মা বলত, কী হয়েছে রে! আইরিন মাথা নাড়লেও, ঠিক ধরতে পারত মা। বলত, নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে।

সেরকমই একটা লাজুক উচ্ছ্বাস নিয়ে আইরিন মায়ের কাছে এসেছিল আজ। কাজলের সঙ্গে তার রিলেশনটা নিশ্চিত পরিণতির দিকে এগোচ্ছে। কাজলকেই আগামী জীবনের সঙ্গী করবে সে। এই খবরটা সব থেকে আগে মাকেই জানাতে ইচ্ছে হয়েছিল আইরিনের। প্রথমেই হয়তো কিছু বলতে পারত না। আনন্দ চেপে রাখা মুখ দেখে, মা নিজেই বলত, কী ব্যাপার রে আইরিন! তোকে আজ কেমন...

না। আইরিন নিজের অভিব্যক্তিটা মায়ের অফিসে গিয়ে ধরে রাখতে পারেনি। রিসেপশনে মায়ের নাম আর নিজের পরিচয় দিতে, রিসেপশনিস্ট সসম্ভ্রম আইরিনকে ভেতরে নিয়ে যায়। এই বাড়তি খাতিরটা মায়ের আগের কোনও অফিসে পায়নি আইরিন। মায়ের পোস্ট কি এখানে খুব উঁচু? ভেতরে গিয়ে দেখে, সেরকম তো কিছু নয়, অন্যান্যদের মতো মা-ও একটা কিউবিকল-এ বসে কাজ করছে। আইরিনকে দেখে খুবই খুশি হল মা। বলল, চল, তোকে নতুন ফ্ল্যাটটা দেখিয়ে আনি।

এখনই! এটা তো ডিউটি আওয়ার্স। তোমার বস বকবে না?

কিচ্ছু বলবে না। চল তো। বলে আইরিনকে নিয়ে সম্ভবত বসের চেম্বারেই ঢুকেছিল মা। সেখানেও একটা মস্ত হোঁচট খায় আইরিন। চেম্বারে ঢুকে সুবেশ মানুষটিকে মা বলে. রঞ্জন, এই হচ্ছে আমার মেয়ে, আইরিন।

প্রথমে ভ্যাবাচাকা খেয়ে লোকটা উঠে দাঁড়ায়। অস্ফুটে বলে, হ্যালো!

ইংলিশ মিডিয়ামের বন্ধুদের থেকে শেখা বিশেষ কায়দার হাই'টা বলতে যাবে আইরিন, তার আগেই রঞ্জনবাবু বলেন, প্লিজ বি সিটেড।

মা বলে, না, এখন আমরা বসছি না। তোমার গাড়িটা নিয়ে একটু বেরোচ্ছি। ওকে ফ্ল্যাটটা দেখিয়ে আনি।

তক্ষুনি রাজি হয়ে যান রঞ্জনবাবু। বলেন, নো প্রবলেম। তেমন বুঝলে মেয়েকে নিয়ে আরও একটু ঘুরতে পারো।

নো, থ্যাঙ্কস। তবে আজ আর অফিসে ফিরছি না। বলে, মা স্মার্টলি 'বাই' করল। বিদায় জানাতে গিয়ে আইরিন দেখে, সে রঞ্জনবাবুর চাউনিতে প্রাথমিক বিস্ময় সরে করুণা ঘন হয়েছে।

গাড়িতে বসে আইরিন লক্ষ করে, মা আগের তুলনায় অনেক বেশি প্রগলভ। কথায় কথায় হাসছে। অতি উৎসাহ! ব্যাপারটা কী? কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে আইরিন জিজ্ঞেস করে, মা, রঞ্জনবাবু কি তোমার পূর্ব পরিচিত?

না রে। এখানে এসেই বন্ধুত্ব হয়েছে। বলে জানলার বাইরে তাকিয়ে ছিল মা। আইরিন আর কিছু জিজ্ঞেস করতে ভরসা পায়নি। শুনতে না চাওয়া কথাগুলো মা যদি হঠাৎ বলে বসে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে হয় আইরিনের, আমিই বা খারাপ কিছু ভাবছি কেন? হতেই তো পারে রঞ্জনবাবু মায়ের ভাল বন্ধু। অনেকদিন পর ফ্রেন্ডলি বস পেয়েছে মা। তাই হয়তো প্রাণখোলা লাগছে।

ভাবতে ভাবতে কখন যেন সিঁড়ি বেয়ে চারতলার ঘরে চলে এসেছে আইরিন। জানলাগুলো একে একে খুলে দিচ্ছে মা। প্রকৃতির নরম স্পটলাইট ঘরে এসে পড়ছে। ড্রয়িং রুমটাই কী বিশাল! ভীষণ আনন্দ হচ্ছে আইরিনের। এটা তার মায়ের বাড়ি। অর্থাৎ তার বাড়ি। আলোর দিকে পিঠ করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে মা।

বলছে, কেমন, ফ্ল্যাটটা? পছন্দ হয়েছে তোর?

উত্তরে কাঁধের ব্যাগ ছুঁড়ে ফেলে আইরিন। মাঝঘরে ঘুরে ঘুরে ভরতনাট্যমের জ্যোতিস্বরম শুরু করে দেয়। মা মুখ চাপা দিয়ে খিলখিল করে হাসছে। অলপদ্মম্, কটকমুখম্ নানান মুদ্রা সেরে, মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে আইরিন। জানলার বাইরে ঘাট, মাঠ, বিলও যেন হাসছে।

হাসির যুগলবন্দি শেষ হলে, আইরিন বলে, এই ঘরটায় কিন্তু আমি থাকব। মেঝেতে গদি পেতে শোব আর যখন ইচ্ছে নাচ প্র্যাকটিস। পাশের ঘরে তুমি আর বাবা। —বলার সঙ্গে সঙ্গেই আইরিন লক্ষ করে মায়ের মুখে মেঘের ছায়া। মা বলে, তোর বাবার এখানে থাকা চলবে না।

কেন? বিস্ময়ের সঙ্গে জানতে চায় আইরিন।

আমি খুব শিগগিরি ডিভোর্স ফাইল করছি। আই হ্যাভ ডিসাইডেড।

ফর হোয়াই? কী হল হঠাৎ! বিরক্তি আর হতাশায় বলে ওঠে আইরিন। মা বলে, এতদিন আলাদা থেকে আমি একটা জিনিস বুঝেছি, জীবনটা ইচ্ছে করলেই অনেক বড় করা যায়। মজিদপুরে থাকতে মনটা বড্ড আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। নিত্যদিনের অভাব, অভিযোগ, অবিশ্বাসের জালে ক্রমশ ফুরিয়ে যাচ্ছিলাম আমি। আমারও যে একটা স্বাভাবিক সুস্থ জীবনের অধিকার আছে, ভুলেই গিয়েছিলাম। এখন আর তোর বাবার ওপর কোনও অভিযোগ নেই আমার। শুধু একটাই প্রার্থনা, অনেকদিন মেয়ে ছাড়া রেখেছ আমায়। এবার অন্তত দাও। আমি ঠিক করেছি...

আরও কী কী সব বলে যাচ্ছে মা। কিছুই মাথায় ঢুকছে না আইরিনের। কিছুক্ষণ আগে এই ফ্ল্যাটটাকে তার ভাল বাসা মনে হচ্ছিল, এখন এটাকেই খারাপ বাসা লাগছে! সে কল্পনা করেছিল, মজিদপুরের গুমসানো, ক্লেদাক্ত দিনগুলো ছেড়ে, এখানে এসে অনেকদিন পর আলো বাতাসের জীবন পাবে বাবা। অন্যান্য সুখী মানুষের মতো ধবধবে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে পাড়ার দোকান বাজারে যাবে। খুনসুটি করবে মায়ের সঙ্গে। আইরিনকে প্রশ্রয় দেবে। কাজল আসবে এ বাড়িতে। এই ড্রয়িং রুমে বসেই চুটিয়ে আড্ডা দেবে বাবা, আইরিন, কাজল! মা শাসনের ভান করে, চোখের ইশারায় জানতে চাইবে, কাজল কখন উঠবে? শান্তশিষ্ট ঠাম্মাকে ভোলেনি আইরিন, তাকেও এনে রাখত। কিন্তু এসব কিছুই হওয়ার নয়। আইরিনের এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যেতে ইচ্ছে করছে। উপায় নেই। এক তো হচ্ছে, ঠাম্মাকে বলে এসেছে, মায়ের কাছে যাচ্ছি। কাল সকালে ফিরব।

আচমকা মায়ের সঙ্গে একটা রাত থাকার কথা শুনে ঠাম্মা গভীর আশঙ্কায় জানতে চায়, তোর বাবা জানে?

জানে না। বাড়ি ফিরলে বলে দিয়ো। আইরিনের বলার ভঙ্গিতে প্রচ্ছন্ন দম্ভ ছিল। এখন ফিরে গেলে, ব্যাপারটা ভীষণ খেলো দেখাবে। তা ছাড়া কাজলকে বলা আছে, কাল হাওড়া থেকে সকাল ছ'টার লোকালটা ধরবে। আজ কাজলের সঙ্গেই কলকাতায় এসেছে আইরিন। কাজল গেছে ওদের অফিসে। সকালে

হাওড়া স্টেশনে আইরিনকে না পেলে চিন্তা করবে।

জানলার বাইরে বিলের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বক। ডানা নাড়িয়ে আইরিনকে নিখুঁত হ্যান্ডওয়েভিং শেখাচ্ছে। আইরিনের মন নেই সেদিকে। বড্ড তাড়াতাড়ি ভেঙে গেল স্বপ্নের বাসা।

মা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, তুই এখানে থাকতে রাজি না হলে, রঞ্জনকে ঠেকানো মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। ও আমাকে বিয়ে করতে চায়।

অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকায় আইরিন। মুখটা তো অচেনা লাগেই, এমন কী গন্ধটাও। এতটুকু মা মা ভাব নেই!

পুব আকাশে পাউডারের পাফের মতো এক খণ্ড মেঘ। তাতে লেগে আছে বিকেল চারটের রোদের সোহাগ। একটা রুপোলি প্লেন অলস আয়েসে পার হচ্ছে মেঘের সীমানা। হয়তো ওই প্লেনটার টায়ার ধ্রুবদের ফ্যাক্টরিতেই তৈরি। এক সময় রজার কোম্পানিই শুধু এরোটায়ার বানাত। প্লেন উড়ে যাচ্ছে দূর কোনও সম্পদশালী দেশে। আর ধ্রুব যাচ্ছে মজিদপুরের শেষ সীমায় নতুন গড়ে ওঠা রিসর্টে তোলা তুলতে!

অজান্তেই মুখে একটা হাসি এসে যায় ধ্রুবর। যদিও এ সময় তার হাসা উচিত নয়। কিছুক্ষণ আগে ফুচা তাকে খুব মোলায়েমভাবে একটা খবর শুনিয়েছে, ধ্রুবদা, তোমাদের বাড়িতে কোনও রিলেটিভ এসেছে?

কেন বল তো!

না, মানে, তোমার মেয়েকে সেদিন দেখলাম চার্চের ঘাটে একটা ছেলের সঙ্গে নৌকোয় উঠছে। তাই ভাবলাম... ভেতরে একটা ঝটকা খেলেও, বাইরে প্রকাশ করে না ধ্রুব। ঠান্ডা গলায় বলে, ছেলেটাকে আগে কখনও দেখেছিস?

না মাইরি। তাই জন্যই তো জিজ্ঞেস করলাম, তোমার আত্মীয় কি না। তা যখন নয়, বলো তো সাঁটিয়ে দিই।

সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয় ধ্রুব। নিরেট আজ্ঞাবহ ছেলেগুলো যথেষ্ট পরিমাণে নিষ্ঠুর। ছেলেটাকে মেরে হাত-পা ভেঙে তবে ছাড়বে। তখন যদি আইরিন জানতে পারে, তার বাবার গ্রুপের ছেলেরা এসব কাণ্ড ঘটিয়েছে, মুখ দেখানো যাবে না। কোনও ছেলের সঙ্গে আইরিনের যদি সেরকম কিছু সম্পর্ক হয়েই থাকে,

আজ না হয় কাল আইরিন তার বাবাকে বলবেই। মেয়ের সঙ্গে তেমনটাই সম্পর্ক ধ্রুবর। ফুচা অর্ডারের অপেক্ষায় ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। ধ্রুব বলে, ছেড়ে দে, আমি মেয়ের সঙ্গে কথা বলে নেব।

তালডাঙা কবরস্থানে এসে পড়েছে ধ্রুবরা। একটা লোক কবরস্থানের পাশের খাল থেকে কলমি তুলছিল। ধ্রুবদের গ্রুপটাকে দেখে সম্ভ্রস্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ায়।

এখান থেকেই রিসর্টটা দেখা যাচ্ছে। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। যমের দক্ষিণ দুয়ারের মতো। বিশাল গেট। ওখান দিয়ে ঢুকে যাবে এলাকার গরিবগুরবো পরিবারের মেয়েরা, বন্ধ কল-কারখানার শ্রমিকের মেয়ে, বউ। তারা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করবে, স্বাস্থ্যই সম্পদ।

এত কিছু ভেবেও নিজেকে মোটিভেট করতে পারছে না ধ্রুব। মনটা কেমন যেন আলগা পড়ে যাচ্ছে। অবশেষে নিজের সেই চূড়ান্ত ব্যর্থতার ঘটনাটার কথা মনে করতে থাকে। সে এক মর্মান্তিক দিন। শ্রীতমার প্রতিটি রোমকূপ থেকে তিল, জরুল চেনা নিরাবরণ শরীর চোরাবালি হয়ে গিয়েছিল।

দীর্ঘ তৃষ্ণার অবসানে ডেকে নিয়েছিল শ্রীতমাই। প্রস্তুতির জন্য সময়ও দিয়েছিল অঢেল। তবুও বারংবার ব্যর্থ হচ্ছিল পৌরুষ। লজ্জায়, গ্লানিতে তলিয়ে যাচ্ছিল ধ্রুব। শ্রীতমাও ভীষণ হতাশ। বিনা দোষে সে চোরাবালি হয়ে গেছে। দাঁড়াতেই পারছে না ধ্রুব। কারখানা বন্ধের কারণে শ্রীতমার সমস্ত সুখ চলে গেলেও, বিশ্বাস ছিল প্রকৃতি প্রদত্ত সুখ কেউ ছিনিয়ে নেয়নি। ধারণা ভ্রান্ত, প্রমাণিত হচ্ছে আজ। সম্প্রতি অতীতে শরীরের যে সব আগ্নেয়গিরি, উপত্যকা চরম আশ্লেষে জড়িয়ে ধরত ধ্রুব, সেদিন সব ক'টার উৎস মুখ খুলে দিয়েছিল শ্রীতমা। তবু না।

অতঃপর আগ্নেয়গিরি উদ্গত লাভা সমেত নিজেই উঠে আসে তুষার শৃঙ্গের ঘুম ভাঙাতে। সে এক বিচিত্র মিথুনক্রিয়া! কোনারকের উলঙ্গ খঞ্জ পুরুষের মতো অসহায় দাঁড়িয়ে থাকে ধ্রুব। হাহাকার করে ওঠে ইতিহাস-প্রাচীন অজ্ঞাত ভাস্করের জীবন্ত নারীমূর্তি। তার বিলাপ ঘুরে বেড়ায় ভগ্ন নির্জন মন্দিরগাত্রে। সেখানে খোদাই করা কারুকাজে আরও সব যৌন জীবন। তারা সবাই প্রায় অবলুপ্তির পথে।

তখন রাত আরও গভীর হয়েছে। ধ্রুব শুনতে পেয়েছিল, এই একই বিলাপ তার সহকর্মীদের বাড়ি থেকে উঠে আসছে। বিলাপের সুর বড্ড একঘেয়ে।

নাঃ, হল না! আজ কিছুতেই ধ্রুবর চোয়াল শক্ত হচ্ছে না। অথচ আজকের কাজটায় গভীর মনোনিবেশ প্রয়োজন। পার্টি খুব জাঁহাবাজ। প্রচুর লিঙ্ক। স্টাইল

অফ অ্যাপ্রোচটাই অন্যরকম করবে, প্ল্যান করে রেখেছে ধ্রুব। সেই মতো নির্দেশও দেওয়া আছে ছেলেদের। আজকের অপারেশনে অভিনয়-দক্ষতা এবং রিফ্লেক্স অ্যাকশানের প্রয়োজন হবে। ক্ষণে ক্ষণে সিচুয়েশন পালটাতে পারে। কোন পরিস্থিতিতে কী করতে হবে, সবই বলা আছে ছেলেদের। ওরা প্রত্যেকেই এক পাউচ করে চুল্লু খেয়ে ভীষণ একাগ্র। ধ্রুবই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে বারবার। খালি মনে পড়ে যাচ্ছে অজ্ঞাতকুলশীল ছেলেটার কথা। কাকে বেছে নিল আইরিন?

তাড়াহুড়ো করেনি তো মেয়েটা! খারাপ কিছু ঘটে গেলে, শ্রীতমার কাছে জবাব দিতে পারবে না ধ্রুব। — এ সব ভাবতে ভাবতে কখন যেন পৌঁছে গেছে রিসর্টের গেটে। নাম দিয়েছে বেড়ে! বিহঙ্গ। ফুচা, কানাইয়ের হোমওয়ার্ক অনুযায়ী এদের সিকিওরিটি বেশ স্ট্রং। হাড্ডাগাড্ডা দুটো গার্ড গেটের পাশে ছোট্ট ঘরে আড্ডা মারছে। ধ্রুবরা গিয়ে দাঁড়াতেই, দু'জন ক্ষিপ্রগতিতে বেরিয়ে এল, ক্যায়া চাহিয়ে আপ লোগো কো?

ধ্রুব বলে, বাবুকে গিয়ে বলো, পাড়ার ছেলেরা দেখা করতে এসেছে।

বাবু তো নেহি হ্যায় ভাই। আপলোগ বাদ মে আইয়ে।

কেন ঝুট বলছ ভাইটি, আমরা খবর নিয়ে তবেই এসেছি। প্রিয়বাবু আজ এসেছেন। যাও লক্ষ্মীটি।

দুই গার্ড মুখ চাওয়াচায়ি করে। ধ্রুবদের দলটাকে ঠিক যাচাই করতে পারছে না। ওদের বুদ্ধিটা আর একটু ঘুলিয়ে দিতে ধ্রুব বলে, তোমরা কি বিবি বাল বাচ্চা সব দেশেই রেখে এসেছ? মন খারাপ করে না?

এই কথাটায় কী বুঝল ওরাই জানে। একজন পায়ে পায়ে পিছু হটতে লাগল। তারপর দৌড় মারল ভেতরের দিকে। ধ্রুবর ছেলেরা কলার তুলে শিস দিচ্ছে। ঠিক যেন হাড়গিলে পাখি। ধ্রুব চারপাশে চোখ বোলায়। গন্ধ খোঁজে বিপদের।

গার্ড ফিরে আসে, যাইয়ে, বাবু আপলোগো কো বুলায়া।

গেট খুলে দেয় গার্ড। ভেতরে ঢুকতেই মনে হয় যেন দুর্গে প্রবেশ করল ধ্রুবরা। শালা গেট বন্ধ করে, পুলিশকে না খবর দেয়! উঁচু পাঁচিলটা কোথায় একটু নিচু হয়েছে খুঁজছিল ধ্রুব। ওপর থেকে কে যেন ডাকে, এই তো, এদিক দিয়ে সিঁড়ি, উঠে আসুন।

নিপাট মধ্যবিত্ত মাঝারি চেহারার একটা লোক দোতলার বারান্দা থেকে ডাকছে। এটাই কি মালিক!

সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায় ধ্রুবরা। বারান্দা থেকে গ্রেজ মেশিনের আওয়াজ আসছে।

টাইলস ফিনিশ হচ্ছে মেঝের। বারান্দায় উঠে আসতেই এক ঝলক গঙ্গার হাওয়া ভেসে আসে। বেশ বড় বারান্দা।

নমস্কার। আপনাদের জন্য কী করতে পারি বলুন।

আপনিই কি প্রিয়নাথবাবু। নিশ্চিত হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করে ধ্রুব।

ইয়েস। আপনি?

নমস্কারটা ফেরত দিয়ে ধ্রুব বলে, আমরা হচ্ছি খ্রিস্টানপাড়ার ছেলে। পাড়ার এক গরিবের মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে আপনার কাছে এসেছিলাম!

কত দিতে হবে?

পঁচিশ হাজার।

মেশিনের আওয়াজের কারণেই বোধহয় ভদ্রলোক নিজের কানকে বিশ্বাস করলেন না। আবার জানতে চাইলেন, কত বললেন?

ওনলি টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড। ইনক্লুডেড অল ট্যাক্সেস। কেটে কেটে উচ্চারণ করল ধ্রুব।

নেহাতই অভ্যেসবশত ভদ্রলোক বুক পকেট থেকে মোবাইল ফোন হাতে নিলেন। ধ্রুব বলে, ওটা এখন পকেটেই থাক। পরে অনেক সময় পাবেন, এদিক ওদিক খোঁজ দেওয়ার।

হতাশ কণ্ঠে প্রিয়বাবু বলেন, এত টাকা আমি কোথায় পাবো!

সেটা আপনার হেডেক। ব্রথেল খুলতে টাকা ঢালতে পেরেছেন। পাড়ার মেয়ের বিয়ে দিতে টাকা নেই!

তোলাবাজদের মুখে ভারী ইংরেজি শুনে ঘাবড়ে গেছেন প্রিয়বাবু। তবুও মেজাজ বজায় রেখে বলেন, কে বলল আপনাকে এটা ব্রথেল? সিম্পলি একটা হেলথ রিসর্ট তৈরি করছি।

ওসব ঘোমটার নীচে খেমটা আমরা ভালই বুঝি। যা চাঁদা বলা হয়েছে, তাড়াতাড়ি ঝাড়ুন। এটা কানাই বলল।

প্রিয়বাবু চুপ করে কী যেন ভাবছেন। মেশিন চলছে। আওয়াজটা বড় বিরক্তিকর। ভাবা শেষ করে প্রিয়বাবু বলেন, এত টাকা আমি দিতে পারব না। হাজার দশেক দেব। তাও মেয়ের বাড়িতে গিয়ে।

এমনটাই আশা করেছিল ধ্রুব। পাত্রী ঠিক করা আছে তার। এমনিতেই শ্রাবণ মাসে দেবার বোনের বিয়ে। দেবা বলেছে, বাড়িতে বোন, বাবা-মাকে ফিট করে রাখবে। ধ্রুব বলে, আপনি মেয়ের বাড়িতে গিয়েই টাকা দেবেন। তবে ওই পঁচিশই লাগবে।

এত জোরাজুরি করলে আমাকে ভাই মাঝখানে ভোলাবাবুকে ডাকতে হবে।

ভোলা পালের নামটা শুনতেই মাথায় রক্ত চড়ে যায় ধ্রুবর। অটোমেটিক্যালি পকেট থেকে মেশিনটা হাতে উঠে আসে। উঠে যখন এসেইছে, লজ্জা করে লাভ নেই। প্রিয়বাবুর রগে নলটা ঠেকায় ধ্রুব। বলে, চল শালা আজকেই মাল খালাস কর। ভোলা পাল দেখানো হচ্ছে। খাল খিচে গঙ্গার পাড়ে ফেলে দেব।

থরথর করে কাঁপছে প্রিয়বাবু। এক হাতে ওকে ধরে আছে ধ্রুব। মেঝের মেশিনগুলো হঠাৎ থেমে গেল। ধ্রুবর ছেলেরা কান্ট্রি-মেড ওয়ান শাটার বার করে ফেলেছে। নল তুলে মিস্তিরিদের বলছে, অ্যাই চল, চল। হাওয়া আনে দে।

একজন মিস্তিরি বোধহয় টেঁটিয়া আছে। সরছে না। কানাই চেঁচাচ্ছে, অ্যাই শালা ওঠ, এক্ষুনি দানা পুরে দেব।

নল ঠেকিয়ে রেখেই ধ্রুব মিস্তিরিটার দিকে তাকায় এবং আমূল চমকে ওঠে! অঘোরকাকা মেঝে পালিশ করতে এসেছে! ঘোলাটে চশমা আজ অনেকটাই স্বচ্ছ, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চোখে একরাশ বিস্ময়। ধ্রুব এক ঝটকায় প্রিয়বাবুকে সিঁড়ির দিকে নিয়ে যায়।

প্ল্যান অনুযায়ী রিসর্ট থেকে বেরিয়ে দলের এক-একজন বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পরেছিল। সন্ধে উতরে গেলে ঠেকে ফিরবে। সেই মতো আদাড়েবাদাড়ে ঘুরে ধ্রুব ফিরে এসেছে বাঙালবস্তিতে। ঠেকের সামনে নতুন মোটর বাইক দেখে থমকে যায়। কে এসেছে?

গলির অন্ধকারে পাঁচিল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে ধ্রুব। ছিটে বেড়ার ঘর থেকে হলুদ আলোর সঙ্গে কিছু খিল্লি খেউড় ভেসে আসছে তার মানে কিছু ছেলে ফিরেছে মনে হয়। টাকাটা ফুচার কাছে আছে। ঝেড়েপুছে বিশ হাজার বার করা গেছে প্রিয়বাবুর থেকে। ফুচা ফিরে এলেই নিশ্চিন্তি। কিন্তু বাইক-আরোহী কে? এমন সময় ঘাড়ের কাছে কে যেন ফিসফিস করে বলে ওঠে, নিজেরাই নিজেদের ভয় পাচ্ছো গুরু!

চমকে মুখ ফেরাতে দেখে, শিবু মাতাল। আজ যেন মুখচোখ একটু পরিষ্কার। হাসতে হাসতে বলে, ভয় নেই। সোনা এসেছে। চলো আমাকেও ভাড়ার টাকা নিতে হবে।

শিবুর সঙ্গে ঠেকের দিকে যেতে যেতে ধ্রুব বলে, কী ব্যাপার আজ ট্যাঙ্ক খালি মনে হচ্ছে।

ম্লান হেসে শিবু বলে, হ্যাঁ গো, ক'দিন হল রাত না হলে খাচ্ছি না। বোনের ছেলে এসেছে তো।

ধ্রুব অবাক হয়। বলে, কোথায়? এ-বাড়িতে!

এ বাড়ির খোঁজ সে এখনও পায়নি। তবু সাবধানের মার নেই। যদি হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, তাই সারাদিন একটু ফ্রেশ থাকার চেষ্টা করি।

দু'জনে ঘরে এসে ঢোকে। সোনা, কানাই, দেবা মেঝেতে বসে আছে।

তুমি কেন এসেছ? শিবুর দিকে তাকিয়ে বিরক্তির সুরে বলে সোনা।

আগের মাসের ভাড়াটা। খুবই বিনয়ের সঙ্গে বলে শিবু।

সোনা আরও খেপে যায়— পনেরো দিনও হয়নি ভাড়া দিয়েছি, আবার চাইতে এসেছ!

স্যরি, নেশা করে ছিলাম তো, মনে রাখতে পারিনি। বলে, ধীর পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায় শিবু। সোনা হঠাৎ হাসতে শুরু করে। কানাই, দেবাও হাসছে। হিপ পকেট থেকে পার্স বার করতে করতে সোনা বলে, অ্যাই শিবুদা, নিয়ে যাও। শালা মাতাল, কিছুই মনে রাখতে পারে না।

শিবু বোকা বোকা হেসে সোনার সামনে হাত পেতে দাঁড়ায়। সোনা গুনে গুনে টাকা দেয়, ভাড়া না ভিক্ষে বোঝা যায় না। খ্যাক খ্যাক করে হাসছে সবাই। ধ্রুবর মুখ থমথমে। ও জানে, সোনা যেটা করল, সামন্ততন্ত্রের প্রাচীন বিনোদন এটা। সম্বলহীন মানুষরা চিরকালই এদের লাফিং স্টক।

শিবু চলে যেতে সোনা বলে, কী হল ধ্রুবদা, বোসো। আজ তো একেবারে নিখুঁত মাল নামিয়েছ!

কী নামিয়েছে ধ্রুব ভাল ভাবেই জানে। নিজেই অনেকখানি নেমে গেছে অঘোরকাকার চোখে, তবু বিষণ্ণ হেসে সোনার সামনে বসে ধ্রুব। সোনাকে ঠেকে দেখে মনে খানিক আশ্বাস পেয়েছে। আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে সোনা, এবার হয়তো নেতৃত্ব ফেরত নেবে।

সোনা বলে ওঠে, সবই ভাল ছিল, ভোলা পালের নাম শোনার পরও তুমি মেশিন চমকাতে গিয়ে ভুল করলে।

মানে! বিস্মিত হয় ধ্রুব। তারপর বলে, তুই কী বলতে চাস, ভোলা পালের নাম শুনেই আমাদের প্যান্টুল খুলে দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত?

না না, আমি সেটা বলিনি। আমি বলছি, মেশিনটা দুম করে না বার করতে। লোকটার সঙ্গে যদি ভোলা পালের রিয়েল রিলেশান থেকে থাকে, তা হলে মেশিনটা ভোলা পালকেই চমকানো হল। ভোলা পালের ক্ষমতা তো তুমি

জানো না। মন্ত্রীকে পর্যন্ত পালটি খাইয়ে দেয়।

ধ্রুবর জানতে ইচ্ছে করে, আমরা আসলে কার বাচ্চা? পার্টির, মন্ত্রীর, দেশের, নাকি ভোলা পালের। কিছুই না বলে চুপচাপ বসে থাকে ধ্রুব। সোনা বলে যায়, আসলে তোমার দোষ নেই। দোষ ওই পিস্তলটার। ভার্জিন মাল, ভীষণ ছোঁকছোঁকানি, ফুঁড়ে দেওয়ার জন্য লোক খুঁজছে। মেশিনের তো ব্রেন নেই। তাই তোমার মতো ঠান্ডামাথার লোককে দিয়েছিলাম। তুমিও তো দেখছি ভুলভাল জায়গায় বার করে ফেলছ।

লিডারশিপ ফেরত নেওয়ার আগে কেন এত ভণিতা করছে সোনা। হ্যান্ড ওভার করার জন্য ধ্রুব প্রস্তুত। তার তো দিন শেষ হয়েই গেছে, এখন সোনার দয়ায় দিন কাটাতে হবে। অঘোরকাকা আজ যা দেখেছে, বাড়ি গিয়ে বলবেই। মা, আইরিন, পুতুল, রাঙাকাকিমা সবাই মুখ ফিরিয়ে নেবে ধ্রুবর থেকে। এতদিনের শ্রদ্ধামিশ্রিত করুণা উধাও হবে। কী পড়ে থাকবে তা হলে!

সোনা বলে যাচ্ছে, তোমাকে না পেয়ে গতকাল রাত্তিরবেলা ভোলা পাল আমাকে ফোন করেছিল। ওর একটা কাজ করে দিতে হবে। পলিটিক্যাল অ্যাসাইনমেন্ট।

কীরকম! চোখ কুঁচকে জানতে চায় ধ্রুব।

অ্যাসাইনমেন্টটা যদি অ্যাকসেপ্ট করো, রিসর্টের কেসটা আমি সালটে নিতে পারব।

কাজটা কী? অধৈর্য হয় ধ্রুব।

আঠাশ তারিখ রজার কোম্পানির গেটে একটা মিটিং আছে। পেটো চার্জ করে গোলমাল পাকিয়ে মিটিং ভেস্তে দিতে হবে। গোটা কুড়ি পেটো আর দশ হাজার টাকা কালকের মধ্যেই পাঠিয়ে দেবে ভোলা পাল।

হঠাৎ যদি এ ঘরে শ্রীতমা চলে আসত, এত অবাক হত না ধ্রুব। হাঁ করে চেয়ে আছে সোনার দিকে। সোনা বলে, কী হল, ওরকম ভ্যাবলা মেরে গেলে কেন!

কোনওক্রমে ধ্রুব বলে, ওটা আমাদের ইউনিয়নের মিটিং সোনা। আমি কী করে ভণ্ডুল করব!

চরম তাচ্ছিল্যে সোনা বলে ওঠে, ছাড়ো তো তোমার মিটিং। এ সব তো আগেও অনেক হয়েছে। খুলেছে তোমাদের ফ্যাক্টরি?

এবার হয়তো খুলবে।

ধ্রুবর কথা শুনে, সোনা সমেত ঘরের সবাই হেসে ওঠে। একটু আগে শিবু মাতালকে নিয়ে যেরকম হাসছিল। ঘর এখন ভর্তি। ফুচারা ফিরে এসেছে। সবার

মাঝখান থেকে উঠে দাঁড়ায় ধ্রুব। বলে, এই কাজটা আমি পারব না সোনা। তাতে যদি দল থেকে আমায় চলে যেতে হয়, যাব।

দল ছেড়ে তুমি চলে গেলেও, ভোলা পাল তোমায় ছাড়বে না। একবার যখন পাঙ্গা নিয়েছ, হিসেব বরাবর করতেই হবে। ওর লোকের কাছে মেশিন চমকিয়ে মাল কামিয়েছে। ওর দু'-একটা কাজ না করে দিলে কী করে চলবে।

নিঃশব্দে দরজার দিকে এগিয়ে যায় ধ্রুব। সোনা আবার বলে, তুমি বোধহয় ঠিক করছ না ধ্রুবদা। আঠাশ তারিখ হতে এখনও চারদিন বাকি। একটু ভেবে দেখো।

শিবু মাতালের ঘর থেকে বেরিয়ে আলো অন্ধকারের গোলকধাঁধায় পড়ে গেল ধ্রুব। কোথায় যাবে, কার কাছে যাবে ঠিক করতে পারে না। বস্তুত সে এখন না ঘর কা, না ঘাট কা। বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। দল থেকেও ছিটকে গেল। তা হলে যাবে কোথায় এখন! মুহূর্তের মধ্যে মনে পড়ে স্বপনের কথা। ওকে সতর্ক থাকতে বলতে হবে। যদিও ও আন্দাজ করেছে হামলা হতে পারে। কিন্তু সেটা কত মারাত্মক আকারের, স্বপনকে জানিয়ে রাখা উচিত।

স্বপনের বাড়ির উদ্দেশেই পা বাড়ায় ধ্রুব।

ধ্রুবকে লুকিয়ে রাখতেই হয়তো রাত আজ এত মসিকৃষ্ণ। স্বপনের বাড়ি ঘুরে ধ্রুব এখন তার পুরনো আশ্রয়ে। ডিস্ট্রিক্ট মাঠ। খেলায় হেরে গেলে মাঠ ছেড়ে বাড়ি যেতে চাইত না ধ্রুব। আজ বড় একটা খেলায় হেরে গিয়ে মাঠেই ফিরে এসেছে। স্বপন পাত্তা দেয়নি ধ্রুবর তথ্য। বলেছে, এ আর তুমি নতুন কী বললে। আমরা সব জানি। যে কোনও আক্রমণের মোকাবিলা করতে আমরা প্রস্তুত। তোমরা ভয় পেয়ো না, সবাই এসো সেদিন।

ধ্রুব কিছুতেই বলতে পারেনি, হামলার জন্য আমাকেই রিক্রুট করা হয়েছিল। কুড়িটা পেটো, দশ হাজার টাকার কথাও বলা হয়নি। তা হলেই স্বপন জানতে চাইত, তুমি এত কিছু জানলে কী করে!

না বুঝেই বিশ্বাসঘাতকের স্ট্যাম্প মেরে দিত ধ্রুবর পিঠে। এরকমই একবার সাব ডিভিশনাল ফাইনাল ম্যাচে ধ্রুবর সেম সাইড গোলে হেরেছিল টিম। অপোনেন্ট-এর স্ট্রাইকারের সামনে ড্রিবলিং করে গ্যালারি শো করছিল গোলকিপার ধ্রুব। নিজের পায়ে লেগে বল গোলে ঢুকে যায়। সবাই মাঠ ছেড়ে চলে গেলেও ধ্রুব লজ্জায় মাঠের বাইরে যেতে পারেনি। সন্ধেও হাঁটি হাঁটি পায়ে রাতের দিকে এগোচ্ছিল। তখনই বিশেকে সঙ্গে নিয়ে সালোয়ার-কামিজ পরা শ্রীতমা এসেছিল ধ্রুবকে সঙ্গে নিতে।

অবচেতন সেরকমই কোনও প্রতীক্ষা নিয়ে কি ধ্রুব আজ এ মাঠে এসে বসেছে? কিন্তু রাত যে ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে।

মাথার ওপর ম্লান তারা। আকাশের ঢালে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদ, অমাবস্যার আগে যেন ধ্রুবর মতোই থমকে দাঁড়িয়েছে। ধ্রুব মনে করার চেষ্টা করে, ঠিক কবে থেকে তার ক্ষয় শুরু হয়। সম্ভবত সেই দিন। বাগড়ি মার্কেটে বিক্রি করতে না পারা ব্যাগভর্তি টিপ নিয়ে ফেরত আসছিল ধ্রুব। স্টেশনের রাস্তায় দেখা হল পুতুলের সঙ্গে। ডানাওলা পিপড়ের মতো ধড়ফড়ানি পুতুলের চেহারায়, ধ্রুবদা, শুনেছ, তোমাদের কারখানার এরোপ্লেনের টায়ার বার করে নিয়ে যাচ্ছে সরকার। পুলিশ, মিলিটারি ঘিরে রেখেছে গোটা কারখানা।

এরকম একটা সম্ভাবনার কথা কাগজে, ইউনিয়নের মুখে শুনছিল ধ্রুব। সেটা যে এত তাড়াতাড়ি ঘটে যাবে, আন্দাজ করতে পারেনি। এরো টায়ার বার করে নেওয়া মানে কোম্পানির হার্টটাই খুবলে নেওয়া। তারপর মড়া আগলে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না ধ্রুবদের। একটা রিকশা ডেকে পুতুলকে তুলে নিয়েছিল ধ্রুব. চল, দেখে আসি।

রিকশায় যেতে যেতে পুতুল বলে, বাবা গিয়েছিল দেখতে, সহ্য করতে পারেনি। এমন শরীর খারাপ করেছে, শুয়ে পড়েছে বাড়িতে এসে।

সহ্য না করতে পারারই কথা। শ্রমিকদের ওই টায়ারগুলোই ছিল শেষ সান্ত্বনা। অত দামি টায়ারগুলো কি নষ্ট হতে দেবে মালিক! ওগুলো বিক্রি করে লেবারদের পাওনা মিটিয়ে দেবে। তা হল না। দেশের প্রতিরক্ষার স্বার্থে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী চিফ মিনিস্টারের সাহায্য চাইলেন। চিফ মিনিস্টার প্রতিশ্রুতি দিলেন, দেশের স্বার্থে তিনি গার্ড দিয়ে এরো টায়ারগুলো বার করে দেবেন। আজ সেই প্রতিশ্রুতিই পালন হচ্ছে। রিকশায় যেতে যেতে ধ্রুব ভাবছিল, দেশ আগে, না কারখানা আগে। দেশ আগে, না দেশের মানুষ আগে। এই দেশের টাকাই যখন বিদেশে সাইফোনিং হয়ে যায়, সরকার তো কোনও গার্ড বসাতে পারে না! সেই টাকাই অস্ত্র হয়ে দেশের ওপর নেমে আসে। তখন দেশমাতা নিজেই নিজের ঘাতক। —এ সব ভাবনা স্বপনের থেকেই শেখা। স্বপন আর কিছু না পারুক ভাবতে শিখিয়েছিল।

রিকশা যখন রজার কোম্পানির গেটে পৌঁছল, ততক্ষণে সব শেষ। ডেডবডি চলে গেলে পরিজনরা যেমন এলোমেলো বেসামাল কাঁদে, তেমন ভাবেই কারখানার চত্বরে বসে কাঁদছিল শ্রমিকরা।

ধ্রুব রিকশা থেকে নামেনি। বমি চাপার মতো কান্না চেপে চলে গিয়েছিল গঙ্গার ধারে। পুতুলের কোলে মাথা রেখে শিশুর মতো ডুকরে উঠেছিল। ওই সামান্য

অশ্রুকণায় কি দেশের প্রতিরক্ষার বাঁধে ফাটল ধরাতে পারে!

সন্ধে নেমে গেলে পুতুলের সঙ্গেই ফিরেছিল বাড়িতে। শ্রীতমা ভেবেছিল অন্যরকম। ভালবাসা যাচাই করে নিতে ধ্রুবর সামনে মেলে ধরেছিল নির্জন উন্মুক্ত মায়াবী চরা। সেই নিঃস্ব দিনে যা চোরাবালির চরা হয়ে যায় ধ্রুবর কাছে। সব শেষে ঝাউবনের শ্বাপদের মতো হিসহিসিয়ে উঠেছিল শ্রীতমা, এই ক্ষমতাটুকু শেষ হয়ে গেছে তোমার? নাকি মন নেই আমার ওপর! সব কিছু উজাড় করে দিয়ে এসেছ অন্য কোথাও!

সেই দিন থেকেই ক্ষয় শুরু হয় ধ্রুবর। আজ একদম শেষ সীমায়। কোথাও যাওয়ার নেই তার। কেউ আসবে না নিতে। পাগলা কুকুরের মতো ভোলা পালের ছেলেরা তাকে খুঁজবে। —ভাবতে ভাবতেই ধ্রুব যেন দেখতে পায় অন্ধকার ভেদ করে চারপাশ থেকে ছুটে আসছে জিভ বার-করা শয়ে শয়ে হিংস্র কুকুর। এক্ষুনি ধ্রুবকে কামড়ে ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবে।

প্রবল আতঙ্কের মধ্যে বাঁ পকেটের শ্বাপদ হিলহিলিয়ে ওঠে। ভেতর থেকে কে যেন বলতে থাকে, নিজেই নিজের ঘাতক হও ধ্রুব। নিজেই নিজের....

বিরক্ত হয়ে পিস্তলটা পকেট থেকে বার করে নেয় ধ্রুব। ঠিকই বলেছিল সোনা। মালটা খালি টার্গেট খুঁজে বেড়ায়। নিজের কপালে নলটা ঠেকাতেই, উধাও হয় কুকুরগুলো। ট্রিগার টানার আগে আইরিনের মুখ মনে পড়ে। বাবার কাছে থাকব বলে, মাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। সেই বাবাকেই যদি মাঠের মাঝখানে এভাবে মরে পড়ে থাকতে দেখে, সহ্য করতে পারবে না। আইরিন একদিন বলেছিল, সূর্যমুখী ফুলেরা আকাশকে কী যেন বলতে চায়। কী বলতে চায় ধ্রুব জানে। ওরা আকাশকে বলে, এই ক্ষুদ্র, সুন্দর জীবনের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের শোভা তোমাকে শান্তি দিক। আরও নির্মল হও তুমি।

আইরিনও বোধহয় এরকমই কিছু একটা বলতে চায় ধ্রুবকে। বাবা-ই তো তার আকাশ। এত তাড়াতাড়ি অন্ধকার হলে চলে!

কপাল থেকে মালটা নামিয়ে আবার বাঁ পকেটে চালান করে ধ্রুব। মাঠ ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। মেয়েটা বোধহয় এখনও না খেয়ে অপেক্ষা করছে।

পাড়ায় ঢুকে বাড়ির দিকে মোড় ঘুরতে যাবে ধ্রুব, দেখে, অঘোরকাকা দাঁড়িয়ে আছে। জোরে পা চালাতে যায় ধ্রুব। অঘোরকাকা ডাকে, ধ্রুব, শোন।

ডাকটার মধ্যে কীসের যেন ইঙ্গিত! ধ্রুব সামনে আসে, কী হল?

চাপা গলায় অঘোরকাকা বলে, এদিক দিয়ে ঢুকিস না। কয়েকটা ছেলে তোদের

বাড়ির ওপর নজর রেখেছে। তোকেই খুঁজছে বোধহয়। কলাবাগান দিয়ে আমাদের বাড়িতে ঢুকে যা। পেছনের দরজা খোলা আছে। ছেলেগুলোর গতিক সুবিধের ঠেকছে না।

ছেলেগুলো কাদের পার্টির, কিছু বুঝতে পারলে? ফিসফিসিয়ে জানতে চায় ধ্রুব।

তোদের নয়। যা দেরি করিস না। তোর মাকে সব বলা আছে। আজ রাতটা আমাদের বাড়িতে কাটানোই সেফ। ভোর অব্দি নিশ্চয়ই ছেলেগুলো থাকবে না।

ধ্রুব ঝুঁকি নেয় না। ঘুরপথই ধরে।

দু' বাড়ির সব আলোই নেভানো। হ্যারিকেনের আলোয় খেতে দিয়েছে পুতুল। খাওয়া দেখতে দেখতে পুতুল বলে, মেয়ে তো আজ ফেরেনি।

মুখে গ্রাস নিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় ধ্রুব।

মায়ের কাছে গেছে। জেঠিমাকে বলে গেছে, রাতে ফিরবে না।

একদিক থেকে নিশ্চিন্তই হয় ধ্রুব। চোরের মতো এই আত্মগোপন মেয়েকে দেখতে হচ্ছে না। খানিক পরে পুতুল বলে, তুমি শুনলাম বিরাট মস্তান হয়ে গেছ!

কোনও উত্তর দেয় না ধ্রুব। খাওয়া শেষ করে উঠতে যায়। পুতুল বলে, এখানেই হাতমুখ ধুয়ে নাও। দালানে গিয়ে কাজ নেই। ছেলেগুলো যদি দেখতে পেয়ে যায়।

থালায় হাত ধুতে ধুতে ধ্রুব জিজ্ঞেস করে, কোন ঘরে শোব আমি?

বিছানাটা দেখিয়ে পুতুল বলে, এই যে, সাজিয়ে রেখেছি। এই ঘরেই শোবে। আমরা পাশের ঘরে।

পুতুলের দেওয়া গামছায় মুখ মুছে প্রায় হামাগুড়ি দেওয়ার মতো বিছানায় উঠে যায় ধ্রুব। সারাদিনের নোংরা-লাগা পাঞ্জাবি খুলে ফেলে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে।

পুতুল মশারির দুটো খুঁট লাগিয়েছে কি লাগায়নি, ধ্রুবর চোখে ঘুম এসে যায়।

শিয়রে শমন সত্ত্বেও অনেকদিন পর স্বপ্নহীন গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল ধ্রুব। পুতুল এসে ঘুম ভাঙায়, ধ্রুবদা, ধ্রুবদা, ছেলেগুলো চলে গেছে।

বিছানা ছেড়ে ধড়মড় করে উঠতে যাচ্ছিল ধ্রুব। পুতুল বলে, কী হল, উঠে যাচ্ছ যে বড়! এখনও সকাল হয়নি।

বাড়ি যাই, মা হয়তো অপেক্ষা করছে। বলে পাঞ্জাবিটা নিতে যায় ধ্রুব। মশারির মধ্যে পুরো শরীরটা তুলে এনে পুতুল বলে, কেউ অপেক্ষা করছে না।

সতর্ক হয় ধ্রুব, পুতুলের আচরণ সুবিধের নয়। সলতে নামানো হ্যারিকেনটা পোষা বিড়ালের মতো মেঝেয় বসে ঝিমোচ্ছে। বাড়ির বাইরে ঝিঁঝি আর উচ্চিংড়ের ক্লান্ত কোরাস। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য ধ্রুব বলে, তুই কি সারারাত জেগেছিলি নাকি?

বুকের ওপর নেমে এসে পুতুল বলে, জাগব না। এই রাতটার অপেক্ষাতেই ছিলাম এতদিন। ছেলেগুলো চলে যাওয়ার পরই তোমার কাছে এসেছি।

পুতুলের হাত ঘুরে বেড়াচ্ছে ধ্রুবর কপালে, চুলে, গালে, ঠোঁটে। হাতের ভাষা মনে করিয়ে দিচ্ছে পুরনো পিপাসা। পুতুলের ক্ষতি হয়ে যাবে এই ভয়ে ধ্রুব উঠে বসতে যায়। বলে, এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না পুতুল।

কীসের বেঠিক ধ্রুবদা। তোমার বউ তো অনেকদিন হল নেই। মেয়েও চলে গেছে সেখানে। বাড়ির সবাই ঘুমোচ্ছে। রাত শেষ হয়নি এখনও। এই রাতটা তো আমারই।

শাড়ি তো সরে গেছে অনেকক্ষণ। এবার ঢিলেঢালা ব্লাউজটাও নামিয়ে দেয় পুতুল। শুকনো খরাক্লিষ্ট ধ্রুবর বুকে নেমে আসে শেষ রাতের হিম।

মুখ ঘুরিয়ে নেয় ধ্রুব। জানলার বাইরে ভোররাতের একটা তারা এখনও জ্বলছে।

শিহরিত আবেশে বলে চলেছে পুতুল, বিয়ে করে যতই তুমি ঘর-সংসারী হও, সেদিন যখন রেগেমেগে জড়িয়ে ধরেছিলে আমায়— আদর করছিলে খানিক, আমি স্পষ্ট ফুলশয্যার ঘরের গন্ধ পেলাম।

এমন ভাবে কথাগুলো বলে যাচ্ছে পুতুল, যেন সত্যিই শুনতে পাচ্ছে রাতের বুক মুচড়িয়ে বেজে ওঠা সানাইয়ের সুর। মমতা মেশানো চোখে ধ্রুব ওর মুখের দিকে তাকায়, লণ্ঠনের ম্লান আলোয় দেখা যায় পুতুলের কপালে, গালে চন্দন ফোঁটার জলছাপ। উন্মুক্ত ঊর্ধ্বাঙ্গে একটা বাসি মালাও নেই।

ধ্রুবর এভাবে তাকিয়ে থাকাকে মুগ্ধতা ভেবে ভুল করে পুতুল। আসঙ্গ লিপ্সায় আঁকড়ে ধরে তার যৌবন শুরুর সাক্ষীকে। ধ্রুবরও সংযমের বাঁধ ভাঙতে থাকে। সে জেগে না উঠলে, পুতুল এক্ষুনি তাকে পিষে ফেলবে। শেষ চেষ্টার মতো ধ্রুব বলে ওঠে, পুতুল, এরকম করিস না। যদি কিছু হয়ে যায়!

কিছু হবে না। ব্যবস্থা করে রেখেছি।

তার মানে! আশ্চর্য হয় ধ্রুব। ফাঁস আলগা দিয়ে পুতুল কোথা থেকে যেন একটা কন্ডোমের প্যাকেট বার করে ধ্রুবর হাতে গুঁজে দেয়, এই নাও। এবার নিশ্চিন্ত তো?

প্যাকেটটা হাতে ধরে বিস্ময়ের শেষ সীমায় পৌঁছে যায় ধ্রুব। আশঙ্কিত গলায় বলে, তুই এটা কোথায় পেলি?

রাখতে হয়। কখন কোথায় দরকার লাগে।

দরকার লাগে মানে? তুই তো জানতিস না, আজ রাতে আমায় এখানে থাকতে হবে।

সংসারে প্রয়োজনে তুমি যে মস্তান হয়ে গেছ, সেটাও তো আমি জানতাম না। তুমিও আজ জানলে তিনজনের পেট চালাতে গিয়ে এটা আমার মাঝেমধ্যে দরকার লাগে।

পুতুল! প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে ধ্রুব।

চেঁচিয়ো না ধ্রুবদা। সবাই জেনে যাবে। তুমি যদি সময় মতো আমায় বিয়ে করতে, মস্তানির টাকাতেই সংসার চালিয়ে নিতাম। এ ভাবে রাস্তায় নামতে হত না দু'জনকে।

পুতুলের প্রায় নিরাবরণ শরীরের সামনে বসে আর কোনও স্পৃহাই জাগছে না ধ্রুবর। চোখ, নাক, কান দিয়ে যেন আগুন বেরোচ্ছে। পুতুল বলে চলেছে, আজ যে রিসর্টে গিয়ে তুমি পিস্তল দেখিয়ে টাকা নিয়ে এসেছ, বাবা সেখানকার মেঝে তৈরি করেছে, কাল হয়তো ওখানেই কেউ আমায় বুক করে নিয়ে যাবে। পারবে কিছু করতে?

ধ্রুব নিজেকে সামলাতে পারে না। হ্যারিকেনের আলোটাও যেন চমকে ওঠে। বেশ জোরেই পুতুলের গালে চড়টা বসিয়ে দিয়েছে ধ্রুব। উপুড় হয়ে বালিশে মাথা গুঁজে পুতুল কাঁদছে। ওর গোঙানির শব্দের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে প্রহর শেষের সানাইয়ের সুর।

বিধ্বস্ত ধ্রুব ফের শুয়ে পড়ে। সত্যিই তার কিছুই করার নেই। কোমল নীল আকাশে এখনও যে কেন ভোরের তারাটা জ্বলছে, কে জানে!

নদীর নাম সই অঞ্জনা
নাচে তীরে খঞ্জনা সই
পাখি সে নয় নাচে কালো আঁখি
আমি যাবো না অঞ্জনাতে জল নিতে সই
আঁখি কিছু রাখিবে না বাকি

গানটা এখনও মাথায় ঘুরছে আইরিনের। যেমন কথা, তেমনই সুর। কার লেখা জানতে পারলে ভাল হত। ভোরের ট্রেনে বাউল উঠেছিল। গানটা গাইছিল বাউলানি। ট্রেন থেকে নামার পর সুরটাও আইরিনের সঙ্গে নেমে পড়ে। রিকশায় বসে গানটার অনেকটাই শুনিয়েছে কাজলকে। কাজল বলেছে, কী ব্যাপার, হাওড়া স্টেশনে দেখলাম এত গম্ভীর। গান শুনেই মুড ভাল হয়ে গেল!

সত্যিই কাল বিকেল থেকে সারারাত খুব বাজে কেটেছে আইরিনের। বাইপাসের ফ্ল্যাট থেকে বেরোনোর পর, হ্যাঁ, হু, না ছাড়া মায়ের সঙ্গে কোনও কথা বলেনি। রাতে বেলেঘাটার বাড়িতে মায়ের পাশে শুয়ে অপেক্ষা করেছে, কখন ভোর হয়। আলো ফুটতেই মামার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল আইরিন। কাজলের অনেক আগেই বড় ঘড়ির নীচে পৌঁছে যায়। ট্রেনেও গুম হয়ে বসেছিল। বাউলানি এসে মন ভাল করে দিয়ে যায়। গানটা লিখে নিলে হত।

কাজল বাড়ির গেট অব্দি পৌঁছে দিয়ে গেছে। আইরিন বলেছিল ভেতরে আসতে। কাজল বলেছে, পরে আসব। এখনও তোমাদের বাড়ির ঘুম ভাঙেনি।

নদীর নাম সই অঞ্জনা / নাচে তীরে... গুনগুন করতে করতে ঘরে ঢুকে আসে আইরিন। বাবার বিছানায় মশারি খাটানো নেই দেখে অবাক হয়ে যায়। ঠাম্মার খোঁজে বাড়ির পেছনে যায়। এই সময় ফুল তোলে ঠাম্মা।

টগর গাছের নীচে ঠাম্মাকে পাওয়া গেল। আইরিন জিজ্ঞেস করে, বাবা কোথায় গো?

বোবাস্কুলের ছাত্রীব মতো ঠাম্মা, পুতুলপিসিদের বাড়ি দেখায়। ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যায় না। আমবাগানের নীচ দিয়ে পুতুল পিসিদের বাড়ির দিকে এগোয় আইরিন।

রাঙাদিদা রান্নাঘরে। উনুনে হাওয়া দিচ্ছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার। চোখ কুঁচকে আইরিন জিজ্ঞেস করে, বাবা তোমাদের বাড়িতে এসেছে?

চমকে ভয়-পাওয়া চোখে তাকায় রাঙাদিদা। কোনও উত্তর নেই। সবাই বোবা হয়ে গেল নাকি! রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে আইরিন। অঘোরদাদুকেও দেখা

যাচ্ছে না। কাউকে না পেয়ে, সামনের বন্ধ দরজাটায় ধাক্কা দেয় আইরিন।

একটু পরেই খুলে যায় দরজা। সামনে খালি গায়ে আঁচল জড়ানো পুতুলপিসি। চোখে বাকি থাকা ঘুম। পুতুলপিসির শরীরে কীসের যেন অশুভ ইঙ্গিত। সবে যখন আইরিন বলতে যাবে। 'বাবা কোথায়?' তখনই পুতুলপিসির পাশ দিয়ে চোখ যায় বিছানায়। জানলার দিকে মুখ ফেরানো উদোম গায়ে বাবা, মড়ার মতো শুয়ে আছে।

বাবা! বলে আর্তনাদ করে ওঠে আইরিন।

এক ডাকেই ধ্রুবর ঘুম ভেঙে যায়। উঠে বসতে বসতে দেখে যা সর্বনাশ হওয়ার হয়ে গেছে। আর্তনাদটুকু ঘরে ফেলে চলে গেছে আইরিন। সেই আওয়াজটাই ঘরে পাক খাচ্ছে এখন।

দোরগোড়া থেকে ফিরে আসতে আসতে পুতুল বলে, ভালই হল. সব জেনে গেল। মায়ের কাছে গিয়ে শান্তিতে থাকতে পারবে। এদিককার টান থাকবে না....

আরও কী সব বলে যাচ্ছে পুতুল। কিছুই কানে ঢুকছে না। বিছানা থেকে নেমে পাঞ্জাবিটা গলিয়ে নেয় ধ্রুব। বালিশের তলা থেকে পিস্তলটা নিয়ে বাঁ পকেটে চালান করে। তারপর এমন ভাবে বেরিয়ে যায়, যেন কিছুই ঘটেনি একটু আগে।

রাস্তার দু'পাশে শীলবাজারটা একসময় কী জমজমাট ছিল। এখন টাকপোকা লাগা মাথার মতো মনে হয়। এই রুগ্ন বাজারে তোলা আদায় করছে ধ্রুবর ছেলেবা। ধ্রুব বসে আছে মামার চালেব দোকানে। তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে, ছেলেগুলোর ওপর। কোথাও কোনও ঠোক্কর খেলেই ছুটে যেতে হবে। রাস্তা দিয়ে মাঝেমধ্যে অটোরিকশা যাচ্ছে, ধুলোর আড়ালে ছেলেগুলোকে খুঁজতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে ধ্রুবকে। তাই হয়তো ওর একাগ্র চাউনি উদভ্রান্তের মতো ঠেকছে।

গত দু'দিন বাড়ি ফেরেনি ধ্রুব। শিবু মাতালের ঘরেই কাটিয়েছে। জামাকাপড় বদলানো হয়নি। শিবুর সঙ্গেই খেয়েছে. শুয়েছে। দাড়ি কাটা হয়নি। আজ দাঁত মেজেছে কি না মনে পড়ছে না। একটা ব্যাপার নিয়েই সে ভীষণ বিভ্রান্ত। শেষ আশ্রয়টুকু টিঁকিয়ে রাখতে আঠাশ তারিখের হামলায় থাকতে রাজি হয়েছে। কিন্তু সে কি সত্যিই পারবে অপারেশন লিড করতে?

পরপব দুটো অটোর ধুলো থিতোতে ধ্রুব লক্ষ করে, একটা আলুওয়ালার সঙ্গে কথা কথা কাটাকাটি হচ্ছে দেবার। খুব একটা পাত্তা দেওয়ার কিছু নেই, দেবা সামলে নিতে পারবে ভেবে মামার দোকানের ছিটে বেড়ায় হেলান দিতে যায় ধ্রুব। দেওয়া

হয় না। চকিতে উঠে দাঁড়ায়। দেবার কলার ধরেছে আলুওয়ালা। দলের বাকি ছেলেরা দেবার কাছে ছুটে আসছে। এটাই মস্ত ভুল।

ধ্রুব যা ভেবেছিল তাই। আলুওয়ালার আশপাশের সবজিওলারা উঠে এসে, ধ্রুবর সব ক'টা ছেলেকে ধবল। এরা কেউই সত্যিকারের আলু-সবজিওলা নয়, খোচড়।

মামার দোকান থেকে নেমে এসে, পায়ে পায়ে পিছু হটতে থাকে ধ্রুব। ওখানে ভিড়টা জমাট বাঁধলেই দৌড় মারবে।

সেই মতো অনেকটাই পিছিয়ে এসেছিল। কে যেন ছদ্মবেশী আলুওয়ালাকে ডেকে, ধ্রুবর দিকে আঙুল তোলে। দৌড় শুরু করার আগে আলুওয়ালাকে চিনতে পারে ধ্রুব, এস ডি পি ও রণজয় দত্ত!

বাজারের রাস্তা ধরে দৌড়ে যাচ্ছে ধ্রুব। পেছন ফিরে একবার দেখে নিয়েছে, রণজয় দত্ত ছুটে আসছে। ভালই স্প্রিন্ট টানছে অফিসার! ট্রেনিং নেওয়া মাল। ধ্রুবর প্র্যাকটিস নেই অনেকদিন। দম ফুরিয়ে আসছে, বাজার ফুরোচ্ছে না। বাঁ পকেটের ব্রাউনিং খোঁচা মারছে। দৌড়ের ক্ষমতা কমে গেলেও, বুদ্ধির দৌড় কমেনি ধ্রুবর। খেয়াল পড়ে, মালটা যে করে হোক ফেলে দিতে হবে। আর্মসসুদ্ধ ধরলে, ক'বছরের জন্য ভিতর করে দেবে কে জানে! বাজার পাতলা হয়ে এসেছে, আশপাশে ঝোপঝাড়। দৌড়তে দৌড়তেই মালটা পকেট থেকে বার করে নেয়, ডান হাতটা ফলস ছুড়ে, বাঁ হাতের মাল টুক করে ঝোপে ফেলে দেয়। সেকেন্ডের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে চিতাবাঘ।

দৃশ্যটা দেখে কাজলও থমকে গেছে। কী রোমহর্ষক ঘটনা চোখের সামনে ঘটে গেল। দুটো লোকই এখন ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। এ দু'জন কারা? পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় কাজল। বাজার করতে এসে এরকম একটা চমকপ্রদ ঘটনা দেখবে, কল্পনাতেও ছিল না। হিন্দি সিনেমার ডিরেক্টররাও এরকম চাপা অথচ মারাত্মক চেজিং বানাতে পারবে না। মিউজিক ফিউজিক দিয়ে একশা করবে।

শিকারের কলার ধরে বসে আছে শিকারি। দু'জনেই ধুলোকাদায় মাখামাখি। হাঁফাচ্ছে। শিকারিকে চিনতে পেরে অবাক হয় কাজল, এ কী ড্রেস করেছে রণজয়বাবু! মানুষটা সত্যিই অদ্ভুত।

অপরাধীকে চেনার কোনও প্রশ্নই নেই কাজলের। লোকটাকে দেখে, খুব একটা দাগী বলে মনে হয় না। কী রকম যেন বেভুল, অনির্দিষ্ট চাউনি নিয়ে বসে আছে। তবে দৌড়ের মধ্যে রেসের মাঠের ঝলকানি ছিল। লোকটা কে? অপরাধটা কী?

কৌতূহলগুলো আপাতত চাপা দেয় কাজল। রণজয়বাবু এখন অন ডিউটি। সন্ধেবেলায় রণজয়বাবুর বাড়ি গিয়ে জেনে নেবে।

থানার স্যাঁতস্যাঁতে সেলে গুটলি পাকিয়ে শুয়েছিল ধ্রুব। কনস্টেবল এসে ডাকে, ধ্রুববাবু উঠুন। বড় সাহেব ডাকছেন।

অত্যন্ত অনিচ্ছায় উঠে দাঁড়ায় ধ্রুব। এই ডাকাডাকি আর ভাল লাগে না। ধরা পড়ার এই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে, প্রায় ছ'সাতবার জেরা করা হয়ে গেছে। অন্য ছেলেগুলোকে পাঠিয়ে দিয়েছে জেল কাস্টডিতে, ওরা যেহেতু আর্মসসুদ্ধ স্পটে ধরা পড়েছে।

ছেলেগুলো এখনও পর্যন্ত ধ্রুবকে লিডার বলে চিনিয়ে দেয়নি। ধ্রুব পড়ে আছে পুলিশ কাস্টডিতে। অবশ্য একদিনেই ধ্রুব বেশ মানিয়ে নিয়েছে থানায়। বাইরের চড়া আলোর থেকে এই আধো অন্ধকার অনেক ভাল। সেলের দুর্গন্ধটাও ক্রমশ সয়ে এসেছে।

কনস্টেবলকে অনুসরণ করে ধ্রুব ও সি-র ঘরে এসে দাঁড়ায়। ও সি-র চেয়ারে এস ডি পি ও বসে আছেন। ধ্রুবকে দেখে বললেন, আসুন ধ্রুববাবু। বসুন।

অতি খাতিরে বেশ ভয়ই পায় ধ্রুব। এস ডি পি ও-র পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ইয়াং ও সি-র মুখটা পড়ার চেষ্টা করে। পদে ছোট তো, রণজয়বাবুর মতো আনপ্রেডিকটেবল নয়। তাও কিছু বুঝতে না পেরে ধ্রুব চেয়ারে বসে। রণজয় বলেন, আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। একদিনের ট্রাবলের জন্য আমরা খুবই স্যরি। আপনি কাইন্ডলি এই কয়েকটা জায়গায় সই করে দিন।

চার-পাঁচটা কাগজ আর পেন এগিয়ে দেন অফিসার। এত তাড়াতাড়ি ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে দেখে, ধ্রুব বেশ অবাক হয়। রণজয় যেন ধ্রুবর মনের কথাটা পড়ে নিয়ে বলেন, মন্ত্রী বা কোনও লিডার যদি আপনার হয়ে রেকমেন্ড করত, ছাড়তাম না। লড়ে যেতাম বদলি হওয়ার জন্য। অনেকদিন এক জায়গায় হয়ে গেল। কিন্তু এমন একজন আপনার হয়ে বলল, অবিশ্বাস করতে পারলাম না। তাই ডিটেকশান গ্রাউন্ডে আপনাকে ধরা হয়েছিল দেখিয়ে, ছেড়ে দেওয়া হল।

আকাশপাতাল ভেবেও ধ্রুব এমন কাউকে খুঁজে পায় না, যে তার হয়ে সুপারিশ করতে পারে। অফিসারের কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে, সোনার মামা বা ভোলা পালের ইনফ্লুয়েন্স এখানে খাটবে না। তা হলে কে? সেই অজ্ঞাত মানুষটার জন্যই বোধহয় কাল মারতে মারতে একটা ফোন পেয়ে থেমে গিয়েছিল ও সি।

মনে মনে মানুষটিকে ধন্যবাদ দিয়ে, সই করায় মন দেয় ধ্রুব।

অফিসার বলেন, আমার কাছে কিন্তু এখনও একটা ব্যাপার ক্লিয়ার হয়নি। আপনি হঠাৎ দৌড়চ্ছিলেন কেন?

কাগজ থেকে মুখ তুলে ধ্রুব আগের উত্তরই দেয়, ভয়ে। কে যেন আমাকে দেখিয়ে দিল, আপনি দৌড়ে এলেন। আমিও...

রণজয় মাথা নাড়ছেন। অর্থাৎ সন্তুষ্ট নন। আবার একটা পুরনো প্রশ্ন তোলেন, আপনাকে আমার এত চেনা চেনা লাগছে কেন বলুন তো?

এ কথার উত্তর দিতে সাহস হয় না ধ্রুবর। শুটিং-এ তোলা আদায়ের সময় ধ্রুব অনেক চকচকে ছিল, ক'দিনে একদম ধস খেয়ে গেছে। দাড়িফাড়ি কাটা নেই, নোংরা জামাকাপড়, চিনতে পারছে না অফিসার।

সই করা কাগজগুলো বাড়িয়ে দেয় ধ্রুব। অফিসার বলেন, আপনাদের ফ্যাক্টরির খবর শুনেছেন? আজ সকালে কী হয়েছে।

শোনার কথা নয় ধ্রুবর। সে কাল থেকে থানায়। ভাবতে থাকে কোন খবরের কথা বলছেন রণজয়? বিদ্যুৎ-চমকের মতো মনে পড়ে আজ আঠাশ তারিখ। তখনই রণজয় বলে ওঠেন, গেট মিটিং-এ মারপিট হয়েছে। বোম চার্জ, লাঠি, ছুরিও চলেছে।

স্বপন! স্বপনের কিছু হয়নি তো? প্রবল আশঙ্কায় জানতে চায় ধ্রুব।

উনিই সব থেকে বেশি মার খেয়েছেন। হেভিলি ইনজিওরড। মাথায় রড মেরেছে ওরা। পিজিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

রডটা যেন আবার করে ধ্রুবর মাথায় পড়ে। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ধ্রুবর। গা হাত পা ঝিমঝিম করছে। স্বপনের কিছু হয়ে গেলে, আর তো ফ্যাক্টরি খুলবে না!

কী হল, আপনার শরীর খারাপ লাগছে? জল খাবেন? এই জল নিয়ে এসো তো?

বাজারের ঘটনাটা জানার জন্য গতকাল সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি কাজলকে। বিকেলবেলা ছুটতে ছুটতে আইরিন আসে বাড়িতে। বলে, তোমার সঙ্গে এস ডি পি ও-র চেনাজানা আছে, বলো না বাবাকে ছেড়ে দিতে। বাবা তো কিছুই করেনি। ছেলেগুলোকে চেনেও না।

আইরিনকে সঙ্গে করে কাজল তক্ষুনি রণজয়বাবুর অফিসে যায়। ফ্যাক্টরি বন্ধ, আইরিনদের অবস্থা, ওর বাবা এককালে এলাকার নামী প্লেয়ার ছিল, সবই বলে। রণজয়বাবু আরও দু'-একটা প্রশ্ন করেন আইরিনকে। উত্তর শুনে আশ্বস্ত হন। বলেন, ঠিক আছে, দেখছি। কালকের মধ্যে বার করা যায় কি না। এখনও পর্যন্ত ওঁর এগেনস্টে তেমন কোনও চার্জ আনা যায়নি। তোমরা বিকেল চারটেয় থানায় এসো।

সেইমতো আজ একঘণ্টা হতে চলল, কাজল, আইরিন থানায় এসেছে। কিছু অফিসিয়াল কাগজে নাম ঠিকানা লিখতে হয়েছে দু'জনকে। কাগজগুলোকে পড়েও দেখেনি কাজল। রণজয়বাবু বলেছেন, তোমরা একটু অপেক্ষা করো। আরও কিছু ইন্টারোগেট করতে হবে। তারপর।

আইরিন আর থানার ভেতরে দাঁড়ায়নি। কাজলকে নিয়ে বাইরে চলে এসেছে। বাবাকে থানা থেকে বার করে আনলেও, আইরিন নিজে ছাড়বে না। মাকেও না। দু'জনকে পাশাপাশি বসিয়ে প্রচুর কথা শোনাবে। বলবে, তোমরা সমান দোষী। তোমাদের লজ্জা করে না... আরও নানান কথা। সেগুলোই গাছের নীচে দাঁড়িয়ে মকসো করে নিতে থাকে আইরিন। কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। এসব ভাবতে ভাবতেই দেখে, বাবা বেরিয়ে এসেছে থানার বারান্দায়। চোখমুখ ফুলো ফুলো, ভেজা ভেজা। ওরা কি বাবাকে মেরেছে? একছুটে বাবার কাছে যেতে ইচ্ছে করলেও তীব্র অভিমানে দাঁড়িয়ে থাকে আইরিন।

থানার বাইরে এসে ধ্রুবও দেখতে পেয়েছে তার মেয়েকে। পাশের ছেলেটিকেও ভীষণ চেনা চেনা লাগল। ক্ষিরীশ গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে দুটিতে। ওরাই কি আমায় থানা থেকে ছাড়াল? ভেবেও চোখ সরিয়ে নেয় ধ্রুব। মেয়ের ঘেন্নাভরা মুখ কোনও পিতা-ই দেখতে চায় না।

থানার বারান্দা থেকে নেমে আসে ধ্রুব। একটা ভারী হাওয়া ধাক্কা দিতে থাকে। অচেনার ভান করে ওদের সামনে দিয়ে যেতে যেতে ধ্রুব দেখতে পায়, ক্ষিরীশ গাছের ছোট ছোট হলুদ পাতা ওদের মাথায় পুষ্পবৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে!

বাবাকে চোখের বাইরে চলে যেতে দেখেও আইরিনের অভিমান ভাঙে না।

থানা থেকে বেরিয়ে প্রথমে সেই ঝোপটার কাছে যেতে চেয়েছিল ধ্রুব। যেখানে ছোট্ট ব্রাউনিং অভিমানে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। ঝোপের হদিস পায়নি ধ্রুব। হাঁটতে হাঁটতে গভীর অরণ্যে পৌঁছে গেছে। এখানে ক'রাত ক'দিন কাটল কে জানে! সাপ হারিয়ে ফেলা সাঁপুড়ের অসহায়তার মতো এখন ব্রাউনিংকে খুঁজে যাচ্ছে ধ্রুব। ওটাই যেন ধ্রুবর চৈতন্য, জ্ঞান, স্পর্ধা। এই জঙ্গলটা বেশ পছন্দই হয়েছে ধ্রুবর। হানাহানি নেই, কাটাকাটি নেই। হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা কিছুই নেই। কখনও যদি বা কোনও জন্তুর মুখোমুখি হয়ে যায় ধ্রুব, যেমন খটাশ, ভাম, বেজি, শেয়াল... ওরাও ধ্রুবকে দেখে ভয় পায়। ধ্রুবও ওদের দেখে ভয় পায়। ভয়ের

সহাবস্থান। এ অরণ্যে কোথাও কোনও সরোবর আছে নিশ্চয়ই। রাতে বাবলার ডালে যখন চাঁদ এসে বসে, গাছতলায় শুয়ে ধ্রুব স্পষ্ট শুনতে পায়, একপাল হরিণের জল খাওয়ার ভিতু শব্দ।

ভোর হওয়ার আগেই একটা কোকিল মাথার ওপরের ডালে বসে তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করে। ধ্রুবকে অনেক কিছু মনে করিয়ে দেওয়ার মরিয়া উৎকট প্রচেষ্টা।

ঘুম থেকে উঠে ধ্রুব আবার খুঁজতে শুরু করে। অরণ্য ছেড়ে সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত পাখিরা উড়ে যায়। কী খুঁজছে, সেটাই ভুলে যায় ধ্রুব।

এই অরণ্যে সব ভাল, খিদে আসে, খিদে মরে যায়, খুব একটা জ্বালায় না। কবে যেন দুটো আম পেড়ে খেয়েছিল। আরও কী কী সব যেন খায় মনে পড়ে না ছাই। এখানে একটাই অসুবিধে, মাঝে মাঝে স্মৃতির বুজকুড়ির মতো চোখের সামনে ভেসে ওঠে কনভেয়ার বেল্ট, তাতে লতাপাতা জড়ানো। ভাঙা ট্রলি, আধখাওয়া টায়ার, ভাঙা পাওয়ার বক্স... ধ্রুব জানে এগুলো তার স্মৃতিভ্রম। এ অরণ্যে কোনও মানুষ আসে না। এ সব আসবে কোথা থেকে!

না না, ভুল হল। ক'দিন আগে একজন এসেছিল। ছেলেটাকে চিনতেও পেরেছিল ধ্রুব। গ্রিক ইতিহাস থেকে নেমে এসেছে। মহার্ঘ সভ্যতাকে দেখে, আদিমানবের মতো ধ্রুব লুকিয়ে গিয়েছিল আরও গভীর জঙ্গলে।

আর কেউ আসে না। ধ্রুব অভয়ারণ্যে কী যেন খুঁজে যায়।

কাঁধে একটা ঢাউস ব্যাগ নিয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে কাজল। দুটো কুড়ির লোকালটা ধরবে। মজিদপুরে থাকা তার হল না। বাবা সত্যিই একা সামলাতে পারছে না বিজনেস। নিজেই ডেকে পাঠিয়েছে। মামার বাড়ি আজও খুঁজে পায়নি কাজল। তাতে কোনও আক্ষেপ নেই। মজিদপুরের অনেক বাড়িঘর, সংসারের মধ্যে মামার বাড়ির আদল পেয়েছে। মজিদপুরে তাকে মাঝেমধ্যেই আসতে হবে আইরিনের জন্য। আইরিনের মনের অবস্থা খুব খারাপ। ওর বাবাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ক'দিন ধরে কাজলও খুঁজছে খুব। ওর বাবার ফ্যাক্টরিতে পর্যন্ত গিয়েছিল। জঙ্গলে চাপা পড়ে গেছে গোটা ফ্যাক্টরি শেড। আইরিনও খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়েছে। এখন সারাদিন বাড়িতেই থাকে। কথা প্রায় বলেই না।

লোকালটা ঢুকছে। রেডি হয় কাজল। কাঁধ থেকে ব্যাগটা হাতে নিয়ে ট্রেনে উঠতে যাবে, হঠাৎ শুনতে পায় সাইরেনের আওয়াজ। আসলে কারখানার ভোঁ। আগে কখনও মজিদপুরে এই আওয়াজটা শোনেনি কাজল। চতুর্দিক কাঁপিয়ে ডেকেই যাচ্ছে ভোঁ-টা। কী মনে হতে ট্রেনটা ছেড়ে দেয় কাজল। ব্যাগ কাঁধে তুলে

আবার মজিদপুরের দিকে ফিরতে শুরু করে। কপালে চিন্তার ভাঁজ, কোথা থেকে আসছে সাইরেনের তীব্র আওয়াজ।

আওয়াজটা আইরিনও পেয়েছে। তড়াক করে উঠে পড়ে বিছানা থেকে। ভোঁ-টা তার অচেনা নয়। দৌড়ে যায় রান্নাঘরে। ঠাম্মা গ্যাস জ্বালিয়ে কী যেন রান্না করছে। আইরিন বলে, ঠাম্মা শুনতে পাচ্ছ?

পাচ্ছি, তাই তো তোর বাবার জন্য চারটি রুটি করতে এলাম। দিয়ে আয়। ওকে ওখানেই পাবি।

পুতুলের বাবাও বেরিয়ে এসেছে বাড়ির বাইরে। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। এপাশ ওপাশ, মাথার ওপরে খুঁজছে কাঙ্ক্ষিত সেই আওয়াজটাকে।

পুতুল রান্নাঘরে গিয়ে মাকে বলছে, তাড়াতাড়ি শাড়ি পালটে নাও। বাবার ফ্যাক্টরি বোধহয় আবার খুলল। চলো দেখে আসি।

রজার কোম্পানির সমস্ত শ্রমিকের ঘরে পৌঁছে গেছে কারখানার সাইরেনের আওয়াজ। সবাই বেরিয়ে এসেছে। দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে, চাপা আনন্দে এগিয়ে চলেছে কারখানার দিকে। একে অপরের সঙ্গে দেখা হতে, আশ্বস্ত হচ্ছে। ভোঁ-টা মিথ্যে নয়। দ্বিগুণ উৎসাহে এগিয়ে আসছে তারা।

এই সাইরেনের উৎস আসলে ধ্রুব। কী যেন খুঁজতে খুঁজতে সে আজ সাইরেনের ঘরে পৌঁছে যায়। চোখের সামনে সাইরেনের সুইচ দেখে আর থাকতে পারেনি। প্রবল আবেগে চেপে ধরে সুইচ বটম। বাতাস কাঁপিয়ে বেজে ওঠে ভোঁ। ধ্রুবর ভীষণ আনন্দ হয়, ভীষণ! মানসচক্ষে দেখতে পায়, অভাবী বাড়িগুলো থেকে তার সহকর্মীরা বেরিয়ে আসছে। বাসের কন্ডাক্টার হয়ে-যাওয়া ক্যাশ অফিসার, ব্যাগ ছুড়ে এগিয়ে আসছে। অঘোরকাকা রিসর্টের নতুন মেঝেতে লাথি মেরে চলে আসছে। ধূপ বিক্রি করে যে, কুলি, রিকশাওয়ালা হয়ে যাওয়া সবাই সবকিছু ফেলে দৌড়ে আসছে।

চোখের জলে ধ্রুবর গাল ভিজে গেছে, জামাও ভিজছে। তবু বোতাম থেকে হাত সরাবে না ধ্রুব। শেষ কর্মীটি না আসা পর্যন্ত ভোঁ বাজিয়েই যাবে।

হয়তো এসব কিছুই ঘটছে না। কোনও আওয়াজই বেরোচ্ছে না সাইরেনের যন্ত্র থেকে। তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ধ্রুব সুইচ টিপে বসেই আছে। আপন মনে কাঁদছে, হাসছে। এই অরণ্যে এমন কেউ নেই যে ওকে বোঝাবে, ধ্রুব পাগল হয়ে গেছে।

অবুঝ মেয়ে

নন্দন হলের চাতালে দাঁড়িয়ে দারুণ একটা বিকেল নিভে যাওয়া দেখল মৈনাক। প্রায় ঘণ্টাখানেক হতে চলল, একজনের অপেক্ষায় সে এখানে দাঁড়িয়ে। ইতিমধ্যে সামনে দিয়ে হেঁটে গেছে ওর কাছাকাছি বয়সি অনেক প্রেমিকযুগল। যারা আশপাশের গাছতলায়, বেঞ্চে বসে, কমে আসা আলোর সঙ্গে তাল রেখে ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে। ব্যাপারটা যথেষ্ট অপমানজনক হলেও. আক্ষেপে কাহিল হয়নি মৈনাক। কারণ, আলো-আঁধারের এই অপূর্ব বিষাদ-মিলন তাকে অন্যমনস্ক রেখেছে। সত্যি বলতে কী, কলকাতায় যে এত সুন্দর, ঢিমেতালে সন্ধে নামে মৈনাক বহু দিন খেয়াল করেনি!

নন্দন-চত্বরের গাছে-গাছে পাখিরা ফিরে আসছে। তুমুল হইচই। ক্লান্ত চোখের পাতা তোলার মতো ভেপার আলোগুলো জ্বলে উঠতেই, পাখিদের পাঠশালা অন্ধকার জগতে চলে গেল। এই যে ফিলিং, যা অনেকটাই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের ওপর নির্ভরশীল, এটা সিনেমায় কতটা আনা যায়? মনে মনে ক্যামেরা প্লেসমেন্ট, লাইট নিয়ে ভাবতে শুরু করল মৈনাক। ইদানীং এই হয়েছে মুশকিল, যা কিছু ভাবছে, শেষ হচ্ছে ফিল্ম মেকিং-এ গিয়ে। বছর দু'-তিনেক আগেও অভ্যেসটা এ রকম ছিল না। দেদার দেশি, বিদেশি সিনেমা দেখত অন্তরের তাগিদে। মেকিং নিয়ে ভাবেইনি। মাস ছয়েক হল ইন্ডাস্ট্রিতে পা রেখেছে, তার পর থেকে অল্পক্ষণের মধ্যেই ছবির মুগ্ধতা কাটিয়ে টেকনিক্যাল ব্যাপারে মনোনিবেশ করে ফেলছে।

আবার এক বার ঘড়ি দেখে মৈনাক। ছ'টা বেজে দশ। আর একটু অপেক্ষা করবে কি? করাই উচিত। এত বড় একটা সুযোগ আসছে! ধরা যাক যদি আজ এখানে না থাকত, কী করত এই সময়টা? হয় বাড়িতে বসে ভিসিডি-তে সিনেমা দেখত অথবা বন্ধুদের খুঁজতে বেরোত। দু'-একজন ছাড়া বন্ধুরা এখন মোটামুটি সবাই চাকরি, ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত। যারা পড়ে আছে, সন্ধেবেলাটা তাদের টিউশান পড়ানোর পিক-আপ টাইম। তবে মৈনাক যে কাঠ-বেকার, তা নয়। ক'দিন আগেই রানাদার একটা তথ্যচিত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের কাজ করেছে, হাজার সাতেক টাকা কামিয়েছে সেই সূত্রে। তা দিয়েই আপাতত হাত খরচটা চলছে। যদিও

ফান্ডের অবস্থা দুর্বল হচ্ছে ক্রমশই। সম্প্রতি রাজা সাইজ ছেড়ে প্রজা সাইজ সিগারেটে ফিরতে হয়েছে। এক্ষুনি একটা কাজ না পেলেই নয়।

কাচের চুড়ি ভাঙার মতো খিলখিলে হাসিতে মন ফিরে আসে মৈনাকের। একটা পেয়ার সামনে দিয়ে অলস পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। হাসছে মেয়েটা। চোখের কোণ দিয়ে দেখছে মৈনাককে। যুগলকে চিনতে পারে মৈনাক। বেশ কিছুক্ষণ আগে এরাই হেঁটে গিয়েছিল গাছতলার দিকে। মেয়েটা তখন প্রেমিকের থেকে একটু পিছিয়ে সরাসরি মৈনাকের দিকে তাকিয়েছিল। চাউনিটা ভবিষ্যৎ দাম্পত্য পোড়ানোর পক্ষে যথেষ্ট। এরাই বরের স্কুটারের পেছনে বসে কনস্ট্যান্ট অন্য পুরুষের দিকে তাকাতে থাকে। মেয়েটাকে আগের বার পাত্তা না দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল মৈনাক। এখন তারই শোধ নিচ্ছে। হাসিতে মিশে আছে অব্যক্ত শ্লেষ, কী হল, এখনও এল না আপনার সঙ্গিনী!

এদিকে মৈনাক নিজেও জানে না, যার জন্য সে অপেক্ষা করছে, তিনি নারী না পুরুষ। আগে কখনও তাঁকে দেখেনি মৈনাক। কথা আছে তিনিই মৈনাককে চিনে নেবেন। এমন হয়নি তো, মৈনাককে চিনতে না পেরে চলে গেছেন তিনি। আশঙ্কাটা মুহূর্তের জন্য বিপন্ন করে মৈনাককে। তাঁর সঙ্গে দেখা না হলে বড় একটা কাজ হাতছাড়া হয়ে যাবে।

চুড়ি ভাঙা হাসি পাখির কূজনে মিশে গেছে। আবার একা অধীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে মৈনাক। তাকে না চেনার কোনও কারণ নেই। রানাদা যেমনটি বলেছিলেন, সেই পোশাকে, সময়ে, স্থানে দাঁড়িয়ে আছে সে। দুপুর চারটে নাগাদ বাড়িতে ফোন করেন রানাদা, মৈনাক রে, একটা ঝামেলায় পড়ে গেছি।

কীরকম?

এক প্রোডিউসারের সঙ্গে মিটিং ফিক্সড হয়েছিল বিকেল পাঁচটায়, ঘণ্টাখানেক আগে ফোন করল বিদিশা সেন। মুম্বই থেকে এক দিনের অ্যাড শুটিঙে এসেছে। আমার সামনের ছবিটা নিয়ে কথা বলতে চায়। ওকেই তো নায়িকা করব ভেবেছি। মুম্বইতে ফোন করে প্রাইমারিলি সে কথা জানিয়েওছিলাম ওকে। আমি যে এখন কার কাছে যাই!

আমায় কী করতে হবে? নির্বিকার গলায় জানতে চেয়েছিল মৈনাক। ও প্রান্তে রানাদা বলেন, তুই প্রোডিউসারটা রিসিভ কর। ভজিয়ে ভাজিয়ে আধ ঘণ্টাটাক সামাল দে। কোনও রেস্টুরেন্টে গিয়ে বোস। আমি এ দিকের কাজ সেরে, প্রোডিউসারের সেল ফোনে রিং করে জেনে নেব তোরা কোথায় আছিস। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছে যাব।

প্রোডিউসারকে কোথায় রিসিভ করতে হবে? জিজ্ঞেস করেছিল মৈনাক। উত্তরে রানাদা বলেন, এক কাজ কর, তুই নন্দনের সামনে গিয়ে দাঁড়া। উনিই তোকে ডেকে নেবেন।

আমাকে চিনবেন কী করে?

তোর সেই বিখ্যাত হলুদ শার্টটা পরে দাঁড়াবি। ঠিক পাঁচটার সময়। বাকি ডিটেল আমি দিয়ে দেব। আমার যদি আসতে দেরি দেখিস, নেক্সট ছবির গল্পটা বলতে থাকবি। বিদিশাকে কাস্টিং করছি সেটাও বলিস। রাখছি।

রানাদার ফোনের পর, যেমন হয়ে থাকে, সব পাওয়া গেলেও, হলুদ জামাটা পাওয়া যাচ্ছিল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর মা বলল, মনে হয় রামেশ্বরের কাছে ইস্ত্রি করতে দেওয়া আছে। যা তো এক বার।

ভাগ্যিস ধোপাখানা খোলা ছিল। সেখান থেকে শার্ট নিয়ে ঠিক পাঁচটা বাজতে পাঁচে মৈনাক নন্দনের সামনে উপস্থিত। কিন্তু এখনও তাঁর দেখা নেই। এই ছাব্বিশ বছরের জীবনে কোনও মেয়ের অপেক্ষাতেও এতটা সময় দেয়নি সে। তা হলে কি একটি মেয়ের থেকেও প্রোডিউসার দামি হয়ে গেল মৈনাকের জীবনে! একই সঙ্গে মৈনাক অবাক হয়, রানাদার সঙ্গে অতক্ষণ কথোপকথনে একবারও প্রোডিউসারটির জেন্ডার প্রকাশ পায়নি। হে ঈশ্বর, প্রোডিউসারটি যেন অতি সুন্দরী, সামান্য বয়স্কা, একটি গর্জাস নারীই হয়। তা হলে আমার প্রতীক্ষা সার্থক হবে।

মৈনাকের আকাঙ্ক্ষায় জল ঢেলে পাশ থেকে পুরুষ কণ্ঠ বলে ওঠে, আপনি নিশ্চয়ই মৈনাক চ্যাটার্জি? আই মিন রানা মজুমদারের...

হ্যাঁ, আমিই। নমস্কার। মৈনাকের গলায় হতাশার ছোঁয়া। ভদ্রলোক অন্য মানে করে বলে ওঠেন, আই অ্যাম রিয়েলি ভেরি সরি ফর বিইং লেট। অ্যাকচুয়ালি রানাবাবু যখন ফোনে জানালেন, ওঁর বসতে একটু দেরি হবে, ভাবলাম, ছোট একটা কাজ সেরে নিই। সেখানেই লেট হয়ে গেল।

ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে বিনয়টা একদম যাচ্ছে না। প্রায় ছ'ফুট হাইট, কাঁচা-পাকা ফ্রেঞ্চ কাট, বয়স মধ্য চল্লিশ। মৈনাক বলে, ইটস, অল রাইট। চলুন, কোথাও বসা যাক। রানাদা একটু পরেই এসে পড়বেন।

প্রোডিউসার বলেন, রানাবাবু ফ্রি হয়ে ক্যামাক স্ট্রিট, থিয়েটার রোড ক্রশিং-এ আমাদের জন্য ওয়েট করছেন। এই মাত্র ফোন এসেছিল। চলুন ওঁকে গাড়িতে তুলে নিই।

মৈনাক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভদ্রলোকের পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। যাক,

ভদ্রলোককে ইমপ্রেস করার দায়িত্ব তার আর রইল না। কাজটা যতটা বোরিং, ততটাই কঠিন। প্রোডিউসার পটানো একটা আর্ট। এলেম সবার থাকে না। রানাদা দেরিতে হলেও ব্যাপারটা এখন বুঝেছেন। তবে এই প্রোডিউসারটি ততটা দমওলা মনে হচ্ছে না। কারণ, মৈনাকের মতন নগণ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরকে কেউ পিক-আপ করতে আসে না।

মৈনাকরা পৌঁছে গেছে পার্কিং জোনের শেষ গাড়িটার সামনে। স্যান্ট্রো। ড্রাইভার দরজা খুলে দিল। পিছনের সিটে মৈনাককে প্রথমে উঠতে দিয়ে ভদ্রলোক উঠে এলেন। গাড়ি চলতে শুরু করেছে। গাড়ির কাচ নামিয়ে ভদ্রলোক পকেট থেকে ইন্ডিয়া কিংস বার করলেন। প্যাকেটের মাথা খুলে মৈনাকের দিকে বাড়াতে না বাড়াতেই, তৃষ্ণার্তর মতো একটা সিগারেট তুলে নিল মৈনাক। আবার কি কিং সাইজের দিন আসছে?

মৈনাকদের গাড়ি এখন ক্যামাক স্ট্রিট ধরেছে। প্রোডিউসারের সঙ্গে প্রাথমিক আলাপে জানা গেছে, নাম রাহুল বোস। মুম্বইয়ে থাকেন। পেশা, ব্যবসা। শ্বশুরবাড়ি কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিটে। এখানে এলে ওই বাড়িতেই থাকেন। —এই সব তথ্যে ভদ্রলোকের টাকার ক্ষমতা এখনও বোঝা যায়নি। রানাদাই যা বোঝার বুঝবে, ভেবে জানলার বাইরে তাকিয়ে আছে মৈনাক। আর একটু এগোতেই ক্রশিং-এর মুখে রানাদাকে দেখা গেল। সামনে একটা ইয়াং হ্যান্ডসাম ছেলে, খুব ঘাড়-হাত নেড়ে রানাদার সঙ্গে কথা বলছে। রানাদাকে কখনও একলা দেখা যায় না। সব সময় সামনে পিছনে কেউ না কেউ ঘুরছে। বাড়িতেও অহরহ ফোন বাজে। একজন ক্রিয়েটিভ লোক হয়ে কখন যে ভাবনা-চিন্তা করে কে জানে!

গাড়ি রানাদাদের ক্রশ করে যাচ্ছে দেখে, তাড়াতাড়ি থামাতে বলে মৈনাক। এবং একই সঙ্গে বুঝতে পারে রাহুল বোস রানাদাকে কখনও দেখেননি। কথাবার্তা যা হয়েছে ফোনে ফোনে।

হ্যান্ডসামটিকে ছেড়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছেন রানাদা। মুখে দামি লন্ড্রির ইস্ত্রি করা হাসি। প্রোডিউসারের সামনে এ রকমই হাসতে হয়। ফিল্ম পরিচালনার পাশাপাশি মৈনাক এ সবও মন দিয়ে শিখছে।

গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভারের পাশের সিটে যায় মৈনাক। রাহুল বোসের কাছে সরিটরি চেয়ে পিছনের সিটে বসেন রানাদা। ড্রাইভারকে থিয়েটার রোড ধরতে বলে, রাহুল বোসের উদ্দেশে বলেন, চলুন, কাছেই একটা ক্লাবের মেম্বার আমি। ওখানেই গিয়ে বসি।

—ভালই তো, কলকাতায় এত দিন আসছি, কোনও ক্লাবে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। বললেন, রাহুল বোস। মৈনাকের ধারণা আরও জোরালো হয়, প্রোডিউসারটা ফাঁপা মাল। কলকাতায় শ্বশুরবাড়ি হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কোনও ক্লাবে যায়নি! মৈনাকেরও অবশ্য দেখা হয়নি, ক্লাব বস্তুটা কেমন? শুনেছে অনেক গল্প। মৈনাক না যেতেই পারে, তার সেই স্ট্যাটাস নেই। যদিও সিনেমা লাইনে আসার পর ঘটনাচক্রে অনেক ঘ্যামা ঘ্যামা জায়গায় পৌঁছে যাওয়া যাচ্ছে। তাজ হোটেল থেকে এরোপ্লেন অব্দি হয়ে গেছে। ক্লাবটাই বাকি ছিল। আজ সেটাও দেখা হয়ে যাবে।

ব্যাপারটা যত সোজা ভাবা গিয়েছিল, দেখা গেল তা নয়। দারোয়ানের সেলাম নিয়ে গাড়ি ক্লাব লনে দাঁড়াতেই নেমে এল মৈনাকরা। পিছনে আরও দুটো গাড়ি জমে গেছে। রানাদা প্রথমেই মৈনাকের পায়ের দিকে তাকালেন। মুখে একরাশ বিরক্তি, এ কী, তুই চটি পরে এসেছিস কেন? জানিস না, ক্লাবে জুতো ছাড়া ঢুকতে দেয় না।

ধমকানোটা রানাদার ইদানীং অভ্যেসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। মৈনাক যতটা সম্ভব নিচু গলায় বলে, ক্লাবে আসা হবে, তাই তো জানতাম না।

হতেও তো পারে, তৈরি থাকিস না কেন? একটুও না থমকে দুর্বল যুক্তি দিলেন রানাদা। এ দিকে পিছনে গাড়ি দুটো হর্ন দিচ্ছে পার্কিং-এ যাবে বলে। মৈনাক বলে, তা হলে থাক, আপনারা যান।

না, তা হয় না। এই মিটিং-এ তোকে ভীষণ দরকার। বলেন রানাদা। গেটে গাড়ি জমে যাচ্ছে দেখে পাগড়ি বাঁধা দারোয়ান এগিয়ে এল সমস্যাটা বুঝতে, তার মানে এই সুযোগেও ক্লাবে ঢোকা হল না মৈনাকের। অদ্ভুত সব পুরনো নিয়ম!

সমস্যাটা আশ্চর্যজনক ভাবে সমাধান করলেন রাহুল বোস। নিজের ড্রাইভারকে কী যেন বলতেই, গাড়ি চলে গেল পার্কিং জোনে। খালি পায়ে জুতো হাতে ফিরে এল ড্রাইভার। রাহুলবাবু বললেন, নিন, ওর জুতোটা পরে নিয়ে, আপনার চটি ওকে দিন।

নির্দেশ মতো তড়িঘড়ি কাজটা সারল মৈনাক। রানাদার মুখে স্বস্তি। কিন্তু এ কী, দু' পা এগোতেই মৈনাকের মনে হল, জুতো নয়, যেন কুমির কামড়ে ধরেছে দুটো পা।

হাঁটায় ল্যাংচানো ভাবটা গোপন করা-যাচ্ছে না। ওই অবস্থাতেই রানাদাদের অনুসরণ করে ক্লাবের প্রথম ঘরটায় ঢোকে মৈনাক। বিশাল হলঘর। ঝাড়লণ্ঠন,

দেওয়ালে বড় বড় পেন্টিং, ঢাউস ঢাউস সোফা। ঘরের দু' কোণে জায়ান্ট স্ক্রিনের দুটো টিভি। ঝাঁ-চকচকে পুরুষ, বিপদজ্জনক কাটিং-এর পোশাক পরে মহিলারা সাবলীল ঘুরে বেড়াচ্ছেন, শাড়ি পরেছেন অনেকেই, তবে সেটা বাহুল্য মনে করেই। হুটোপাটি করছে বাচ্চারা। বেশ একটা উৎসব বাড়ি টাইপের ভাব। পরিবেশটা খারাপ লাগে না মৈনাকের। একটা ব্যাপার খুব অবাক করছে, এখানকার সবার চেহারায় এক ধরনের অদ্ভুত জৌলুস লক্ষিত হচ্ছে! কিছু বেমানান পিস যে মিশে নেই তা নয়, সেই সব পুরুষদের দেখলেই পায়ের দিকে চোখ চলে যাচ্ছে মৈনাকের, কী পরে আছে, চটি না জুতো?

মেম্বারদের সঙ্গে রানাদার বেশ ভালই দহরমমহরম আছে, দু'পা এগোতে না এগোতেই একজন করে এসে কথা বলে যাচ্ছে। রাহুল বোসের সঙ্গে প্রত্যেকেরই আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন রানাদা। কে বলবে রানাদাই মাত্র মিনিট দশেক আগে রাহুলবাবুকে চাক্ষুষ করেছেন।

হলঘরের পর গার্ডেন। প্যান্ডেল খাটিয়ে মাইক সহযোগে কী যেন একটা হচ্ছে। একটু ফাঁকা হতে পেরে রানাদা বললেন, গ্লাসরুমে যাওয়া যাক।

ডানহাতি কাচঘরে বসে মেম্বাররা মদ্যপান করছে। দরজা ঠেলে ঢুকতেই সার্ভিস বয় মৈনাকের পায়ের দিকে তাকাল। রানাদাই বলে উঠলেন, সব ঠিক আছে মৃণাল, অত দেখতে হবে না। আমাদের একটা করে স্কচ দাও।

আজ একদম নতুন স্কচ খাওয়াব দাদা, কোম্পানি রিসেন্টলি লঞ্চ করেছে। আজ ডিসকাউন্ট দিচ্ছে আমাদের ক্লাবে। বলল মৃণাল। ফাঁকা একটা টেবিলের দিকে যেতে যেতে রানাদা বললেন, যা ভাল বোঝো দাও।

চেয়ারে বসে এক রাউন্ড গলা ভিজিয়েই রানাদা চলে এলেন কাজের কথায়। মৈনাককে বললেন, আমাদের সামনের ছবির গল্পটা ওঁকে বলেছিস?

না, সময় হয়নি, বলে মৈনাক।

তা হলে তুই জিস্টটা ওঁকে বল। আগে দেখতে হবে গল্পটা ওঁর ভাল লাগে কি না, তবেই ইনভেস্টমেন্টের প্রশ্ন আসছে।

সেকেন্ড পেগে এক চুমুক মেরে মৈনাক গল্পটা বলতে যাবে, দেখে, পাশে বসা রাহুল বোস তার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছেন। একটু থমকায় মৈনাক। ক্লাবে ঢোকার পর থেকে ভদ্রলোক একটু আড়ষ্ট হয়ে আছেন, কথাও বলছেন কম। হয়তো পরিস্থিতির সঙ্গে মানাতে সময় নিচ্ছেন। কিন্তু এখন এই হেঁয়ালি মার্কা হাসির কী অর্থ? এর মধ্যেই নেশা হয়ে গেল না কি! —মৈনাকের অবস্থাটা বুঝে নিয়ে রানাদাই শুরু করলেন, আসলে হয়েছে কী, ছবিটার ফিনান্স আমার জোগাড়

হয়েই গিয়েছিল। মুম্বইয়ের বিদিশা খুবই ইন্টারেস্টেড লিড রোলটা করার জন্য। হিরোইন বেসড গল্প। আজই কথা হল বিদিশার সঙ্গে, প্রোডিউসার জোগাড় করে দেবে ও নিজেই। তবে ওয়ান কন্ডিশান, ওর বয়ফ্রেন্ড আয়ান লতিফকে ওর অপজিটে নিতে হবে। ছেলেটা দুটো হিন্দি ছবিতে কাজ করেছে বোগাস অ্যাক্টর। পেটে কামান দাগালেও মুখ থেকে একটা বাংলা শব্দ বেরবে না। ডাব করাতেই হবে। একে অ্যাক্টর খারাপ, তার পর ডাবিং। ছবির মেরিট এখানেই বেশ কিছুটা লস হয়ে যাবে। ওই ছেলেটার সঙ্গেই তো একটু আগে ক্যামাক স্ট্রিটের মোড়ে কথা বলছিলাম। একদম নাছোড় হয়ে পড়েছে।

রানাদার এত কথায় কোনও বিকার নেই রাহুলবাবুর। মুখে সেই মিটিমিটি হাসি লেগেই আছে। মাঝে দু'-তিন বার চানাচুর থেকে বাদাম তুলে খেয়েছেন। মৈনাকের সন্দেহ হয়, লোকটা বোধহয় মজা নিতে এসেছে। জমা কিছু টাকা আছে হয়তো, সেই দেখিয়েই ডিরেক্টরদের সঙ্গে গুলতানি মারছে। টাইম পাস। সিনেমা লাইনে এ ধরনের ছদ্ম প্রোডিউসারের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু এদেরকে তো রানাদা ভালই চেনেন। কেন মিছিমিছি নষ্ট করছেন সময়। যদিও পরিচালক হিসেবে রানাদার কেরিয়ারগ্রাফ খুব একটা সুবিধের নয়, দুটো ফিচার ফিল্ম করেছেন, না আর্ট, না কমার্শিয়াল। দুটোরই পয়সা ওঠেনি। প্রাইজও না। এলিট ক্লাসের ছবিটা ভাল লেগেছে। কলকাতার হলে পাঁচ, ছ' সপ্তাহ চলেছিল। গ্রামে সুপার-ডুপার ফ্লপ। —মৈনাক নিরুৎসাহ হয়ে অন্যমনস্ক হলেও, রানাদা হাল ছাড়েননি, এক চুমুকে এক পেগ মেরে রাহুলবাবুকে বলেন, আপনি কি আমাদের গল্পটা শুনবেন, না কি নিজের কোনও আইডিয়া আছে?

অপরপক্ষে কোনও উত্তর নেই। একটা করে বাদাম তুলে নিচ্ছেন, গলা ভেজাচ্ছেন ছোট ছোট চুমুকে। তবে মুখে সেই রহস্যময় হাসিটা আপাতত উধাও। মৈনাক অধৈর্য হয়ে টেবিলে রাখা রাহুলবাবুর প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরায়। পরিস্থিতিটা সংক্ষিপ্ত করতে রানাদা বলেন, আপনি কত টাকা ইনভেস্ট করতে পারবেন, তার যদি একটা আইডিয়া দেন, সেই অনুযায়ী গল্প বাছতে পারি। সামনের ছবিটার বাজেট একটু বেশিই হবে। বিদিশাকে না নিলেও, মুম্বইয়ের অন্য কোনও মেয়েকে দরকার। ওই ক্যারেক্টার করার মতো মেয়ে টালিগঞ্জে নেই।

এতক্ষণে কথা বলার জন্য প্রস্তুত হলেন রাহুলবাবু। সিগারেট বার করে, প্যাকেটের গায়ে টোকা মারতে মারতে বললেন, বাজেটটা আমার কাছে খুব একটা ফ্যাক্টর নয়, সে আপনি বিদিশা, রানি, ঐশ্বর্য যাকেই নিন। আমি পুরোটা·না

পারলেও, আমার এক এনআরআই রিলেটিভ আছে, বাকিটা সে ফিনান্স করবে। আমার কন্ডিশান একটাই, গল্পটা নিখাদ প্রেমের গল্প হতে হবে।

সবে গ্লাসটা ঠোঁটে ছুঁইয়ে ছিল মৈনাক, শর্ত শুনে চলকে পড়ে যাচ্ছিল দামি স্কচ।

রানাদার এক্সপ্রেশানটাও হয়েছে দেখার মতো, চোখ বড় বড়, মুখ হাঁ। এই অভিব্যক্তিতে রানাদাকে সহজে পাওয়া যায় না। ক্যামেরা থাকলে ছবি তুলে রাখা যেত। বাই চান্স রানাদা গ্রেট ডিরেক্টর হয়ে উঠলে, ফোটোটার তখন অনেক ভ্যালু। মৈনাকের বুঝতে অসুবিধে হয় না, মিটিং এখন শেষ পর্যায়।

নিজেকে সামলে নিতে রানাদা পর পর দুটো চুমুক মারলেন গ্লাসে। তারপর বিস্ময়ের সঙ্গে বিরক্তি মিশিয়ে রাহুলবাবুর উদ্দেশে বললেন, আপনি অবভিয়াসলি ভুল ডিরেক্টরের কাছে এসে পড়েছেন। আমি সি গ্রেডের প্রেমের ছবি করি না।

আমি তো সে রকম ছবি করতে বলিনি। নিরুত্তাপ গলায় বললেন রাহুল বোস।

তা হলে কি ক্লাসিক বা হিস্টোরিক্যাল কিছু? যেমন, লায়লা মজনু, হির রনঝা, সংযুক্তা পৃথ্বীরাজ।

রানাদার প্রশ্নের উত্তরে রাহুলবাবু বলেন, না, তাও না। আমি চাইছি এই সময়ের ওপর একটা প্রেমের ছবি। এবং ছবিটা অবশ্যই বাংলা ভাষায় হতে হবে।

রানাদার কপালে ভাঁজ, বিভ্রান্ত দৃষ্টি। বলেন, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, আমি কি জানতে পারি, আপনি এই সাবজেক্ট-এর ওপর স্টিক করে আছেন কেন?

সরি, ইটস্ টোটালি পার্সোনাল। বলে চুপ করে গেলেন রাহুলবাবু। হতাশ ভঙ্গিতে গ্লাস তোলেন রানাদা, খেয়াল নেই গ্লাসটা ফাঁকা। রাহুলবাবু আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলেন, আপনি এত ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হচ্ছেন কেন বুঝতে পারছি না! আমি তো বিশেষ কিছু চাইছি না। একটা ক্লিন লাভ স্টোরি। কোনও ইন্টেলেকচুয়াল জাগলারি নয়।, আমার প্রাইজও দরকার নেই, ফিল্মটা হিট না করলেও চলবে।

মৈনাক এক বার ভাল করে দেখে নেয় রাহুল বোসকে, নেশায়, না কি বিশেষ কোনও অভিসন্ধিতে, অথবা নিছক মজা করার জন্যই কথাগুলো বলছেন? নাঃ, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সিরিয়াস-ই মনে হচ্ছে। রাহুল বোস আবার বলে ওঠেন, দেখুন রানাবাবু, আমি জানি আমার ডিমান্ড খুবই সিম্পিল। এবং এটাও জানি এখনকার ডিরেক্টরদের মধ্যে আপনিই কাজটা সবথেকে ভাল করতে পারবেন। সিডিতে আপনার দুটো ছবি দেখে, আমার তেমনটাই মনে হয়েছে। সেই কারণেই

আপনার সঙ্গে আমি যোগাযোগ করি। আপনি যেমন ভাল ডিরেক্টর, অলসো এ গুড স্টোরি টেলার।

রানাদার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে কোনও কমপ্লিমেন্ট তাঁকে ছুঁচ্ছে না। সত্যিই গভীর সংকটে পড়েছেন। রাহুল বোসের প্রস্তাবটা শুনতে নিরীহ হলেও. আসলে একটা কঠিন ধাঁধা।

বেয়ারা আর একটা করে পেগ ঢেলে দিয়ে গেল। গ্লাস তুলে নিয়ে রানাদা মরিয়া চেষ্টায় রাহুলবাবুকে বললেন, আপনার নিজের কাছে কি ও রকম কোনও স্টোরি লাইন আছে?

না। গল্প আপনিই ঠিক করবেন।

রাহুলবাবুর কথা শেষ হতেই মাথা নিচু করে নেয় মৈনাক। কেন না ও ভাল করেই জানে, রানাদা এখন ওর দিকেই তাকিয়ে থাকবেন। গল্প উপন্যাস পড়া ইদানীং ছেড়েই দিয়েছেন রানাদা। প্রোডিউসার জপাতেই এখন তাঁর সময় চলে যায়। বিভিন্ন লোকের কাছে গল্পের সিনপ্সিস শোনেন। পছন্দ হলে. পড়তে দেন বউদি আর মৈনাককে। দু'জনের ওপর রানাদার দারুণ ভরসা। বেশি ক্ষণ মাথা নামিয়ে রাখা গেল না। রানাদা বললেন, কী রে তোর নলেজে সে রকম কোনও গল্প আছে?

মুখ তুলে দ্রুত ভাবতে থাকে মৈনাক, প্রথমেই বেশ কিছু বিদেশি ছবির কথা মনে আসে. সামার অফ ফর্টিটু, গন উইথ দ্য উইন্ড, রোমিও জুলিয়েট অ্যান্ড ডার্কনেস, এতে রোমিও জুলিয়েট সশরীরে নেই, সেকেণ্ড ওয়র্ল্ড ওয়ারের প্রেক্ষাপটে দারুণ প্রেমের ছবি। তার পরই হিন্দিতে এক দুজে কে লিয়ে, সাদমা... বাংলায়, বালিকা বধূ, শ্রীমান পৃথ্বীরাজ, ... ভাবনার মাঝেই রাহুলবাবু যেন পড়ে নেন মৈনাকের মনের কথা, বলে ওঠেন, পুরনো সিনেমার রি-মেক কিন্তু চলবে না। প্রেজেন্ট সোশাল স্ট্রাকচারের মধ্যেই গল্পটা থাকতে হবে। উই ওয়ান্ট টু প্রুভ দ্যাট দ্য লাভ স্টিল এগজিস্টস্।

এই সময় মৈনাককে অবাক করে রানাদা বলে ওঠেন, সে তো বটেই। আপনি তো আগেই বলেছেন।

রানাদাকে রাহুলবাবুর পক্ষ নিতে দেখে, বেশ অসহায় বোধ করে মৈনাক। শর্ত অনুযায়ী পুরনো সাহিত্যও চলবে না। তার মানে এখনকার সাহিত্যের কথা ভাবতে হয়। সাময়িক সব গল্প, উপন্যাস পড়া কারওর পক্ষেই সম্ভব নয়, তবে মোটামুটি মৈনাক যতটুকু পড়েছে, তার মধ্যে আংশিক প্রেম থাকলেও, সেগুলো কখনওই নিটোল প্রেমের গল্প নয়। তা হলে?

কী রে, খেয়াল পড়ছে কিছু? আবার তাড়া দেন রানাদা। চোখে আর্ত দৃষ্টি। এ রকম দরাজ একটা প্রোডিউসার পেয়েও হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, এটা ঠিক মেনে নিতে পারছেন না। আপশোশ মৈনাকেরও হচ্ছে, তারও এক্ষুনি কিছু রোজগার দরকার। এ দিকে রাহুলবাবুকে ভুলভাল কোনও গল্প দিয়ে ভজানো যাবে না। যথেষ্টই বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ মানুষ। এই ধরনের সজাগ, সচেতন মানুষ হঠাৎ প্রেমের ছবি করার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছেন কেন, আন্দাজ করতে পারে না মৈনাক। ব্যাপারটা বেশ রহস্যজনক। রহস্য ভেদে না হয় পরে যাওয়া যাবে, আপাতত বড় অসহায় বোধ করে মৈনাক। গ্লাসরুম এখন ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার। এসির ঠান্ডাটাও অসহ্য ঠেকছে। দুই মধ্য চল্লিশ ছাব্বিশ বছরের কাঁধে গুরুদায়িত্বটি চাপিয়ে অসহায় অপেক্ষায় আছেন।

হঠাৎ এক আমোদপ্রিয়, রঙিন জামা পরা বৃদ্ধ এসে রানাদার পিঠে চাপড় মারেন, আরেঃ রানা! কত ক্ষণ? ঘাপটি মেরে বসে আছ বেশ!

সুযোগটা কাজে লাগায় মৈনাক বলে, আমি একটু বাথরুম থেকে ঘুরে আসছি।

চেয়ার থেকে উঠে আসতেই টের পায়, কুমিরটা এখনও পায়ে কামড়ে আছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে গ্লাসরুমের বাইরে আসে মৈনাক। এখানে বাতাস অনেক ফ্রেশ। বুক ভরে শ্বাস নেয় মৈনাক। সামনে দিয়ে এক বেয়ারাকে যেতে দেখে, টয়লেটটা কোথায় জানতে চায়। হাতের ইশারায় হল-এর পাশে সরু প্যাসেজটা দেখিয়ে দেয় বেয়ারা।

ইউরিনালে দাঁড়িয়ে হালকা বোধ করে মৈনাক। ঝিমঝিমে নেশা টের পায় শরীরে। নেশাটা তার মানে মাঠে মারা যায়নি। কত দামি জিনিস!

পাশের খোপে হঠাৎ নাক টানার শব্দ পায় মৈনাক। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, একটা থমথমে মুখের মাখনরঙা লোক পেচ্ছাপ করতে করতে কাঁদছে। আহা, বেচারা! কোনও কারণে খুব দুঃখ পেয়েছে হয়তো। মৈনাকের এক বার বলতে ইচ্ছে হয়, এত ওয়াটার লস করছেন স্যার, ডিফিসিয়েন্সি হয়ে গেলে স্যালাইন দিতে হবে যে!

বলে না। লোকটাকে একলা থাকতে দিয়ে বেসিনের কাছে যায় মৈনাক। ঘাড়ে-মুখে জল দিয়ে, রুমালে মোছে। আয়না দেখে, আঙুল চালিয়ে চুলটাও আঁচড়ে নেয়। নিজের অনিন্দ্য সুন্দর চেহারাটার দিকে তাকিয়ে এই প্রথম তার গ্লানি বোধ হয়, ইস্, এতদিনেও একটা জমাটি প্রেম কবতে পারলাম না! অনেক মেয়ের সঙ্গেই তার আলাপ-পরিচয় হয়েছে। ডেটিং-ও হয়েছে কয়েকজনের সঙ্গে, কিন্তু. সে সবই সময় কাটানো ছাড়া আর কিছু নয়। সব মেয়েকেই এক রকম লাগে মৈনাকের, চাওয়া দেওয়া সব এক।

যখনই কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ পেয়েছে মৈনাক, মেয়েদের দিকে ফিরেও তাকায়নি। উপেক্ষাটা সহজেই টের পেয়েছে মেয়েরা, তাই আজ পর্যন্ত মৈনাকের জন্য পাগল হয়নি কেউ। মৈনাকেরও এতদিন অব্দি কোনও মেয়ের জন্য মনটা রিনরিন করে ওঠেনি। কখনও মনে হয়নি অমুক মেয়েটাকে না দেখলে দিনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। অথচ অল্প কিছু শরীরী অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যেই হয়েছে মৈনাকের। ওই সব অভিজ্ঞতাই প্রেমের রাস্তাকে ভঙ্গুর করে। এ রকমটা যদি না হত, আজ সহজেই নিজের জীবনের গল্পটাকে একটু এ দিক ও দিক করে খাইয়ে দেওয়া যেত প্রোডিউসারকে। কেন এমন হল আমার জীবন! আমি কি তা হলে প্রেম বোধ হীন? নিজের প্রশ্নে নিজেই বড় বিপন্ন বোধ করে মৈনাক। বেসিনের আয়না মারফত ক্রন্দনরত লোকটাকে খোঁজে। লোকটা কি প্রেমে আঘাত পেয়ে কাঁদছিল? —ইউরিনাল এখন ফাঁকা। টয়লেট থেকে বেরিয়ে আসে মৈনাক।

হলঘর এখন আরও জমজমাট। একে তাকে পাশ কাটাতে কাটাতে হঠাৎ এক মহিলার সামনে মৈনাক থমকে দাঁড়ায়, পারমিতাদি না? হ্যাঁ মৈনাকের ধারণাই ঠিক। প্রায় পনেবো না কি তার থেকেও বেশি বছরের প্রলেপ পারমিতাদিকে আরও উজ্জ্বল করেছে, অপরিচিত করে দিতে পারেনি।

পারমিতাদির ভ্রূ প্রথমে কুঁচকে গেলেও, এখন একমুখ হাসি। মৈনাক সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই বলে ওঠে, তুই এখানে. কী ব্যাপারে?

এই একজনের গেস্ট হয়ে এসেছি, একটা দরকারে। লাজুক গলায় উত্তর দেয় মৈনাক।

বাবাঃ, আমাদের মনু এত বড় হয়ে গেছে, ক্লাবেও আসছে! বলে পারমিতাদি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক কোটপ্যান্টের কনুই ধরে টানে। ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়ান। হিসেব মতো পারমিতাদির হাজব্যান্ড হওয়া উচিত। নামটা মনে পড়ছে না মৈনাকের, চেহারাটাও ভুলে গিয়েছিল।

পারমিতাদি বলে, সলিল একে চিনতে পারছ? তোমার অবশ্য না চেনারই কথা। সেই বোধহয় বিয়ের সময়ই একবার দেখেছিলে।

সলিলবাবুর মুখে আলাপি হাসি। হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করলেন মৈনাকের সঙ্গে। পারমিতাদি বলে যাচ্ছে, ও হচ্ছে, আমাদের পাড়ার চ্যাটার্জিবাড়ির ছেলে। বিনয়কাকা ওর বাবা ...

আরও অনেক কিছুই বলে যাচ্ছে পারমিতাদি, বহু দিন পর বাপের বাড়ির পাড়ার কাউকে পেলে যা হয়। পারমিতাদি একটু যেন লোক-দেখানো গয়না পরেছে, ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় চকচক করছে সব। ক্লাবের বেশিরভাগ বিবাহিতা

মহিলারই অত্যধিক গয়না পরার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। সাইকোলজিটা ঠাহর করতে পারছে না মৈনাক।

এক দফা কথা শেষ করে, পারমিতাদি একটু সরে দাঁড়াল, আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা যে মেয়েটিকে সামনে নিয়ে এল, তাকে দেখে মৈনাক থ। আরেঃ, এ তো অবিকল কলেজবেলার পারমিতাদি। সেই এক ছাঁচের মুখ, ছিপছিপে গড়ন, টানাটানা চোখ, ঈষৎ কোঁকড়ানো ঘন চুল।

পারমিতাদি আলাপ করিয়ে দিল, আমার মেয়ে আহেলি।

গোলাপি শাড়ি পরা মেয়েটা একটু ঝুঁকে হাত জোড় করে নমস্কার করে। তখনই মৈনাকের মনে পড়ে বছর বারো আগে পাশের বাড়ির ডালিয়াদির বিয়ের সময় এক বারই বর, মেয়েকে নিয়ে এসেছিল পারমিতাদি। ডালিয়াদি ছিল পারমিতাদির সবথেকে প্রিয় বন্ধু, তাই না এসে পারেনি। নয়তো, পারমিতাদি নিজের বিয়ের পর চৌকাঠ মাড়ায়নি বাপের বাড়ির । কেন, তা ভাল করে জানে না মৈনাক। তবে মোটামুটি একটা কারণ আন্দাজ করতে পারে। ডালিয়াদির বিয়েতেই দেখেছিল পারমিতাদির মেয়েকে, তখন তো একদম গোলগাল, থপথপে। সেই মেয়েটাই যে একদম মায়ের মতো দেখতে হয়ে যাবে, আন্দাজই করা যাচ্ছে না।

তুই বাড়ি ফিরবি কখন?

পারমিতাদির প্রশ্নে সংবিৎ ফেরে মৈনাকের। বলে, এই তো, এ বার বেরোব।

যাবি তো, আমাদের গাড়িতেই চল। আমরা সল্ট লেকে ফিরছি, তোকে শ্যামবাজারে নামিয়ে দেব।

প্রস্তাবটা মনোমতো হয় মৈনাকের। এতক্ষণ প্রেমের গল্প খোঁজা, ধোঁয়া, মদ, সব মিলিয়ে মাথাটা একদম জ্যাম হয়ে গেছে, এক্ষুনি বাইরের হাওয়ায় যাওয়াটা খুব দরকার। মৈনাক বলে, সেই ভাল, চলো তোমাদের সঙ্গেই ফিরি— দু'পা এগিয়েও যায় মৈনাক। পারমিতা বলে, যার সঙ্গে এসেছিস, তাকে একবার বলে যাবি না?

একটু দাঁড়াও, চট করে বলে আসি। বলে, গ্লাসরুমের দিকে ফেরে মৈনাক।

চোখে একটু ঝাপসা ভাব। পারমিতাদির গাড়িটা কোন মডেলের বোঝা হল না মৈনাকের। তবে বেশ বিলাসবহুল। পিছনের সিটে মৈনাক, পারমিতাদি, আহেলি। সামনে ড্রাইভারের পাশে পারমিতাদির বর।

কলকাতা থেকে শীত চলে গেলেও, রাত্তিরের দিকে একটু হিম ভাব নেমে আসে। গাড়ির এসি চালানো হয়নি, জানলা খোলা। দিব্যি ঠান্ডা মিঠে হাওয়া

আসছে। আকাশটাও আজ পরিষ্কার। চাঁদটাকে মনে হচ্ছে গ্লোবের মধ্যে আলো ফিট করে শুটিং ফ্লোরে সাজানো হয়েছে। পূর্ণিমা নিশ্চয়ই খুব কাছাকাছি। এই সব ছেড়ে মৈনাক কি না বসেছিল প্রোডিউসারের আজব বায়নার সামনে। পারমিতাদিদের দাঁড় করিয়ে আবার যখন ফিরে গিয়েছিল গ্লাসরুমে, দেখে, রঙিন জামার বুড়ো আসর জমিয়ে দিয়েছে। তিনজনের গ্লাসই ভরা, চার প্লেট খাবার এসেছে। মৈনাক রানাদাকে বলে, আমি আর বসছি না। বাড়ি গিয়ে বই-পত্তর ওলটাতে হবে। দেখি, কাল পরশুর মধ্যে ডিমান্ড ওয়াইজ কোনও স্টোরি বার করতে পারি কি না।

সেই ভাল, তুই আর সময় নষ্ট করিস না। যত তাড়াতাড়ি পারিস গল্পটা বার কর। বলে, রানাদা একটা ফিস ফ্রাই তুলে দেয় মৈনাকের হাতে। সেটা মুখে গুঁজে বেরিয়ে আসার সময় এক পলক চোখাচোখি হল রাহুল বোসের সঙ্গে। ভদ্রলোকের চাউনিতে তখনও গল্পের জন্য করুণ আর্তি। উনি কি সত্যিই সিরিয়াস!

ফিস ফ্রাইটার পর তরল কিছু খাওয়া উচিত ছিল, জিনিসটা ঠিকঠাক প্রেস হচ্ছে না পেটে। গাড়ি পার্ক স্ট্রিটের সিগনালে দাঁড়িয়েছে, হঠাৎ মৈনাকের মনে পড়ে, এই রে, রাহুল বোসের ড্রাইভারের জুতোটা তো তার পায়ে! কী হবে এখন? এত সুন্দর গাড়ি থেকে নেমে আবার বাসে উঠতে হবে! ও সব ঝামেলায় আর যেতে ইচ্ছে করছে না। বেশ আরামে ফিরছে বাড়ি। পারমিতাদি কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর পাড়ার এক একজনের খোঁজ নিচ্ছে, একটা নাম কিছুতেই মুখে আনছে না। নেশার চোটে চোখ আধবোজা হয়ে আসছে মৈনাকের, কোনও ক্রমে পারমিতাদির কথায় হুঁ, হাঁ দিয়ে যাচ্ছে। এক সময় পারমিতাদি চাপা স্বরে বলে, হ্যাঁ রে মনু, খুব বেশি খেয়ে নিয়েছিস না কি, ঘুমিয়ে পড়ছিস!

গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে মৈনাক। সামনের সিট থেকে সলিলদা বলেন, ঘুম পেয়েছে, ঘুমোক না। আমরা না হয় ওকে বাড়িতেই পৌঁছে দেব।

মৈনাক খুবই বিব্রত ও সংকোচ বোধ করে। বলে, না না, আমি ঠিক আছি। — তারপর মনে হয়, ইস্, পারমিতাদির মেয়েটাই বা কী ভাবছে। মেয়েটা ভীষণ চুপচাপ, গুডি গুডি। নিশ্চয়ই মৈনাককে পাকা মাতাল ধরে নিয়েছে।

আড়চোখে আহেলির দিকে তাকাতে গিয়ে মৈনাক দেখে, মেয়েটা ঠায় তার দিকেই চেয়ে আছে। মুখটা গম্ভীর হলেও, চোখ দিয়ে হাসছে। এটা খুব টাফ এক্সপ্রেশান। পাকা অভিনেতা, অভিনেত্রীরাও সহজে পারে না। এ সব জন্মগত ক্ষমতা। আড়চাউনি পালটে মৈনাক এবার সরাসরি তাকায় আহেলির দিকে। চোখ সরায় না আহেলি। চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে আসা গ্লো-সাইনের আলো ওকে বর্ণিল এক মায়াবী নারী করে তুলেছে। যেন ধরা ছোঁয়ার বাইরের কেউ।

ঝট করে একটা কথা মনে পড়ে মৈনাকের, রানাদা কিছুদিন ধরেই বলছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অহিংসা উপন্যাসটা ফিল্ম করবেন। এরজন্য মেধাদীপ্ত রহস্যময়ী মুখের মেয়ে দরকার। তার পর রানাদা প্রোডিউসারের জন্য ঝাঁপাবেন। মৈনাক নিশ্চিত, আহেলিকে ওই রোলে দারুণ মানাবে। কিন্তু পারমিতাদি রাজি হবে কি? মৈনাক যত দূর শুনেছে, পারমিতাদিদের অবস্থা না কি ব্যাপক। টাকার জন্য মেয়েকে ফিল্ম লাইনে দেবে না। এক যদি শখ থাকে আলাদা কথা। প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে তুলতে যাবে মৈনাক, দেখে, জানলার বাইরে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে আহেলি। আজকের মতো প্রস্তাবটা মুলতুবি রাখে মৈনাক। সেও এখন স্বাভাবিক নেই, কী বলতে, কী বলে বসবে, তার চেয়ে বরং গাড়ি থেকে নামার সময় পারমিতাদির ফোন নাম্বারটা নিয়ে রাখবে।

পারমিতাদির সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এখন থেকে পার্মানেন্টলি কলকাতায় থাকবে। শুনেছিল পারমিতাদির হাজব্যান্ডের বদলির চাকরি। কোম্পানি চেঞ্জ করেছে না কি কে জানে! ওদের যে সল্ট লেকে একটা বাড়ি আছে, সেটা জানে মৈনাক। ওই বাড়িতেই পারমিতাদির বউভাত হয়েছিল। কনেযাত্রী পৌঁছনোর একটু পর, পারমিতাদি মৈনাককে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে একজনের খবর জিজ্ঞেস করেছিল। ওইটুকু বয়সেই মিথ্যে বলেছিল মৈনাক, জানত সত্যি বললে, পারমিতাদি এ বাড়ি ছেড়ে তক্ষুনি তার কাছে দৌড়বে।

একটা বিচ্ছিরি ঢেঁকুর উঠতেই সতর্ক হয় মৈনাক। ফিস ফ্রাইটা বোধহয় এ বার ওপরে উঠে আসতে চাইছে। গা গুলোচ্ছে। হাত দিয়ে মুখ চাপা দেয়। পারমিতাদি জিজ্ঞেস করে, কী রে, শরীর খারাপ লাগছে, বমি করবি?

কান-মাথা লজ্জায় গরম হয়ে ওঠে মৈনাকের। কোনও ক্রমে মাথা নেড়ে সায় দেয়। গাড়ি থামাতে বলেন সলিলদা। জায়গাটা সম্ভবত বউবাজার। গাড়ি থেকে নেমেই দৌড়য় মৈনাক। একটা লাল বাড়ির দেওয়ালের সামনে বসে ওয়াক তোলে বার বার, বমি হয় না। অদ্ভুত কাণ্ড! পারমিতাদির গাড়িতে ফিরে যেতেও অস্বস্তি হচ্ছে।

দেওয়াল ধরে উঠে দাঁড়ায় মৈনাক। আহেলির নির্মল রূপটাই কি তার সহ্য হল না। প্রেমবোধহীন কাজ-পাগল মানুষদের বোধহয় এমনটাই হয়। এর মধ্যে আবার পায়ের জুতোটা কষে কামড় মারছে। প্রচণ্ড বিরক্তিতে জুতো জোড়া খুলে ফেলে মৈনাক। সামনে যে বাসটা এসে দাঁড়ায়, নাম্বার না দেখেই উঠে পড়ে। খালি পা বেয়ে শান্তি উঠে আসে। যেন মুক্তির স্বাদ।

পারমিতার ঘর আবছা অন্ধকার। কম আলোর সৌখিন ল্যাম্পশেড জ্বলছে। বিছানায় বসে গা থেকে গয়নাগুলো একটা একটা করে খুলে বাক্সে রাখছে পারমিতা। বাক্সটা খুব কারুকাজ করা, লখনউ থেকে কিনেছিল শখ করে। গয়নাগুলো পারমিতার ভীষণ প্রিয়। ওজনেও বেশ ভারী।

আজ ক্লাবের পার্টিতে যাওয়ার একটুও ইচ্ছে ছিল না পারমিতার, প্রথমটায় যাব না-ই বলে দিয়েছিল। সলিল জোর করেনি। একলাই যেত। মেয়েরও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। ক্লাব, পার্টি-টার্টিতে আহেলি এখনও ততটা স্বচ্ছন্দ হয়নি। ও মানুষ হচ্ছে অন্য ভাবে।

সলিল কোনও দিনই পারমিতার ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে না। পার্টিতে বেরনোর আগে শেভ করছিল। আলমারি থেকে ওর সুট, বিদেশি ঘড়ি, বিয়ের আংটি বার করতে গিয়ে পারমিতার চোখ পড়ে নিজের গয়নার বাক্সে, ভেতরের অলঙ্কারগুলোও যেন টের পেয়েছিল পারমিতার উপস্থিতি। যে ভাবে অন্ধ মানুষ টের পায় তার প্রিয়জনের নৈকট্য। পারমিতা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিল গয়নাগুলোর নড়ে ওঠার রিনটিন শব্দ।

অনেকদিন পরা হয়নি ওদের। বাক্সর ডালা খুলতেই হারেমের সখীবৃন্দর মতো হেসে উঠেছিল পারমিতার প্রিয় অলংকার।

'হারেমের সখী' উপমাটা এক্ষুনি মাথায় এল, তখন অবশ্য আসেনি। সেই সময় অদ্ভুত এক ভাল-লাগায় ভরে উঠেছিল মন। এখন কেন হঠাৎ ওই উপমাটা মনে এল! ইদানীং এই হয়েছে সমস্যা, অবচেতন থেকে এমন সব কথা উঠে আসে, যার অর্থ নিজেই করতে পারে না পারমিতা। 'হারেমের সখী' কথাটার মধ্যে নিশ্চিত ভাবে একটা নঞর্থক ভাব লুকিয়ে আছে। পারমিতা যেন অলংকারগুলোর বাধ্যত সখী। কিন্তু তা তো নয়, পছন্দ করেই একের পর এক ওগুলো কিনেছে। সলিল টাকা দিতে কার্পণ্য করেনি। জানতে চায়নি, কী হবে এত গয়না কিনে?

পাছে সলিল মনে করে পারমিতার গয়না কেনাটা এক ধরনের রোগ, সেই আশঙ্কায় পারমিতা আগ বাড়িয়ে বলে রাখে, মেয়ে বড় হচ্ছে, বিয়ে দিতে হবে। দাম বাড়ার আগে সোনা কিনে রাখা ভাল।

দাম তেমন বাড়েনি। আর অজুহাতটাও জুৎসই নয়। সলিল যা রোজগার করে, একটা কেন, পাঁচটা মেয়ের বিয়ে ধুমধাম করে দিতে পারবে।

পারমিতা লক্ষ করে দেখেছে, গয়না কেনার যুক্তি শুনে সলিলের ঠোঁটে কখনও এক চিলতে বাঁকা হাসি খেলে না। আজ্ঞাবহর মতো টাকা বার করে দেয়। এই নীরবতা কি উপেক্ষারই নামান্তর? হতেও পারে। পৃথিবীর কারওর উপেক্ষার ধার

ধারে না পারমিতা। শুধু একজনের ছাড়া। যদিও সে এখনও পারমিতাকে উপেক্ষা করার মতো গ্রাহ্য করে কি না, কে জানে!

গয়নার বাক্সটা আলমারিতে তুলে রাখতে ওঠে পারমিতা। সারা বাড়ি এখন নিস্তব্ধ। আজ আর রাত্তিরে খাওয়ার পাট নেই। পার্টিতেই যে যতটুকু পারে খেয়েছে। এ বাড়ির তিন প্রাণী এখন যে যার নিজের ঘরে।

আলমারি থেকে নাইটি বার করে বাথরুমের দিকে যায় পারমিতা। এ বাড়িতে দুটো বাথরুম, এটা সে একাই ব্যবহার করে। সল্ট লেকের এবি ব্লকের এই বিশাল বাড়িটা শ্বশুরমশাই নিজের প্ল্যানে, দাঁড়িয়ে থেকে বানিয়েছিলেন। সিভিল ইঞ্জিনিয়র ছিলেন উনি। সল্ট লেকে অনেক বাড়িই ওঁর প্ল্যানে তৈরি হয়েছে।

বিয়ে হয়ে এ বাড়িতেই প্রথমে এসেছিল পারমিতা। সলিল তখন দিল্লিতে পোস্টিং। মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। বিয়ের জন্য এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে এসেছিল। তখনই বউ নিয়ে ফেরার কোনও প্ল্যান নেই। কারণ, ক'দিন বাদেই পুনেতে পোস্টিং হবে। সেখানে গিয়েই সংসার পাতবে ঠিক করেছিল।

ব্যবস্থাটা মোটেই পারমিতার পছন্দ হয়নি। মা অবশ্য বলেছিল, এক দিকে ভালই হয়েছে, কয়েক মাস শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে না থাকলে খারাপ দেখায়।

পারমিতার মাথায় তখন অন্য প্ল্যান চলছে। ফুলশয্যার রাতে নিজের তৈরি করা নকল আবেগঘন মুহূর্তে সে সলিলের কাছে একটাই কথা আদায় করে নিয়েছিল, কলকাতায় সলিলকে ছাড়া সে থাকবে না। এ বারই দিল্লি নিয়ে যেতে হবে।

আবদারে তখনই সায় দেয়নি সলিল। বলেছিল, বাবা, মায়ের সঙ্গে একটু কথা বলি। দেখি, ওঁরা কী বলেন।

সকাল হওয়া অব্দি খুব ভয়ে ভয়ে ছিল পারমিতা। বাকি রাতটা সলিলও এ পাশ ও পাশ করে কাটাল, প্রস্তাবটা কী ভাবে মা-বাবার কাছে রাখবে সেটাই ভাবছিল হয়তো।

ভোররাতে গুটিয়ে পাকিয়ে শুয়ে থাকা সলিলকে ঠেলে তুলেছিল পারমিতা, যাও, বাবাকে বলো কথাটা। সকাল বেলা সবার মন ফ্রেশ থাকে।

ধড়মড় করে উঠে বসে, অবাক চোখে পারমিতার দিকে তাকিয়ে ছিল সলিল। অসহায় অবুঝ দৃষ্টি। এখনও পারমিতার কিছু কর্মকাণ্ডে সলিলের ওই চাউনি ফিরে আসে, আজও সে নিজের বউকে চিনতে পারেনি।

বাথরুমের কাজ সারা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বেসিনে কলের জল পড়েই

যাচ্ছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়েও নিজেকে এতক্ষণ দেখতে পাচ্ছিল না পারমিতা। সারা মুখে ফোঁটা ফোঁটা জল। কল বন্ধ করে, তোয়ালেতে হাত-মুখ মুছে বাথরুমের বাইরে আসে।

পাপোশে পা ঘষতে ঘষতে বুক ঠেলে উঠে আসে একটা দীর্ঘশ্বাস। নিজের শ্বাসের শব্দে নিজেই একটু সচকিত হয়। মনে হয় যেন শ্বশুর-শাশুড়ির দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেল। ওঁরা দু'জনেই এখন এ জগতে নেই। তবু যেন ওঁদের হতাশ্বাস এ বাড়ির বাতাসে মিশে আছে।

পারমিতার কথা অনুযায়ী সলিল ফুলশয্যার ঘর থেকে বেরিয়েই বাবার কাছে গিয়েছিল। শ্বশুরমশাই তখন বারান্দায়, ইজিচেয়ারে বসে। অন্য কিছুর আশঙ্কায় শ্বশুরমশাই উদ্বিগ্ন চোখে সলিলের দিকে তাকিয়েছিলেন। ফুলশয্যার রাত পোহাতে না পোহাতেই ছেলে কেন তাঁর সামনে?

সলিল যখন আসল কথাটা বলল, আড়াল থেকে পারমিতা দেখেছিল, প্রৌঢ়ের মুখে শেষ আলোটুকু নিভে যেতে।

মাথা নিচু করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, তোমার মাকে ডেকে দাও।

শাশুড়ি এলেন। মুখোমুখি বসলেন প্রবীণ দম্পতি। কথা হয়েছিল হয়তো দুটি। বাকিটা কাটল নীরবতায়। কেউ কারওর দিকে তাকাচ্ছিলেন না। সন্তান একটাই, লজ্জা দু'জনের।

আগের দিনই আত্মীয়স্বজনরা মিলে ঠিক করেছিল, মা-বাবা এ বার থেকে ছ'মাস ছেলের কাছে কাটাবেন, বাকি ছ'মাস কলকাতায়। সলজ্জ হাসিতে শ্বশুর-শাশুড়ি সায় দিয়েছিলেন প্রস্তাবে। ওঁরা যখন অশক্ত হয়ে পড়বেন, সলিলই বদলি নিয়ে চলে আসবে কলকাতায়। ততদিনে নিজেকে ইচ্ছেমতো জায়গায় পোস্ট করার পদে পৌঁছে যাবে সলিল।

সলিল সেই এল। বাবা-মা থাকলেন না। এ সবের জন্য কি পারমিতাকেই দায়ী করে সলিল? মুখে অবশ্য কোনও দিনই কিছু বলে না।

পারমিতা যেমন শ্বশুর ঘর না করে পালিয়েছিল দিল্লি, পুনে, তারপর আরও দু'তিন জায়গায় ঘুরে আবার দিল্লিতে। শ্বশুর-শাশুড়িও কোনও দিন গিয়ে থাকেননি তাদের কাছে। প্রথমে মারা গেলেন শাশুড়ি, পারমিতারা এসেছিল, নিয়ে যেতে চেয়েছিল বাবাকে। যাননি। তাঁকে শেষ বয়সটা দেখেছিল সলিলেরই এক পিসতুতো ভাই।

পারমিতা জানে, তার উদ্দেশে অনেক শাপশাপান্ত বর্ষিত হয়েছে এ বাড়ির

চৌহদ্দিতে। কিন্তু সে কী করতে পারে! কলকাতা থেকে না পালিয়ে তার নিস্তার ছিল না।

ঘরে এসে ফ্যানটা চালিয়ে দেয় পারমিতা। আজ সহজে ঘুম আসবে না। ভিড় করে আসছে অনেক কথা। না জেনেই এ সব চেপে রাখা কথার রুদ্ধমুখ খুঁচিয়ে দিয়ে গেছে মনু। কত ছোট দেখেছিল ওকে। এখন কেমন পরিপূর্ণ পুরুষ হয়ে গেছে। মুখের আদলটা রয়ে গেছে শিশুর মতোই। স্বভাবটা হয়েছে ওদের বাড়ির মতো, অদ্ভুত আচরণ করল আজ! সেই যে নেমে গেল, ফেরার নাম নেই। বেশ খানিক ক্ষণ অপেক্ষা করার পর সলিল ড্রাইভারকে বলল, যাও তো মন্টু, দেখে এসো কোথায় গেল ছেলেটা।

খোঁজাখুঁজি করে ফিরে এল মন্টু। বলল, আশপাশে তো দেখছি না। মনে হয় ট্যাক্সি ধরে বেরিয়ে গেছে।

পারমিতার দিকে তাকিয়ে সলিল পরবর্তী করণীয় কী, জানতে চেয়েছিল। পারমিতা বলে, ছেড়ে দাও, চলো ফিরি।

আহেলি পুরো ঘটনায় হতবাক। বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে বসেছিল। আসলে ও তো নর্থ ক্যালকাটার ছেলেদের খ্যাপামি কখনও দেখেনি। বাকি পথটুকু পারমিতার ঠোঁটে এক চিলতে হাসি লেগেছিল। লক্ষ করেছিল কি আহেলি? হয়তো করেনি। করলে, খুব অবাক হত। অনেক দিন হল তার মা ওরকম স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে হাসেনি। বহুদিন পর আজ অনেক কথাও বলেছে পারমিতা। মনুকে পেয়ে তার যে কী ভাল লাগছিল। কিন্তু কই, তার হঠাৎ এই পরিবর্তন নিয়ে পরে সলিল বা আহেলি কোনও কথা বলল না তো! ওরা কি আমায় বাতিল করে দিয়েছে, আমার আনন্দ সুখ-দুঃখ নিয়ে মাথাই ঘামায় না। চিত হয়ে শুয়ে আছে বলে পারমিতার চোখের জলটা বালিশ শুষে নিল। মেয়েদের চোখের জল বরাবরই বালিশদের উপাদেয় পানীয়। এমন সময় দরজার কাছে ছায়া-অবয়ব ডেকে ওঠে, মা, ঘুমলে?

চোখের কোণ মুছে উঠে বসে পারমিতা, না। আয়।

ঘরে ঢুকে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে আহেলি। ল্যাম্প শেডের আবছা আলোয় ওর মুখটা পড়া যায় না।

কিছু বলবি? জানতে চায় পারমিতা।

পরে ভদ্রলোকের আর খোঁজ করেছ?

কার কথা বলছিস?

ওই যে তোমাদের পাড়ার, শরীর খারাপ হয়ে পড়ে রইলেন না তো কোথাও?

পারমিতা হেসে ফেলে, মনুকে লোক বলিস না, ও তো সে দিনের ছেলে। কত আর বয়স হবে!

ওই হল। একটা খোঁজ তো নেওয়া দরকার।

আর কী ভাবে খোঁজ করব, মন্টু তো দেখে এল।

ফোন কর ওঁর বাড়িতে। দেখো, ফিরেছেন কি না।

মেয়ের শিষ্ট উদ্বিগ্নতা দেখে, পারমিতার নিজেকে অপরাধী লাগে, এতক্ষণ শুধু সে নিজের কথাই ভাবছে। সত্যিই মনুর একবার খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কী করে নেবে, ওদের ফোন নাম্বার জানা নেই।

ফোন নাম্বার জানা নেই তো কী আছে, রাস্তার নাম, ওঁর গার্জেনের নাম বলো, আমি ডিরেক্টরি দেখে বার করে নিচ্ছি।

মেয়ের কথা শুনে চমকে ওঠে পারমিতা। আহেলি কি আজকাল মনের কথা পড়তে পারছে!

কী হল, বলো! আহেলি তাড়া দেয়। পারমিতা বলে, বাড়ির নাম্বার দু'য়ের বি বাই উনিশ শ্যামপুকুর স্ট্রিট। মনুর বাবা হচ্ছেন বিনয় চ্যাটার্জি। চ্যাটার্জিবাড়ি বলেই লোকে চেনে।

ডিরেক্টরিতে চ্যাটার্জিবাড়ি লেখা থাকবে না। বলে, বেরিয়ে গেল আহেলি। দিন পাঁচেক হল শান্তিনিকেতন থেকে ফিরেছে, বি এ পড়ছে বিশ্বভারতীতে। এই পাঁচ দিনে মায়ের সঙ্গে টানা পনেরো মিনিটও কথা বলেনি। পারমিতাও কি বলতে গেছে! অথচ মেয়ের সঙ্গে দেখা হল প্রায় এক বছর পর। কলকাতায় ফিরে যাচ্ছে, খবর দিয়ে মেয়েকে দিল্লি থেকে ফোনে বলেছিল, তুইও ক'দিন ছুটি নিয়ে সল্ট লেকে চলে আয়। নিজের পছন্দ মতো ঘরটা গুছিয়ে নিতে পারবি।

সেই মতো পারমিতারা আসার দশ দিনের মাথায় মেয়ে এল। বেশিরভাগ সময় বাবার সঙ্গেই কথা বলেছে। বাকি সময়টা বই মুখে গুঁজে বসে থাকে। দু'দিন আগে পারমিতাই সলিলকে বলেছিল, চলো, আহেলিকে নিয়ে একটু ঘুরে আসি। ও তো কলকাতা দেখেইনি ভাল করে।

বাবার কথা শুনে মেয়ে রাজি হয়েছিল যেতে। তবে মুখে কোনও উৎসাহ ছিল না। কলকাতা দেখে সে নিন্দেও করেনি, আবার গ্রাহ্যও না। যত বড় হচ্ছে, মেয়েটা কি একটু অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে!

ডিরেক্টরি হাতে ফিরে এসেছে আহেলি। 'লাইট জ্বালছি' বলে সুইচ টেপে। আলোময় হয় ঘর। সাদার ওপর ফুল ছাপ স্লিভলেস নাইটি পরেছে। সদ্য ফোটা রজনীগন্ধার মতো লাগছে। বিছানায় এসে বসে আহেলি, ফোন ডিরেক্টরির পাতা

ওলটাতে থাকে। মেয়ের আনত মুখের দিকে চেয়ে থাকে পারমিতা। ভাবে, ও কি আমার থেকেও দেখতে সুন্দর হয়েছে? সবাই বলে একদম মায়ের মতো। পারমিতার ধারণা, এই বয়সে সে এত সুন্দরী ছিল না। মাথার চুলের গোছ অবশ্য আহেলির থেকেও ভাল ছিল। এই সব তুল্যমূল্য বিচার একজনই করতে পারে। পারমিতা উনিশে কেমন ছিল, তার থেকে ভাল কেউ জানে না।

নামটা কী বললে যেন? বইয়ের পাতায় চোখ রেখেই প্রশ্নটা করে আহেলি। ঘোর ভেঙে পারমিতা বলে, মনু, ভাল নাম মৈনাক।

উঁহু, আমি ওঁর বাবার নাম জিজ্ঞেস করছি। থাক, বলতে হবে না। মনে পড়েছে, বিনয় চ্যাটার্জি। তাই তো?

হ্যাঁ।

আহেলি মাথা নিচু রেখেই বলে, তোমাদের বাড়ি থেকে ক'টা বাড়ি পরে চ্যাটার্জি বাড়ি?

এই তো, হালদারদের বাড়ি, তারপর ডালিয়াদের মাঝে কলোনি, এখন আছে কি না জানি না। তারপরই চ্যাটার্জিবাড়ি। তিনতলা বিশাল বাড়ি। চার ভাই এক ছাদের তলায় থাকেন। বিনয় কাকাদের বাবার আমলে যৌথ সংসার ছিল। আমি অবশ্য ছোট থেকে ওদের আলাদা রান্নাঘরই দেখে এসেছি। তবে ও বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি লাঠালাঠি কখনও হত না। সবাই খুব কালচারড। চ্যাটার্জিবাড়ির ছাদটা ছিল ছোটখাটো একটা মাঠের মতো, ওই ছাদে আমরা...

তোমাদের বাড়ি থেকে চ্যাটার্জিবাড়িটা দেখা যেত? অতীত যাত্রায় বাধা পেয়ে অসন্তুষ্ট হয় পারমিতা। বলে, হ্যাঁ যেত। কেন হঠাৎ এ কথা?

মুখ তুলে ভয় ভয় চোখে আহেলি বলে, এ বারও আমরা দিদার বাড়ি যাব না নিশ্চয়ই।

হঠাৎ দিদার বাড়ির কথা আসছে কেন! তুমি তো জানো, ও বাড়িতে আমরা কোনও দিনই যাব না। পারমিতার গলায় বিরক্তি। আহেলি বলে, গেলে ভাল হত, চ্যাটার্জিবাড়িটা দেখা যেত।

কথাটা হেঁয়ালির মতো শুনতে লাগে। মানেটা বোঝার জন্য মেয়ের দিকে তাকিয়ে পারমিতা।

আহেলি ফের ডিরেক্টরিতে মন দিয়েছে। আঙুল চালিয়ে খুঁজছে নাম্বার। এক সময় বলে ওঠে, এই তো, পেয়েছি মনে হচ্ছে।

রোদ পোড়া বিকেল। খুব হাওয়া। আকাশে ছিটেফোঁটা মেঘ। অনেক ঘুড়ি উড়ছে। অতিরিক্ত হাওয়ার জন্য ঘুড়িগুলোর ওড়ায় মাতাল মাতাল ভাব! সোনাদার চাঁদিয়াল লড়ছে হাড়িকাঠের সঙ্গে। পাশে হাফপ্যান্ট পরা মৈনাক সোনাদার লাটাই ধরে লাফাচ্ছে, টানো সোনাদা, টানো! ও ব্যাটা ছাড় দিচ্ছে। রোগা পাঁচুর ঘুড়ি ওটা।

সোনাদার এক টানে দু'দিন হাত সুতো জমা হচ্ছে ছাদে। মাথা নিচু করে গোঁয়ারের মতো গোঁত মারছে চাঁদিয়াল। দ্রুত লাটাই ঘুরিয়ে সুতো গুটিয়ে নিচ্ছে মৈনাক।

পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা নীলাদি হঠাৎ বলে উঠল, মনু, দেখ, দেখ একটা পেটকাটা কেটে আসছে।

লাটাই হাতে রেখে মাথা ঘোরায় মৈনাক, তাই তো, একটা নীলে হলুদে পেটকাটা ঘুড়ি তাদের ছাদের দিকে ভেসে আসছে, তবে বেশ উঁচুতে, লগি দিয়েও ধরা যাবে না। সোনাদাকে বলে, লাটাইটা ধরো। ঘুড়িটা লুটে নিয়ে আসি। মনে হচ্ছে কলোনিতে পড়বে।

নীলাকে ধরতে দে লাটাই। বলে, সোনাদা নিজের ঘুড়ির দিকে মন দেয়। মৈনাক দেখে, হাড়িকাঠ সোনাদার সুতোর তলা থেকে বেরিয়ে আলাদা উড়ছে। নীলাদির হাতে লাটাই দিয়ে সিঁড়ির দিকে দৌড়য় মৈনাক। কলোনির ছেলেগুলোর আগেই ঘুড়িটা লুটতে হবে। ওরা হয়তো এখনও টের পায়নি।

সদর পেরিয়ে রাস্তায় নেমে আবার আকাশের দিকে তাকায় মৈনাক। মনে হচ্ছে কলোনিতে পড়বে না, হালদার বাড়িতেও চান্স নেই। ডালিয়াদির বাড়ির ছাদে না আটকে যায়। অঘোরজেঠু ভীষণ কড়া। উঠতেই দেবে না ছাদে। আকাশে লাট খাচ্ছে পেটকাটা, গলিতে দৌড়চ্ছে মৈনাক। এখনও বোধহয় টের পায়নি কলোনির ছেলেরা, নইলে এতক্ষণে লম্বা লম্বা লগি হাতে পিছন ধরত।

নাঃ, ডালিয়াদির বাড়িও পেরিয়ে গেল। এ বার নেমে আসছে, হাওয়া ফুরিয়েছে ডানায়। মৈনাক নিশ্চিত হয়ে যায় ঘুড়িটা পারমিতাদিদের বাড়িতেই পড়বে। ভালই হবে, ও বাড়িতে মৈনাকের অবাধ যাতায়াত। মৈনাক দৌড়তে থাকে পারমিতাদিদের বাড়ির দরজা লক্ষ করে।

কিন্তু যাঃ, সদর বন্ধ। তালা দেওয়া। দেড় মানুষ সমান উঁচু পাঁচিল। ওটা টপকানো হাফপ্যান্ট বয়সি মৈনাকের কম্ম নয়। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মৈনাক স্পষ্ট দেখতে পায়, পেটকাটাটা পোষা প্রজাপতির মতো পারমিতাদিদের ভেতরের বারান্দার গ্রিল গেটের সামনে গিয়ে পড়ল। —উঁহু, কোথাও একটা

গণ্ডগোল হচ্ছে, এত উঁচু পাঁচিল ভেদ করে কী করে সে বারান্দাটা দেখছে! এতক্ষণে মৈনাক ধরতে পারে সে স্বপ্ন দেখছে। চোখ খোলে না। স্বপ্নটা দেখতে তার ভালই লাগছে। আধো জাগরণে স্বপ্নটা সে শেষ করতে চায়... ঘুড়ি না পেয়ে ফিরে আসে নিজেদের ছাদে। সোনাদা বিরস মুখে লাটাই গোটাচ্ছে। কেটে গেছে চাঁদিয়াল। নীলাদিকে দেখা যাচ্ছে না। সোনাদা বলে, পেলি, না কি অন্য কেউ লুটে নিল?

না গো, ঘুড়িটা কেউ দেখতেই পায়নি। পড়ল পারমিতাদিদের বাড়ি। ওদের সদরে আবার তালা দেওয়া। কোথাও গেছে বোধহয়।

মৈনাকের কথার পর সোনাদা বলে, জানতাম।

ব্যস আর ঘুমনো গেল না। মা ধাক্কা দিচ্ছে, ও মনু, ওঠ! আর কত বেলা অব্দি ঘুমোবি।

চোখ কচলে উঠে বসে মৈনাক।

ঘরে আলো থইথই করছে। ডেকে দিয়েই চলে গেছে মা। মশারি তোলা, বিছানার চাদরও মোটামুটি টানটান করা। তার মানে যথেষ্ট বেলা হয়েছে। দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকায় মৈনাক, টাইম বোঝা যাচ্ছে না। ঘরে এত আলো, ঘড়িটা একটু অন্ধকারে। চোখের এক্সপোজারটা এখনও অ্যাডজাস্ট হয়নি। মাথাটা টিপটিপ করছে। গত রাতের স্কচের প্রভাব।

খাট থেকে নেমে আসে মৈনাক। জানলার পর্দাগুলো হাওয়ায় উড়ছে। ক'দিন আগেও শীতের জন্য জানলা খোলা হত না। শীতের আড়ষ্টতা কাটিয়ে হাওয়ায় এখন দিলখোলা ভাব। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় মৈনাক। সামনেই ঝাঁকড়া আমগাছ। গুড়ি গুড়ি মুকুল ধরেছে। দোতলার এই ঘরটা মৈনাকের নিজস্ব। বাবা-মা থাকে নীচে। এখান থেকে সরকারকলোনি স্পষ্ট দেখা যায়, তারপর সেই সব বাড়ি স্বপ্নে যেমন দেখল। শুধু আমগাছটাই স্বপ্নে দেখেনি। কেন দেখল ও রকম স্বপ্ন, ভাবার চেষ্টা করে মৈনাক। কোনও উত্তর খুঁজে পায় না। ধুর, স্বপ্নের কোনও মানে হয় না। তবে এই মুহূর্তে আকাশে সত্যিই একটা ঘুড়ি উড়ছে।

তোর চা। মা পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। মৈনাক ঘুরে গিয়ে চা নেয়। মায়ের মুখটা থমথমে। তার মানে সামথিং রং। মা বলে, হ্যাঁরে, কাল কী সব আকোচ পাকোচ খেয়ে এসেছিলি! কোনও হুঁশ ছিল না।

কথা না বাড়িয়ে এক মনে চা খেয়ে যায় মৈনাক। মা বলে যায়, ছিঃ ছিঃ, এমন অবস্থা, পায়ে চটি পর্যন্ত ছিল না। কোথায় ফেলে এসেছিস মনে আছে?

খুব ভাল করেই মনে আছে মৈনাকের, সেই চটি এখন শোভা পাচ্ছে রাহুল

বোসের ড্রাইভারের পায়ে। আশা করা যায় তার সঙ্গে আর কোনও দিন দেখা হবে না। মা বলে, তাড়াতাড়ি চা খেয়ে বাজারে যা।

আমি কেন বাজারে যাব! রোববার তো বাবা যায়। চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলে মৈনাক।

তাঁর যা মুড দেখছি, বাজারের কথা তোলা যাবে না।

ভ্রূ কুঁচকে মৈনাক জানতে চায়, কেন, মুডের আবার কী হল।

মেজাজ খারাপ হবে না, তার চোখেই তো প্রথমে পড়ল, তোর পায়ে চটি নেই। হামাগুড়ি দিয়ে দোতলার সিঁড়িতে উঠছিস।

মনে মনে জিভ কাটে মৈনাক, ইস, ভালই ব্লান্ডার করেছে কাল রাতে। মা বলে যাচ্ছে, যা হয়, সব দোষ চাপিয়ে দিল আমার কাঁধে, আমার আশকারাতেই তুই না কি ও রকম হয়েছিস। তোর দিদি না কি বাবার শিক্ষায় মানুষ হয়ে সুখী হয়েছে, দিব্যি চাকরি, সংসার একার হাতে সামলাচ্ছে।

দিদির সঙ্গে সম্পর্কটা মৈনাকের বরাবরই ভাল। দিদি তাকে অন্ধের মতো ভালবাসে। সেই ভালবাসায় চিরকাল কম্পিটিশন ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছে বাবা।

তোর বাবা বলছিল, রিটায়ারমেন্টের তো আর দু'বছর বাকি, ছেলেকে এবার সিনেমা থিয়েটারের লাইন ছাড়তে বলো। যত সব ওঁচা জায়গা। ওখানে থাকলেই রোজ নেশা করে বাড়ি ফিরবে। তার থেকে চাকরির পরীক্ষা দিক, দু'চারটে টিউশানি অন্তত করুক। লেখাপড়ায় তো খারাপ ছিল না।

এ ধরনের প্রস্তাব আগেও এসেছে বাবার কাছ থেকে। শুধু সিনেমার পাশে থিয়েটার শব্দটা একটু বেখাপ্পা ঠেকল। নাটক বা থিয়েটার নিয়ে কোনও দিনই মাথা ঘামায়নি মৈনাক। যাদবপুরে এম এ করার সঙ্গে সঙ্গে ফিল্ম ডিরেকশনের দু'বছরের একটা কোর্স করে নিয়েছিল।

মায়ের পরের কথাটায় খটকাটা কেটে গেল। মা বলছে, তোদের বংশে যে কোনও একটা ছেলে বিগড়ানোর চল আছে। তোর বাবার ছোটকাকা সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, তোর মেজজ্যাঠা হলেন নিরুদ্দেশ। তোর বাবার ধারণা এর পর না কি তুই। সে সব ধরন-ধারণ না কি তোর মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে।

ভর্ৎসনা করেও যে এত মহত্ত্ব প্রদান করা যায়, এই প্রথম টের পেল মৈনাক। তার মানে বাবা তাকে বেশ কেউকেটা মনে করে। যদিও মেজজ্যাঠার নিরুদ্দেশটা মোটেই কলঙ্কমুক্ত ছিল না। সেই নিয়ে এখনও পাড়ার পুরনো বাসিন্দারা ফিসফিসানি করে। মেজজ্যাঠার বড় ছেলে হচ্ছে সোনাদা, মৈনাকের স্বপ্নে যে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল। —এই সব আবোল তাবোল চিন্তায় সময় নষ্ট করার মানে হয় না।

বাস্তবে ফিরে এসে মৈনাক মায়ের হাতে ফাঁকা কাপ তুলে দিয়ে বলে, বাজারের ব্যাগ আর টাকা দাও।

কাপটা নিয়ে যেতে যেতে মা বলে, কাল তুই ফেরার পর একটা মেয়ের ফোন এসেছিল। নাম বলল না। তুই ঘুমোচ্ছিস শুনে বলল, থাক ডাকতে হবে না। হুট করে লাইনটা কেটে দিল।

মৈনাক ভেবে পায় না কোন মেয়ে তাকে ফোন করতে পারে। ইউনিভারসিটির কয়েকজন বান্ধবী আছে, তারা ঘুম ভাঙিয়ে কথা বলত। ফিল্ম লাইনের যে ক'জনের কাছে বাড়ির নাম্বার আছে, তাদের নাম বলতে বাধা নেই। ফোনেই মা তাদের চেনে। আর সিনেমার রোল পাওয়ার জন্য যারা ফোন করে, তারা মৈনাকের নাগাল পাবে না। মাস ছয়েক হল মৈনাক মোবাইল ফোন ছেড়েছে। রানাদা মাঝে একটা টিভি সিরিয়ালে হাত দিয়েছিল, অ্যাসিস্ট করতে হচ্ছিল মৈনাককে। দু'মাসেই দম ফুরিয়ে যায় দু'জনের। পাহাড় প্রমাণ ঝামেলা। ও সব কাজে মাত্র দু'টি মন্ত্র, ম্যানেজ আর কমপ্রোমাইজ। রানাদা বলল, বুঝলি মৈনাক, এই সব করতে গিয়ে মনে হচ্ছে ফিল্ম করাটাই ভুলে যাব। ছেড়ে দিই, কী বল?

মৈনাক তৎক্ষণাৎ রাজি। তার মোবাইল ফোনের বিল উঠেছে সাড়ে পাঁচ হাজার। অ্যাসিস্ট করে পাবে দশ। প্রোডিউসার ফোনের বিল দিচ্ছি, দেব করছে। এর মাঝে আবার ঘন ঘন মাখা গলায় মেয়েদের আবদার আসে একটা রোলের জন্য। যে কোনও পুরুষ ওই কণ্ঠ মাধুরীতে মন ভেজানোর জন্য ফোনটা রেখে দিতে পারত। কিন্তু মৈনাকের ও সব পোষায় না। মনে হয় ওই সব মেয়েরাই মেয়েদের বড় চিপ করেছে। অনেক বারই ওই নেকু মেয়েরা চেষ্টা করেছে মৈনাককে অধঃপতনে নিয়ে যাওয়ার। সেই যে সেলফোন ছেড়েছিল মৈনাক আর নেয়নি। ওদের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ ফোন করেনি। তা হলে কে করল?

মা ফিরে এসেছে ব্যাগ আর টাকা নিয়ে। একটা চিরকুট হাতে ধরিয়ে বলল, কিছুই তো মনে রাখতে পারবি না, লিস্ট করে দিলাম।

গলায় পরিমাণ মতো আবেগ মিশিয়ে মৈনাক বলে ওঠে, আচ্ছা মা, ধরো, আমি যদি ফিল্ম লাইনে থেকে খুব নাম করি, দেশ বিদেশের লোক যখন প্রতিভাবান ডিরেক্টর হিসেবে আমাকে মেনে নেবে, পুরস্কৃত করবে, তোমার ভাল লাগবে না। বাবারও তো গর্ব হবে।

হয়েছে, বুঝেছি চাকরির পরীক্ষা তুমি দেবে না। টিউশানি করারও ইচ্ছে নেই, তা হলে যা ভাল বোঝো করো। মায়ের গলায় হালছাড়া ভাব। মৈনাক বলে, শোনো মা, তুমি যদি বড় বড় পরিচালকের জীবনী পড়ো, দেখবে, কেউ কোনও

দিন টিউশানি করেননি। চাকরি করলেও, পারেননি ধরে রাখতে।

ঠিক আছে, ও সব কথা আমাকে না বুঝিয়ে, বাবাকে বোলো। বলে, মা ঘরের অন্য কাজে চলে যায়। মৈনাক বাড়িতে পরার হাওয়াই চটি পরে সিঁড়ি ভেঙে নামতে থাকে।

নীচে বসার ঘরে ঢোকার আগে একটু থমকায় মৈনাক। ইজিচেয়ারে বসে বাবা খবরের কাগজ পড়ছে। বুকটা একটু ধুকপুক করে। যদিও বেশ কিছু বছর হয়ে গেল বাবা আর সরাসরি বকাবকি করে না। যা কিছু অসন্তোষ ভায়া মা জানায়। তবু কালকের কেসটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।... পা টিপে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল মৈনাক, এমন সময় পিছন থেকে বাবার গম্ভীর গলা, একটু দাঁড়াও।

অনিচ্ছুক ঘাড়টা ফেরায় মৈনাক, কাগজটা ভাঁজ করে কোলের ওপর রেখেছে বাবা। পকেট থেকে কী যেন বার করে মৈনাকের দিকে বাড়িয়ে ধরে, এটা নাও।

ভাল করে লক্ষ করতে মৈনাক দেখে, বাবার হাতে টাকা। মৈনাকের চোখে অবুঝ দৃষ্টি। বাবা বলে, একটা চটি কিনে নিয়ো। দেখে শুনে কিনো, চট করে হারিয়ে ফেলতে যেন মায়া হয়।

মুখটা যতটা সম্ভব গোবেচারা গোছের রেখে দু'পা এগিয়ে আসে মৈনাক। বাবার হাত থেকে দুটো নীলপাতির অপমান মাখানো প্রশ্রয় তুলে নেয়। বাবা আর একটাও কথা না বলে কাগজে মুখ ঢাকে।

দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোন পেরোয় মৈনাক। সদরে পা রাখতে যাবে। ওপর থেকে কচি গলায় ডাক, ও মনুকাকা, ও মনুকাকা! এ দিকে তাকাও।

মাথা তোলে মৈনাক। মেজজ্যাঠার পোর্সান থেকে সোনাদার ছেলে ডাকছে। ব্যাটা ছ'বছর বয়সেই মহা বিচ্ছু হয়েছে। সারাদিন বাড়ি মাথায় করে রাখে। মৈনাক বলে, কী বলছিস?

দোতলার জানলার গরাদ ধরে বিল্টু বলে, তুমি বাজার যাচ্ছ?

হ্যাঁ, কেন?

বাবা না, অনেকক্ষণ বাজার গেছে। ফিরছে না। বোধহয় হারিয়ে গেছে, তুমি যদি... বিল্টুর কথার মাঝে বউদি হাসতে হাসতে ওর পিছনে এসে দাঁড়ায়। বলে, হ্যাঁ গো মনু, সেই কখন গেছে, মনে হয় বসে গেছে আড্ডায়। দেখলে একটু বাড়ির কথা মনে করিয়ে দিয়ো তো।

মৈনাকও হেসে ফেলে। 'ঠিক আছে, পাঠিয়ে দিচ্ছি' বলে সদর পার হয়।

বাজার বাড়তে বাড়তে এখন প্রায় রবীন্দ্র সরণি ছুঁয়েছে। সবজিওলারা বসে পড়েছে রাস্তায়। গিজগিজে ভিড়। বাঙালিরা ভীষণ বাজার করতে ভালবাসে।

বেশিরভাগ লোকের বাড়িতেই এখন ফ্রিজ, অথচ রোজ বাজার আসা চাই। মাছওলা, সবজিওলারা অনেকেই বড় ফ্রিজ থেকে বার করা মালই বিক্রি করছে। অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে মায়ের লিস্ট অনুযায়ী বাজার করছে মৈনাক। আর মাঝেমধ্যেই দৃষ্টি বোলাচ্ছে চার দিকে, সোনাদা কোথায় গেল। নিতাইয়ের চায়ের দোকানে আড্ডা মারে ওদের গ্রুপ। বাজারে ঢোকার মুখে সেখানে চোখ বুলিয়েছে মৈনাক। অনেকেই আছে, সোনাদা নেই। ভেবেছিল গিয়ে জিজ্ঞেস করবে, সোনাদা এসেছিল কি না? তারপর ভাবে, নেই যখন, আড্ডা মেরে হয়তো বাজারেই এসেছে। কিন্তু এত ভিড়ে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সোনাদাকে আলাদা পেলে ভাল হত, পারমিতাদির কলকাতায় ফেরত আসার খবরটা দিতে পারত মৈনাক। খুব কি তাতে চমকাত সোনাদা? বোধহয় না। পারমিতাদির অধ্যায় ওর কাছে হয়তো ফিকে হয়ে গেছে। প্রায় কুড়ি না কি বাইশ বছর ব্যবধান। আর ওদের মধ্যে দেখা হয়নি। এর মাঝে সোনাদার জীবনে অনেক ঘটনা ঘটেছে, মানুষ হিসেবেও একদম অন্য রকম হয়ে গেছে সোনাদা। বলা যায় ব্যক্তিত্বটাই বদলে গেছে। এখন অনেক বিনয়ী, অযথা নম্র, ভদ্র। জীবনের নানান ঘাত প্রতিঘাত সোনাদাকে এমনটা করেছে। ছোটবেলায় এই সোনাদাই ছিল মৈনাকের আইডল। সব সময় সোনাদার পিছন পিছন ঘুরত মৈনাক। সব ছোটরাই ঘুরত। হিসেব মতো সোনাদাই ছিল বাড়ির বড় ছেলে। বড়জ্যাঠার দুই মেয়ে। বেলিদি সোনাদার থেকে বড়, নীলাদি ছোট। মৈনাকের সঙ্গে সোনাদার বয়সের তফাত প্রায় পনেরো বছরের। বেশ ডাকাবুকো ছেলে ছিল সোনাদা। দেখতেও যেমন সুন্দর, খেলাধুলো, পরের বাড়ির ফলফুল চুরি করা থেকে বেপাড়ায় গিয়ে মারপিট, সবেতেই চৌকশ। পারমিতাদির সঙ্গে প্রেম ছিল। মৈনাকের মাধ্যমে বহু চিঠি চালাচলি হয়েছে। ইনফ্যাক্ট ওদের জন্যেই ক্লাশ ফোর ফাইভে প্রেম ব্যাপারটা কী, মোটামুটি একটা ধারণা পেয়ে গিয়েছিল মৈনাক। আর ক্লাশ সিক্সে দেখা একটা দৃশ্য, মৈনাকের চেতনায় যৌনতার যাদুস্পর্শ এনে দেয়। ওই দুর্লভ মুহূর্ত মৈনাকের জীবনে কখনও আসেনি, হয়তো আসবে না। তখন গরমের ছুটি চলছে। সারা বাড়িতে ভরদুপুরের নিস্তব্ধতা। সোনাদাকে খুঁজতে মৈনাক উঠে আসছিল ছাদে। সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো দাঁড়িয়ে যায়, সামনে তখন অদ্ভুত এক অলৌকিক দৃশ্য। চিলেকোঠার ঘরে সোনাদা আর পারমিতাদি গভীর আশ্লেষে চুম্বনরত।

দম বন্ধ করে সবিস্ময়ে কতক্ষণ তাকিয়েছিল জানে না মৈনাক। এক সময় কেমন ভয় ভয় করতে থাকে। পা টিপে টিপে নেমে আসে নীচে।

শরীরটা অল্প কাঁপছে, দৌড়ানোর শক্তি নেই, কোনও ক্রমে নিজেদের ঘরে গিয়ে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছিল মৈনাক।

তারপর সোনাদার সঙ্গে চার দিন কথা বলেনি, পারমিতাদির সঙ্গেও না। কখনও ওদের খুব খারাপ মনে হচ্ছে, কখনওবা মনে হচ্ছে আবার যদি ওরা... দৃশটা ততক্ষণে মনের গভীরে গেঁথে গেছে। কোনও খাজুরাহো, কোনারক ওই দৃশ্যকে আজও ম্লান করতে পারেনি। একে অপরের জন্য কতটা তৃষ্ণার্ত হলে, চুম্বন ও রকম পবিত্র কামনায় পৌঁছয়, সে অভিজ্ঞতা আজও হয়নি মৈনাকের, যদিও এ তাবৎ বেশ কিছু চুম্বন অভিজ্ঞতা তার আছে।

দাদা, কুমড়োর পয়সাটা!

দাম না দিয়েই অন্যমনস্ক ভাবে চলে যাচ্ছিল মৈনাক। খুবই কুণ্ঠিত হয়ে সবজিওলাকে পয়সা মেটায়। এই ভিড়ে ঠাসা বাজারে এ সব কী ভাবছে সে!

আলু, পেঁয়াজ, আনাজ সব নেওয়া হয়ে গেছে, বাকি রইল শুধু মাছ। ওটা ছাউনি দেওয়া আসল শোভাবাজারে নিতে হবে। মাছের বাজারের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ মৈনাকের মাথায় আসে, কাল রাতের ফোনটা পারমিতাদি করেনি তো? খোঁজ নিচ্ছিল, মৈনাক ঠিক মতো বাড়ি পৌঁছেছে কি না!

সম্ভাবনাটা সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দেয় মৈনাক, তাদের বাড়ির ফোন নাম্বার পারমিতাদির জানার কথা নয়।

অনেক মাথা খাটিয়ে, মাছ এবং মাছওলার চেহারা দেখে, আশ্বস্ত হয়ে, পাঁচশো গ্রাম পাবদা দিতে বলে মৈনাক। তখনই কাঁধে হাতের স্পর্শ, মাছটা নিস না। ভাল হবে না। ট্যাংরা নে।

ঘাড় ফেরাতে মৈনাক দেখে, সোনাদা। বলে, এই দেখো, তোমাকেই খুঁজছিলাম। তুমি নাকি অনেকক্ষণ বাজারে বেরিয়েছ। বউদি বলল, তাড়াতাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দিতে।

আর বলিস না, বাজারের মুখেই ধরল সুবোধজেঠু। নিয়ে গেল লাইব্রেরিতে। নানান অভিযোগ পাড়ার লোকেদের ওপর। কেউ না কি লাইব্রেরির কথা ভাবে না। রিনিউ করায় না মেম্বার কার্ড। রিডার ভীষণ কমে গেছে। তা আমি একা এ সব শুনে কী করব বল।

তুমি আপাতত তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও। বিল্টুও তোমার জন্য লাফাচ্ছে।

হ্যাঁ, যাই। আমার তো হয়েই গেছে। তোকে দেখেই দাঁড়ালাম, হঠাৎ তুই আজ বাজার করছিস! কাকার শরীর ভাল তো?

হ্যাঁ, ভাল। একটু নেট প্রাকটিশে পাঠিয়েছে আর কী।

মৈনাকের কথা শুনে সোনা হাসতে থাকে। বলে, ঠিক আছে, তুই বাজার কর, আমি এগোই।

সোনাদার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে মৈনাক, কীরকম যেন অচেনা লাগে। সেই সোনাদা আর নেই।

ট্যাংরাই দিলাম ভাই, দাদা যখন বলে গেলেন।

মাছওলার কথায় সংবিৎ ফেরে মৈনাকের। থলে বাড়িয়ে মাছ নিয়ে, টাকা দেয়। মাছের বাজার থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে মৈনাক ভাবে, আজ কেন এত অতীতের কথা মনে পড়ছে? পারমিতাদির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই ঘটছে ব্যাপারটা। সোনাদারও কি মনে পড়ে পারমিতাদির কথা?

পাড়ার সব লোক, দোকানদার, ভিক্টোরিয়ার আমলের টাইম কল, ল্যাম্প পোস্ট সব্বাই জানত সোনাদা, পারমিতাদির অ্যাফেয়ারের কথা। নিশ্চিত ছিল বিয়ে ওদের হবেই। কিন্তু কোথা থেকে কী হয়ে গেল, মেজ জ্যাঠা আচমকাই একদিন থিয়েটার পাড়ার এক নায়িকার সঙ্গে ভেগে পড়লেন। পাড়ায় ঢিঢি পড়ল। তার আগে চ্যাটার্জিবাড়িকে সবাই একটু সম্ভ্রমের চোখে দেখত। ওই পরিবারের ইতিহাসে দু'জন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। একজন বড় গায়ক। ভাল অভিনেতা হিসেবে মেজজ্যাঠাকেও লোকে মান্যগণ্য করত। দুটো বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছিলেন, অনেকে আবার সমালোচনা করত ছবি বিশ্বাসের নকল বলে। সেই কারণেই হয়তো মেজজ্যাঠা আর সিনেমার দিকে যাননি, নাটককে ধ্যান জ্ঞান করেন। তখন হাতিবাগানের থিয়েটার পাড়ার শেষ অবস্থা। মেজজ্যাঠার আর্থিক অবস্থাও ভাল নয়, তার মধ্যে সংসারকে অকূল পাথারে ফেলে পালিয়ে গেলেন। এই ঘটনার পেছনে সেই অভিনেত্রীর কতটা ইন্ধন ছিল জানে না মৈনাক। তার এখনও কেন জানি মনে হয়, মেজজ্যাঠা পালিয়েছিলেন।

মেজজ্যাঠার অভিনীত দু'-চারটি নাটক ছোটবেলায় মৈনাক দেখেছে, যতটুকু স্মৃতি উদ্ধার করতে পারে, আন্দাজ করা যায় খুবই উঁচুমানের অভিনেতা ছিলেন। ওই জাতের শিল্পীদের বোধহয় সংসারে বাঁধা যায় না।

চিরকালের স্বভাবশান্ত মেজ মা একদম ভেঙে পড়লেন। সোনাদার মামার বাড়ির লোকেরা থানা পুলিশ করল। স্বাধীনতা আন্দোলনের পর সেই প্রথম পুলিশ ঢুকল চ্যাটার্জিবাড়িতে। কিছুদিন যেতে সব ধামাচাপা পড়ে গেল। বাবারা আলোচনা করত, মেজজ্যাঠা না কি অভিনয় ছাড়া থাকতে পারবে না, কোনও দিন

হঠাৎ যাত্রার বিজ্ঞাপনে ভেসে উঠবে মেজ জ্যাঠার মুখ। উঠল না। মানুষটা একদম ভ্যানিশ হয়ে গেলেন।

কলেজ ছেড়ে সোনাদা তখন কলেজ স্ট্রিটের একটা প্রেসে কাজে ঢুকল। সোনাদার ছোট ভাই অনুদা কিন্তু পড়াশোনা চালিয়ে গেছে। সংসারের সব খরচ সামলেছে সোনাদা। কখনও জ্যাঠা-কাকার কাছে হাত পাতেনি।

মেজজ্যাঠা পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে বাড়ির অন্য সবাই পুরোপুরি বয়কট করেছিল সোনাদাদের, পাঁচিল ভেঙে তাদের জন্য আলাদা দরজাও করে দেওয়া হয়েছিল। সোনাদারা আজও বাড়ির মূল দরজা ব্যবহার করে না।

ওই খারাপ সময়েও পারমিতাদিকে দেখা যেত, সোনাদাদের দরজা দিয়ে ঢুকতে। খড়পট্টির ঘাটে পাড়ার কোনও গলিতে কখনও সখনও ওদের দেখা যেত গল্প করছে দাঁড়িয়ে। গুরুজনদের বকুনির ভয়ে মৈনাক এড়িয়ে যেত ওদের। মনে একটাই শান্তি ছিল, এত বিপদে ওদের সম্পর্ক নষ্ট হয়নি।

তারপর আচমকাই একদিন পারমিতাদির বাড়ির ছাদে প্যান্ডেলের বাঁশ বাঁধা শুরু হল। মৈনাকদের বাড়িতেও এল বিয়ের কার্ড। পাত্রের নাম পড়ে মৈনাকের তো দিশেহারা অবস্থা। আড়েঠাড়ে সোনাদার দিকে নজর রাখছে, তার কিন্তু কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। নহবতের গেটে রঙিন কাপড় পড়ে গেল, দিব্যি সামনে দিয়ে কাজে যাচ্ছে সোনাদা।

প্রেম ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে না করতেই, মৈনাকের চোখের সামনে ভেঙে পড়ছিল বিশ্বাস। মনে হচ্ছিল ওদের মেলামেশাটা পাপ ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

কথাটা যে কত মিথ্যে, প্রমাণ পাওয়া গেল পারমিতাদির বিয়ের পরের দিন। সকালবেলাই ফুল সাজানো গাড়িতে বরের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে পারমিতাদি। কনেবিদায় দেখে বাড়ির উঠোনে পা রেখেছে মৈনাক, মেজজ্যাঠার পোর্সান থেকে মেজমার গুঙিয়ে-গুঙিয়ে কান্না ভেসে আসে। কান্নাটার মধ্যে ভয় মেশানো কী যেন একটা ছিল, মৈনাক চুপিসাড়ে মেজজ্যাঠার পোর্সানে যায়। তারপর কান্না ফলো করে পৌঁছয় একদম চিলে কোঠার ঘরে, দৃশ্য দেখে চমকে ওঠে, উশকোখুশকো চুল, চোখে পাগলাটে চাউনি, মোটা দড়ি হাতে মেঝেতে বসে আছে সোনাদা। পায়ের সামনে বসে কাঁদছে মেজমা। বলছে কেন এ রকম কাণ্ড ঘটাতে যাচ্ছিলি? তুই ছাড়া আমাদের আর কে আছে বল!

মৈনাক দ্বিতীয় বার চুপিসাড়ে নেমে আসে সিঁড়ি ভেঙে। এই চিলেকোঠার ঘরেই ও একদিন অলৌকিক সুন্দর যৌনতাকে প্রত্যক্ষ করেছিল।

পরের দিন, বউভাত। মৈনাককে দেখে, কনের সিংহাসন থেকে নেমে

এসেছিল পারমিতাদি। আড়ালে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে জানতে চায়, তোর সোনাদা এখন কোথায়, কী করছে?

উত্তরে মিথ্যে বলেছিল মৈনাক, বাসে ওঠার আগে দেখলাম, রাজবাড়ির রকে আড্ডা মারছে। একটু হয়তো আহত হয়েছিল পারমিতাদি। কিন্তু বিরাট বিপদের হাত থেকে তো রক্ষা পেল।

এখন দু'জনেই আলাদা ভাবে ভাল আছে, সুখে আছে। এর পিছনে মৈনাকের সামান্য অবদানের কথা ওরা জানে না। জানলে, ছোট একটা কমপ্লিমেন্ট মৈনাক পেতই।

প্রেসে কাজ করতে করতে সোনাদা প্রাইভেটে গ্র্যাজুয়েশন করল। তারপর চাকরি পেল 'ভোরের বার্তা' কাগজে। অনুদাও ততদিনে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা করে, দুম করে চাকরি পেয়ে চলে গেল কানপুর। এখন কদাচিৎ আসে। তবে বাড়ির খোঁজখবর নিয়মিত নেয়। অল্পদিনের আলাপ পরিচয়ে সোনাদা বিয়ে করল সুতপা বউদিকে। বউদি ভোরের বার্তায় ফ্রি-ল্যান্স করত। এখন সেসব ছেড়ে দিয়েছে। গুছিয়ে সংসার করতে ভীষণ ভালবাসে। বউদির মিষ্টি স্বভাবের জন্যই সোনাদারা আবার বাড়ির সবার সঙ্গে মিশে গেল। এখন আর কেউ মেজজ্যাঠার পোর্সান এড়িয়ে চলে না। মেজজ্যাঠার অস্তিত্ব পড়ে রইল শুধু মেজ মার সিঁথিতে। মেজমা এখনও আশা করে জ্যাঠা এক দিন ঠিক ফিরে আসবে।

পারিবারিক পরিস্থিতি একটু থিতোতেই সোনাদার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল, মেজজ্যাঠার অনুসারী গুণ। অভিনয় করার বদলে নাটক লেখা শুরু করল সোনাদা। পাড়ার নাটক দলে অভিনীত হল সেটা। একটু যেন সাড়াও ফেলল। তারপরই সোনাদার লেখা পর পর দুটো নাটক কলকাতার বড় একটা নাটকের দল নিল। লাস্ট নাটকটা জমে গেল। খবরের কাগজে, পত্রিকায় মৈনাকের সোনাদা হয়ে গেছে অনীশ চট্টোপাধ্যায় পাড়ার লোকরাও এখন ওর ভাল নামটা জেনে গেছে।

দু'-এক জায়গায় 'আমি অনীশ চট্টোপাধ্যায়ের ভাই' বলে, বেশ সম্ভ্রম আদায় করতে পেরেছে মৈনাক। সে কথা অবশ্য এখনও সোনাদাকে জানানো হয়নি।

গত পুজোয় 'ভোরের বার্তা'র শারদীয়াতে একটা উপন্যাসও লিখেছে সোনাদা। বাড়ির অনেকের পড়া হলেও, মৈনাকের এখনও হয়নি। টানা চার দিনের জ্বর অথবা বেড়াতে গেলেই পড়ে ফেলবে।

নতুন পরিচয়ে সোনাদা নিশ্চয়ই এখন সুখী। চিলেকোঠার ঘরে আত্মহত্যা করতে যাওয়াটাকে এখন ছেলেমানুষি ভাবে। কাল পারমিতাদির সঙ্গে অত কথা

বলার মাঝে এক বারও সোনাদার প্রসঙ্গ তুলল না। সরাসরি না হোক ঘুরিয়ে তুলতে পারত।

ওরা বোধহয় একে ওপরকে ভুলে যেতে পেরেছে। তার মানে আজকালকার দিনে প্রেমের স্মৃতি বলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে অনায়াসেই সব কিছু ভুলে যায় মানুষ। ঠিক এই সময়ই মৈনাকের মনে পড়ে গেল রাহুল বোসের কথা। ব্যাটা নির্ঘাত মানবরূপী শয়তান। ইচ্ছে করে প্রেমের গল্প চেয়ে রানাদা, মৈনাককে বিভ্রান্ত করছে।

বাড়ির গলিতে ঢুকে পড়েছে মৈনাক। দেখে, হন্তদন্ত হয়ে সোনাদা হেঁটে আসছে। মুখোমুখি হতে মৈনাক বলে, কী হল, আবার কোথায় চললে?

দেখ না, সরষে আনতে দিয়েছিল। ভুলে দোকানে ফেলে এসেছি। বলে, পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল সোনাদা। মৈনাক ডাকে, সোনাদা।!

কী রে? বলে, সোনাদা ঘুরে দাঁড়ায়। মৈনাক বলে, কাল একটা ক্লাবে পারমিতাদির সঙ্গে দেখা হল। বর আর মেয়েও ছিল সঙ্গে। ওদের গাড়িতেই ফিরলাম। ওরা পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় চলে এসেছে।

কী যেন একটু ভেবে নিয়ে সোনাদা স্বগতোক্তির মতো বলে, জানতাম, তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে যায়।

মৈনাকের শরীরে ততক্ষণে কাঁটা দিয়েছে, আজ ভোরের স্বপ্নে, সোনাদা এই ডায়লগটাই দিয়েছিল, 'জানতাম'!

মেয়ে এখনও ফিরল না। একটু বেলা করেই অবশ্য বেরিয়েছে। আজ ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে পারমিতার। এই প্রথম মেয়ে তাকে ডেকে, হাতে চায়ের কাপ তুলে দিয়েছে। পারমিতা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, তুই করলি! না কি বাবা...

না, আমিই করেছি। ওখানে তো নিজেই চা করে খাই। দাদু-দিদার চা খাওয়ার অভ্যেস নেই।

চায়ে চুমুক মেরে সন্তুষ্ট হয়েছিল পারমিতা, মেয়ের রান্নার হাতটা মনে হচ্ছে ভালই হবে। তারপর বলে, বাবাকে দিয়েছিস?

হ্যাঁ, বাবা ইজ টোটালি ইমপ্রেসড। বলেছে, এ বার থেকে যে ক'টা দিন কলকাতায় থাকবি, তুই-ই চা করিস।

কথাটা শোনার পর একটু কি খারাপ লাগা উচিত ছিল, সে রকম কোনও ফিলিং হল না। সলিল তাকে ছোট করতে চাইলেও কিছু এসে যায় না পারমিতার। চা খাওয়ার পরই আহেলি ট্র্যাক সুট পরে রেডি হয়ে গেল। বলল, একটু জগ করে আসি।

পারমিতা আশঙ্কিত হয়ে বলে ওঠে, না না, তুই সল্ট লেকের কিছুই চিনিস না, ফিরতে পারবি না বাড়ি চিনে।

না, মা কোনও প্রবলেম হবে না। আমি ঠিক ফিরে আসব।

মেয়ের কথায় আশ্বস্ত না হয়ে পারমিতা গিয়েছিল সলিলের কাছে। সলিল তখন নিউজ পেপারে চোখ বোলাচ্ছে, এর পরই শেভ করে অফিসের জন্য রেডি হবে। পারমিতা গিয়ে যখন বলল, মেয়ের সঙ্গে তুমিও যাও। গুরুত্ব দিল না সলিল। বলল, ওকে অত বোকা ভেবো না, ফিরে আসবে ঠিক।

সলিল এখন বাথরুম। এই সময়টা ওর বেশ টাইম লাগে। শেভ করে, ফ্রেশ হয়ে বেরোবে। পারমিতার কিচেনের কাজ প্রায় শেষ। সলিল ব্রেকফাস্ট করে আটটা নাগাদ অফিস বেরিয়ে যাবে। ও এখন কলকাতা অফিসের হেড।

মেয়ে পরশুই ফিরে যাবে শান্তিনিকেতনে। পরে কবে আসবে এখনও বলেনি। শান্তিনিকেতনটা ওর প্রথম থেকেই অ্যাডজাস্ট করে গেছে। অথচ আহেলি যখন দিল্লিতে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করল। কথার কথা তুলেছিল পারমিতা, আমার খুব ইচ্ছে গ্র্যাজুয়েশনটা তুই বিশ্বভারতী থেকে কর। আসলে কিশোরীবেলায় পারমিতারও ইচ্ছে ছিল শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করবে। এ ব্যাপারে ইন্ধন জুগিয়েছিল বাবা। ছুটিছাটা পেলেই বউ-মেয়ে নিয়ে চলে যেত শান্তিনিকেতনে। সেখানে পারমিতার জ্যাঠা থাকেন। পড়াতেন বিশ্বভারতীতে। জ্যাঠার গুরুপল্লীর বাড়ি, শান্তিনিকেতনের পরিবেশ পারমিতাকে টানত। বাবা মোটামুটি রাজি হয়ে গিয়েছিল ওখানে পড়াতে. মাকে রাজি করানো গেল না। থাকতে পারবে না মেয়েকে ছেড়ে। ওখানে না পড়তে পারার আক্ষেপটা মনের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল। নিজের সেই আকাঙ্ক্ষাটা যদি মেয়ের মধ্যে দিয়ে পূরণ করা যায়। সেই ইচ্ছেতেই তুলেছিল কথাটা। আহেলি যদি রাজি না হত, জোর করত না পারমিতা। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, মেয়ে এক কথায় রাজি। সলিল শুধু বলেছিল, ছোট থেকে বাংলার বাইরে আছে, পারবে অ্যাডজাস্ট করতে?

এর থেকে বেশি বলার অধিকার সলিলকে দেয়নি পারমিতা। পরের কথায় চলে গিয়েছিল, রিটায়ারমেন্টের পর জ্যাঠামশাই ওখানেই আছেন। আমি ফোন করে কথা বলে নিচ্ছি। তুমি ছুটির ব্যবস্থা করে রাখো। ওঁর বাড়িতেই গিয়ে উঠব

আমরা। আহেলি যদি অ্যাডমিশন টেস্টে অ্যালাউ হয়ে যায়, হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করবে।

অনায়াসে অ্যাডমিশন টেস্টে পাশ করে গেছে আহেলি। হস্টেলেও থাকতে হয়নি। জ্যাঠামশাই বলেছেন, আমরা থাকতে হস্টেলে কী থাকবে! তা ছাড়া ফার্স্ট ইয়ার হস্টেলে জায়গা পাবে না। মেসে থাকতে হবে। অত ঝামেলায় যাওয়ার কোনও দরকার নেই। এই বিরাট বাড়িতে আমরা দুটি প্রাণী। কেউ সঙ্গে থাকলে ভালই লাগবে আমাদের। অবশ্য তোর মেয়ের যদি আমাদের সঙ্গ ভাল না লাগে, তা হলে অন্য কথা।

জ্যাঠা নিঃসন্তান। আহেলিকে পেয়ে খুশিই হয়েছেন। আহেলির নিশ্চয়ই সুবিধে হয়েছে, নতুন জায়গায় ঘরের লোক পেয়ে। তবে ওর ওখানে এতটা মন বসে যাবে ভাবতে পারেনি পারমিতা। ভর্তি হওয়ার পর আহেলি গত ছ'মাসে এক বার মাত্র দিল্লি গেছে। তাও যেন ফিরে আসতে পারলে বাঁচে। দিল্লিতে ওর কিছু কম বন্ধু নেই, তাদের সঙ্গে ঘুরল, হইচই করল। ফিরে যাওয়া নিয়ে কোনও মন খারাপ নেই। এমনকী যাওয়ার দিন হাসি মুখে রয়ে গেল সারাক্ষণ পারমিতা মাঝে ফোন করে জ্যাঠামশাইকে জিজ্ঞেস করেছিল, কেমন আছে আমাদের কথা বলে? মন খারাপ করে থাকে না তো? যদি বলো ক'দিন গিয়ে থেকে আসতে পারি।

জ্যাঠামশাই মজা করে বলেছিলেন, সে তুই আসতেই পারিস, মেয়ে তোকে ভুলে গেছে কিনা দেখতে। ও কিন্তু দিব্যি আছে।

বন্ধুবান্ধব...

হয়েছে। তবে আড্ডায় তেমন ঝোঁক নেই। ক্লাস শেষ হলেই বাড়ি চলে আসে।

দিল্লিতে থাকাকালীনও বন্ধুদের সঙ্গে খুব বেশি মাখামাখি করত না। হাসছে গল্প করছে ওরা চলে গেলেই একদম নির্বিকার ভঙ্গি। আগের উচ্ছ্বাসটা তখন অ্যাক্টিং মনে হত। চিরকালই একটু চুপচাপ থাকতে ভালবাসে। কিছু দিন আগে ফোনে জেঠিমা কী একটা প্রসঙ্গে বললেন, সম্পূর্ণ বিপরীত কথা, ওঃ, তোর মেয়েটা না হয়েছে, অবিকল তোর মতো। তুই যেমন ছোটবেলায় সারাক্ষণ আমার পিছন-পিছন ঘুরতিস আর বকবক করতিস, আহেলিও তাই। মাঝেমধ্যে ভুল হয়ে যায়, মনে হয় বুঝি তুই-ই ঘুরছিস সঙ্গে।... আরও অনেক কিছু বলছিলেন জেঠিমা, পারমিতা অন্য চিন্তা করছিল, আহেলি তো দিল্লির বাড়িতে থাকতে এত কথা বলত না। তার মানে কম কথা বলা ওর স্বভাব নয়, ইচ্ছে করেই বলত না। আর একটা জিনিসও মনে পড়ে, খুব ছোট থেকেই মেয়েটার মুখে খই ফুটত, যত বড় হয়েছে, ক্রমশ শান্ত হয়ে গেছে। কেন? এ সব ক্ষেত্রে বাবা-মার রিলেশনশিপ

একটা বড় কারণ। কিন্তু সে দিক দিয়ে দেখতে গেলে, পারমিতা, সলিল কোনও দিনই উঁচু গলায় ঝগড়া করেনি, আবার খুব কোল্ড বা ফর্মাল থেকেছে, তাও নয়। তা হলে কোথাও একটা ফাঁক থেকে গেছে অভিনয়ে।

আমি কিন্তু রেডি। ডাইনিং স্পেস থেকে ভেসে আসে সলিলের গলা। পারমিতারও ব্রেকফাস্ট তৈরি, ট্রেতে সাজিয়ে ডাইনিং-এ যায়। সলিল চেয়ারে বসে অফিসের একটা ফাইল দেখছে, টেবিলেই ব্রিফকেস। ড্রেসও কমপ্লিট।

টেবিলে প্লেট নামিয়ে পারমিতা বলে, মেয়েটা এখনও ফিরল না, আমার তো টেনশন হচ্ছে।

ফাইল থেকে মুখ তুলে গার্জেন মার্কা হাসি হাসে সলিল। বলে, মেয়ে কাছে থাকলে একটু টেনশন হবেই। ও যখন শান্তিনিকেতনে থাকে, তুমি দেখতে যাও, কখন বাড়ি ফিরল?

ওটা কোনও কথা হল না। সল্ট লেক জায়গাটা ওর কাছে নতুন। কলকাতাও এখন আর তেমন সেফ নয়।

জবাব না দিয়ে স্যান্ডউইচ আর কফি এক সঙ্গে খেয়ে যাচ্ছে সলিল। ওর এই নির্বিকার ভঙ্গিকে আক্রমণ করে এক্ষুনি একটা কথা বলতে পারে পারমিতা। বলতে কেমন জানি আশঙ্কা হয়, এর আগে এত বার কথাটা বলেছে, ধার নষ্ট হয়ে যায়নি তো? সেই প্রসঙ্গে না গিয়ে পারমিতা বলে, তুমি আজই ওকে একটা সেল ফোন কিনে দাও, তা হলে আমার এত চিন্তা করার থাকে না।

পারমিতার দিকে না তাকিয়েই সলিল বলে, দিতেই পারি, কিন্তু দেখতে হবে ও সেটা ব্যবহার করতে রাজি কি না?

রাজি না হওয়ার কী আছে? একটু যেন ঝাঁঝিয়ে বলে ওঠে পারমিতা।

সলিল ঠান্ডা গলায় বলে, শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন তো ওটার দরকার পড়বে না, জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে ফোন করে জানতেই পারছ মেয়ের খবর। খামোকা আর একটা যন্ত্র দিয়ে ওকে বেঁধে রাখা পছন্দ করবে না হয়তো।

সলিলের কথায় যেমন যুক্তি আছে, একটা নেগেটিভ ইঙ্গিতও লক্ষ করা যাচ্ছে। একজন মা নাগালের মধ্যে মেয়েকে রাখতেই চাইবে, এর মধ্যে খারাপটা কী আছে!

সলিলের খাওয়া হয়ে গেছে। উঠে পড়েছে টেবিল ছেড়ে। পারমিতা বলে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে আশপাশটা একটু দেখে নাও না, তারপর না হয় অফিসে যেয়ো।

সরি, আই অ্যাম অলরেডি লেট। তা ছাড়া এত ওয়ারিড হওয়ার কিছু নেই

আধ ঘণ্টা হয়নি মেয়েটা বেরিয়েছে। এক্ষুনি ফিরে আসবে। বলে ব্রিফকেস হাতে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সলিল। বহু ব্যবহৃত সেই কথাটা আবার মুখে এসে গিয়েছিল পারমিতার। ঢোক গিলে বলে, ঠিক আছে তুমি যাও, আমিই একটু এদিক ওদিক ঘুরে দেখি।

কথাটা শুনে ঘুরে দাঁড়ায় সলিল। হেসে বলে, খবরদার ও কাজটা কোরো না, শেষে দেখা যাবে আহেলি ফিরে এসেছে, তুমি রাস্তা ভুলে ঘুরে মরছ। তার থেকে যদি বলো, গাড়িটা রেখে যাই।

না, থাক। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে পারমিতা। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে গেটের কাছে অপেক্ষা করছে মন্টু, রুটিন মাফিক সলিল গাড়িতে উঠে, হাত নেড়ে বেরিয়ে যায়।

বাড়ি জুড়ে নেমে আসে ভারী পাথরের মতো নিস্তব্ধতা। কাজের একটা লোক জোগাড় হয়েছে, আসবে দুপুরে। মেয়েও পরশু থেকে থাকবে না। সলিল অফিস থেকে ফিরে না আসা অব্দি এতটা সময় এ বার থেকে কী করে কাটাবে পারমিতা!

যদিও সলিল থাকলেই যে দু'জন বসে অনেক কথা হবে, এ রকমটা নয়। হয়তো দু'জন দু'ঘরে বসে কাটিয়ে দিল বাকি সময়, তবু তো জানতে পারছে, কাছাকাছি কেউ আছে।

দিল্লিতে পরিস্থিতি একই ছিল, সলিল অফিসে, মেয়ে স্কুলে, সেই সময়টুকু একলাই কাটাতে হত পারমিতাকে। তখন কিন্তু খুব একটা অসুবিধে হয়নি। কলকাতায় আসার পর থেকে বেশি একা লাগছে। কেন যে লাগছে?

ঘরে ফিরে এসেছে পারমিতা। ফোন সেটের দিকে চোখ যায়, এখানে এসে থেকে ফোনটা মোটামুটি নীরব আছে। পারমিতা নিজের কোনও আত্মীয়, পুরনো বন্ধুকে জানায়নি, সে কলকাতায় ফিরেছে। সলিলের রিলেটিভরাও বোধহয় জানে না। তা হলে এতদিনে দু'-একটা ফোন আসত।

কলকাতায় এত আত্মীয়স্বজন, পঁচিশ তিরিশ মিনিট বাসে গেলেই পারমিতার বিয়ের আগের বেলা। কাছাকাছি এ সব আছে বলেই আরও একা লাগছে। এ বার ভাবছে দু'-একজনের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে নেবে। কিন্তু তার আগে যদি ওর সঙ্গে একবার দেখা হয়ে যেত, ভাল হত। ও যদি পারমিতাকে চিনতেই না চায়, ভুলে যাওয়ার ভান করে। তা হলে পারমিতা আবার অন্য কোথাও বদলি নিতে বলবে সলিলকে।

গতকাল মনুর সঙ্গে দেখা হল, এক বারও পারমিতা মুখ ফুটে ওর কথা জিজ্ঞেস করতে পারল না। অনীশের বাইরের খবর মোটামুটি পায় পারমিতা,

ডালিয়া ফোন করে জানাত দিল্লিতে। বউ না কি খুব মিষ্টি হয়েছে, একটা ছেলেও হয়েছে ফুটফুটে। লেখালিখি করে নাম হয়েছে, সে খবরও পেয়েছে, পাইনি ভেতরের খবর। অনীশ কি সুখী হয়েছে? পারমিতাকে না পেয়ে একটু যেন মন খারাপ ওর সব সময়ের সঙ্গী। প্রায়ই কলহ বিবাদ করে ফেলে সংসারে। এই সব আচরণের মানেই বুঝতে পারে না ওর স্ত্রী, এ ধরনের খবরগুলো তো দেবে মনু। অথচ তাকেই কিছু জিজ্ঞাসা করা হল না।

যে সব অশুভ কামনা অনীশের জীবনের জন্য করছে পারমিতা, এই খারাপ ব্যাপারগুলো নিজের জীবনেও বহন করছে। সে যখন খারাপ আছে অনীশ কেন থাকবে না? তা হলে আর ভালবাসার মানে কী!

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে যেতে হেসে ফেলে পারমিতা। তখন সে ইলেভেন। সর্দি-জ্বর হয়েছে। বাড়ি থেকে বেরতে পারছে না। দু'দিন হয়ে গেল অনীশের সঙ্গে দেখা নেই। খুব দরকার ছাড়া পারমিতাদের বাড়িতে আসত না অনীশ। পারমিতার মা পছন্দ করত না। নিজে না এসে দূত পাঠাল। মনু এসে খবর নিয়ে গেল পারমিতাদির ভীষণ জ্বর। আধ ঘণ্টার মধ্যে সে হাজির। বিছানায় আধশোয়া হয়ে পারমিতা গল্পের বই পড়ার চেষ্টা করছিল, শুনতে পায় অনীশের গলা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করছে, শুনলাম পারমিতার জ্বর...

হ্যাঁ, তেমন কিছু নয়, যাও না ভেতরে।

ভাগ্যিস বাড়িতে মা তখন ছিল না। অনীশ সোজা এসে ঢুকল পারমিতার ঘরে। তার একটু আগেই চাদর টেনে চোখ বুজে শুয়ে পড়েছে পারমিতা। চোখ বুজে আছে, এ দিকে অনীশের কোনও সাড়া নেই। এ ঘরেই ঢুকল, না কি অন্য ঘরে চলে গেল ভুলে ... চোখ খুলতে যাবে পারমিতা, হঠাৎ টের পায় তার জ্বর-তপ্ত ঠোঁটে নেমে এসেছে শিলাবৃষ্টির বরফ।

ঝট করে চোখ খুলে পারমিতা বলে, এটা কী করলে! তুমি জানো এই জ্বরটা কত ইনফেকসাস। ঘোর লাগা গলায় অনীশ তখন বলছে, জ্বর হলে যে তোমাকে এত সুন্দর দেখায়, আগে জানতাম না। তাই লোভ সামলাতে পারিনি। কপট রাগে পারমিতা বলেছিল, দেখো, তুমিও ঠিক জ্বরে পড়বে।

পড়লে, পড়ব। তুমি ক'দিন ধরে কষ্ট পাচ্ছ. আমিও না হয় একটু ভুগব। শোধবোধ হয়ে যাবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার কথাটা মিলেও গেল। পরের দিন মনু এসে খবর দিল সোনাদার জ্বর। খবর শুনে পারমিতাকে হাসতে দেখে মনুর মুখ ভার। বলে, সোনাদার জ্বর আর তুমি হাসছ! ... মনুর অভিমানী মুখটা এখন আবার স্পষ্ট মনে

পড়ল। সেদিন যেমন জ্বর ভাগ করে নিয়েছিল অনীশ, আজ কেন মন খারাপটা নেবে না?

পুরনো কথা মনে পড়তে মেয়েকে নিয়ে টেনশনটা একটু যেন কমে গেল। নিজের বিছানায় এসে বসে পারমিতা। অনীশকে কি একটা ফোন করবে? কিন্তু নাম্বার তো জানে না। আহেলি যে ভাবে মনুর নাম্বার খুঁজে বার করল, দেখবে না কি সে ভাবে ট্রাই করে? ডিরেক্টরি ফোন সেটের পাশেই রাখা আছে। এক দৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে বসে থাকে পারমিতা, ফোন করে কী বলবে? জানতে চাইবে, কেমন আছ? উত্তরে ও বলবে, ভাল। তুমি কেমন? এ রকম কিছু শুকনো কুশল বিনিময়ের পর ফোন রেখে দেবে অনীশ। যা কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না পারমিতা। তার থেকে বরং ফোন তুলেই অনীশকে সে বলবে, আমাকে ফিরে আসতেই হল। মন খারাপ বহন করার শক্তি আমার কমে গেছে, স্পর্ধাও নিঃশেষ। খুব দ্রুত ফুরিয়ে আসছে দিন। মেয়েটাও লম্বায় এখন আমার মাথায় মাথায়। আমার কলেজবেলার ছবির সঙ্গে ওর অবিকল মিল। পৃথিবীতে আমার মতো আর একটা আমি এসে গেছে। অথচ আসল আমি তো অপূর্ণ থেকে গেলাম।

প্রতিটি নারীই জন্মায় নির্দিষ্ট একটি পুরুষের জন্য। পুরুষটির বেলায় ঘটে একই রকম। সেই দু'জনের মিলনই মনুষ্য জীবনের পূর্ণতা। আমার জীবনে সেই পুরুষটি এসেছিল, মহার্ঘ সেই ভালবাসা বার বার ছুঁয়েছে আমায়। পুরুষটিও টের পেয়েছে, আমিই তার পূর্ব নির্দিষ্ট নারী। আমিই তার ইভ। মাঝে কিছু বিভ্রম বিচ্ছিন্ন করেছে আমাদের। সেটাকে তাৎক্ষণিক ভেবে আমি দীর্ঘ এতটা বছর তোমার অপেক্ষায় কাটিয়ে দিলাম। আমি যে বড় বেশি ভরসা করেছিলাম, আমার নিখাদ, নির্মল ভালবাসার ওপর। নিশ্চিত ছিলাম, তুমি এক দিন আসবেই ... প্রত্যয়টা ধাক্কা খেল কিছু মাস আগে দিল্লিব বাড়িতে বসে। সেই প্রথম আমার হুঁশ হল, আমি অপেক্ষায় বসে থাকলে কী হবে, সময় তো আমার সঙ্গে বসে নেই। অনেকটা যেন তুমি হয়তো কারও জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছ অনন্তকাল। ভাবছ বুঝি, এই তো রাস্তা, গাছপালা সব তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। আসলে তা নয়, অলক্ষ্যে রাস্তা কিন্তু এগিয়ে চলেছে পৃথিবীর আয়ুপথ ধরে।

মাস কয়েক আগে দিল্লিতে তখন প্রবল শীত। রুম হিটার চালিয়ে, যথেষ্ট শীতপোশাক পরে ঠান্ডার সঙ্গে যুঝছে পারমিতারা। যেমন প্রতি বারই করতে হয়। কিন্তু এ বার এক অদ্ভুত উপসর্গ দেখা দিল। ঠান্ডা ঠেকানোর সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও মাঝে মধ্যে অপরিচিত এক শীতভাব হার্ট অব্দি ছুঁয়ে ফেলছিল। নিদারুণ এক স্থবির, আড়ষ্ট অবস্থা। ঠকঠক করে কাঁপুনি দিচ্ছিল শরীরে। এই

ধরনের অনুভূতির কথা কাউকে ঠিক বুঝিয়ে বলা যায় না। কথাটা তাই সলিলকেও বলতে পারেনি। বরং বিবাহিত জীবনে যে কাজটা কখনওই করেনি পারমিতা, সেটাই করতে বাধ্য হয়েছিল। মিলনের জন্য ইঙ্গিতে ডাক দিয়েছিল সলিলকে। নিজের ঘর থেকে উঠে এসে সলিল বিনা প্রশ্নে কর্তব্যে উপনীত হয়। মিলনকালীন সলিলের মুখে হয়তো বিস্ময় ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কারণ, বিয়ের পর যত বারই সলিল মিলনোন্মুখ হয়েছে, শরীর না সরিয়ে চোখ বুজে ফেলেছে পারমিতা। আগ বাড়িয়ে কোনও দিন সলিলের কাছে এগিয়ে যায়নি।

গোড়ার দিকে জোর করে চোখ খোলাতে চাইত সলিল। বলত, দেখো পারমিতা আমি। আমি সলিল। তুমি কি অন্য কারও কথা ভাবছ? ... সেই সময় দু'-এক বার চড়-চাপড় মেরেছে সলিল। কোনও লাভ হয়নি। দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল শক্ত করে পড়ে থেকেছে পারমিতা। সে তখন দুটো ব্যাপারে সতর্ক, এক, শারীরিক আবেশে সে যেন মনসুদ্ধ নিজেকে সমর্পণ করে না বসে সলিলের কাছে। দুই, ভুলেও সলিলের জায়গায় অনীশকে কল্পনা না করে ফেলে।

ফলে গোটা প্রক্রিয়াটা এক তরফা থেকে যেত। হৃদয়ের তৃষ্ণা অসীম কৃচ্ছ্রতায় থেকে যেত অটুট। যেন বিশেষ কোনও ব্রত পালন করছে পারমিতা।

দিন যেতে, এক সময় যা বোঝার নিজের মতো বুঝে নিল সলিল। আলাদা ঘরে শুতে শুরু করল দু'জনে। তারপর কদাচিৎ কামনা তাড়িত হয়ে সলিল মাঝরাতে পারমিতার দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ভীরুকণ্ঠে জানতে চেয়েছে, ঘুমলে?

না।

অনুমতি নিয়ে বিছানায় এসেছে সলিল। ধীরে ধীরে তাও গেছে কমে। মাঝে এক বার পারমিতার সন্দেহ হয়েছিল, সলিল হয়তো অন্য কোথাও শরীরের ক্ষুধা মেটাচ্ছে। বিষয়টা নিশ্চিত হতে সে সলিলের গতিবিধির ওপর গোয়েন্দাগিরি করে। সম্ভবত সেটা কিছুটা টের পেয়ে থাকবে সলিল। তবে এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন করেনি। পারমিতাও নিঃসন্দেহ হয়েছে, সলিলের অন্য কোনও নারীর ব্যাপারে উৎসাহ নেই।

স্ত্রীর প্রত্যাখ্যান মুখ বুজে কেন যে সহ্য করে গেছে সলিল, তা আজও বোঝে না পারমিতা। প্রতিশোধ বলতে সলিল একটা কাজই করেছে, পারমিতার এ হেন আচরণের কারণ কখনও জানতে চায়নি।

তো পারমিতা যখন কিছু মাস আগে সলিলের দরজায় দাঁড়িয়ে বলেছিল, ঘুমোয়নি এখনও!

সে রাতে নাছোড় শীতটাই কাটাতে চেয়েছিল পারমিতা। লাভ হয়নি। সলিল চলে যেতে, চাদর গায়ে চিত্তরঞ্জন পার্কের বাড়ির ঝুল বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। এবং মুহূর্তের মধ্যে বুকটা হায় হায় করে ওঠে, সামনেই নিষ্পত্র শিমুল গাছ, প্রেতিনীর মতো চাঁদের টিপ পরে দাঁড়িয়ে আছে। যেন নিজেকেই দেখেছিল পারমিতা। তারও তো পাতা ঝরার সময় হয়ে এল। চল্লিশ পেরিয়ে এসেছে সে। অসহ্য শীত আর জ্যোৎস্না ভরা রাতে সে নিয়তির নিঃশব্দ, অমোঘ পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিল। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছিল, আমি এখনও জীবনের পূর্ণতা পাইনি, আর একটু সময় দাও আমাকে। অনেক ভালবাসা জমা হয়ে আছে। এখনই নারীত্ব কেড়ে নিয়ে আমায় নিঃস্ব কোরো না।

সে রাতে বারান্দা থেকে সলিলই উদ্ধার করে। আচ্ছন্নের মতো দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে মেঝেতে বসেছিল পারমিতা। ঘরে নিয়ে গিয়ে সলিল স্কচের পেগ বানিয়ে পারমিতাকে দেয়। বলে, এটা খাও, ভাল লাগবে।

মানসিক চাপের কারণেই হয়তো সে মাসের শরীর খারাপের দিন পেছোতে লাগল। শরীরের ভেতরের সেই চিরকালীন মেয়েসত্তা যে মনের আমিকে ওই ক'টা দিন নারীত্বের শ্লাঘায় আবিষ্ট করে শারীরিক অস্বস্তি ভুলিয়ে রাখে, তারও দেখা নেই। প্রচণ্ড অনিশ্চয়তায় পারমিতা একদিন সলিলকে বলে, আমি কলকাতায় ফিরে যাব। তুমি অফিসে কথা বলে বদলি নাও।

সলিল উৎসাহিত হয়ে বলে, কোম্পানি তো কবে থেকে আমাকে কলকাতা অফিসের দায়িত্ব নিতে বলছে। তুমি রাজি হবে না ভেবে, আমি হ্যাঁ করিনি।

রাজি হব না কেন? অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল পারমিতা। সলিল হাসতে হাসতে বলে, বিয়ের পর কলকাতা ছেড়ে পালানোর জন্য যেভাবে উঠেপড়ে লেগেছিলে, মনে হচ্ছিল কারওর কাছে অনেক টাকা ধার পড়ে আছে।

'আছেই তো ধার, তবে সেটা টাকার নয়।' কথাটা মনে মনে আওড়েছিল পারমিতা। সলিল তখনও বলে যাচ্ছিল, আমারও কিছু দিন ধরে কলকাতার জন্য মনটা টানছিল। বাড়িটা ফাঁকা পড়ে আছে। চাকরির শেষ কিছু বছর যদি হোমল্যান্ডেই কাটাতে না পারলাম, তা হলে আর এত বড় পোস্টে চাকরি করে কী লাভ হল!

শুরু হয়ে গেল তোড়জোড়। মেয়েকে শান্তিনিকেতনে ফোন করে জানানো হল, কলকাতায় ফিরছি। সলিলের পিসতুতো ভাইকে ফোনে সল্ট লেকের বাড়ি পরিষ্কার করতে বলা হল। দিল্লির বাড়িটা ছিল কোম্পানির দেওয়া, ছেড়ে আসার সময় একটুও মন খারাপ করেনি। পাতাহীন শিমুল গাছটা হয়তো দুখীদুখী ভাব

করে তাকিয়ে ছিল পারমিতাদের চলে যাওয়ার দিকে।

এরই মধ্যে পারমিতাকে নিশ্চিন্ত করে শরীরখারাপ ফিরে এসেছে। বেশ ঝরঝরে মন নিয়ে রাজধানী এক্সপ্রেসে উঠেছিল। ট্রেন যত বাংলার কাছাকাছি এসেছে, জানলার কাচে চোখ রেখে পারমিতা চলে গেছে, স্মৃতির এক ট্রেনপথে। সেটা মিটার গেজ লাইন। হেলেদুলে ট্রেন চলেছে। মাঠ, পাড়া, পুকুরে ছায়া ফেলে। হাওয়ায় উঠে আসছে গৃহস্থের উঠোনের গন্ধ। প্যাসেঞ্জাররা সব সরলসিধে গ্রামের মানুষ। মুরগি, ছাগলও উঠেছে কমপার্টমেন্টে। অনীশ আর পারমিতাই শহুরে। পারমিতাকে জানলার পাশে বসার জায়গা করে দিয়েছে সহযাত্রীরা। পারমিতা দেখতে দেখতে যাচ্ছে ট্রেনের হাওয়ায় বাতাবি লেবুগাছের অলস কম্পন। তুলসী মঞ্চের ওপর থমকে দাঁড়াল কাঠবিড়ালি। পারমিতার অনাবিল উচ্ছ্বাস দেখে এক যাত্রী বলল, একটু সুবুর করুন দিদি, এক্ষুনি একখান জবাগাছ আসবে, আপনাকে ফুল পেড়ে দিব। কী আশ্চর্য, জবাগাছটা সত্যিই এল, লোকটা টুক করে একটা ফুল ছিঁড়ে, একগাল হেসে পারমিতার হাতে দিল।

ট্রেনটা বর্ধমান ছেড়েছে অনেকক্ষণ, কখন যে ভাতার পৌঁছবে কে জানে! সেখান থেকে ভ্যানরিকশা পেলে ভাল, নয়তো দু'কিলোমিটার হেঁটে বাণেশ্বরপুর। কোনও এক সময় অনীশদের জমিদারি ছিল। আপাতত বিঘে দশেক জমি আর মাটির দোতলা বাড়িতে ঠেকেছে। গ্রামের এক মুনিষ দেখাশোনা করে। কিছু বছর আগে লক্ষ্মীপুজো হত ধুমধাম করে। বাবুরা শহর থেকে আসতেন। এখন পুজোও বন্ধ, বাবুদের দেখা নেই। অনীশই এক দিন বলল, চলো, আমাদের দেশের বাড়ি যাই। একটা দিন বাড়িতে ম্যানেজ করো। দারুণ জায়গা। ছোটবেলায় খুব যেতাম। ট্রেনে অনীশ এমন মুখ করে বসেছিল, যেন অচেনা কোনও জায়গায় যাচ্ছে।

ট্রেনের গতিকে বিদ্রূপ করে পাটে বসছেন সূর্যদেব। অস্তরাগের চলমান আলো এসে পড়েছে বাণেশ্বরপুরের জমিদার বংশের এক পুত্রের মুখে। অনীশকে তখন ইতিহাস থেকে হারিয়ে যাওয়া রাজপুত্র মনে হচ্ছিল। প্যাসেঞ্জাররা সব প্রজা, নিরুদ্দেশ রাজপুত্রকে ফিরিয়ে নিয়ে আসছে। রাজপুত্রের পাশে বসে আছে, শোভাবাজারের এক মেয়ে। মেয়েটিই পরে রানি হবে। তার গায়ে তখন কলেজের গন্ধ। কাপড়ের সাইড ব্যাগে পল সায়েন্সের বই, একটা শাড়ি, অন্দর পোশাক।

মাকে বলেছিল, কলেজের পর শোভনার বাড়ি যাব। পরীক্ষার প্রিপারেশন করব রাত্তিরে থেকে। শোভনা তখন পাশে দাঁড়িয়ে সায় দেয়। দিতে বাধ্য। শোভনাও নিজের বাড়িতে পারমিতার নাম চালিয়ে মিতুনদার সঙ্গে অনেক জায়গায় ঘোরে। ... রাজধানী এক্সপ্রেসে বসে পারমিতা শিয়ালদা নয়, বার বার

চলে যাচ্ছে বাণেশ্বরপুরে। ট্রেন থেকে নেমে ভ্যানরিকশা পায়নি। পায়ে হেঁটে পার হল দু'-একটা গ্রাম, পাড়া। তারপর পৌঁছল বসতিহীন উঁচু মাঠের কাছে। মাঠের শেষ প্রান্তে দোতলা মাটির বাড়ি। ওটাই অনীশদের পিতৃপুরুষের ভিটে। দেখেই বোঝা যায় তেমন রক্ষণাবেক্ষণ হয় না। পাঁচিল ভেঙেচুরে গেছে। হেলে পড়েছে সদর দরজা। অনীশের সঙ্গে সদরে গিয়ে দাঁড়াতেই প্রাণ ভরে যায় পারমিতার, উঠোন ভরা ফটফটে রোদ, বাড়ি লাগোয়া গাছপালা, পুকুর থেকে উঠে আসছে স্নেহময় এক ধরনের হাওয়া। চৌকাঠ ডিঙোনোর সঙ্গে সঙ্গে পারমিতার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, কানে তখন বাজছে শাঁখ, উলুর শব্দ। অদৃশ্য গুরুজনরা বরণ করে নিচ্ছেন পারমিতাকে।

কানে তালা লাগিয়ে বেজে ওঠে ফোন। মন ফিরে আসে নিজের ঘরে। বিছানা থেকে উঠে গিয়ে ফোন তোলে পারমিতা, হ্যালো!

আহেলি ফিরেছে? ও প্রান্তে সলিলের গলা।

না, এখনও তো ফিরল না। কী করি বলো তো?

সলিল আবার আশ্বস্ত করে, নতুন কলকাতায় এসেছে, হয়তো কোনও কার্ডের দোকান বা সাইবার কাফেতে চ্যাট করছে। আর মিনিট দশেক দেখে, আমায় ফোন কোরো।

রিসিভার নামিয়ে রেখে পারমিতা আবার বাইরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। সল্ট লেকের ফাঁকা রাস্তা, নিঝুম বাড়িগুলো দেখে, মেয়ের চিন্তা ফের পেয়ে বসে। কোথায় যে গেল?

ঠিক তখনই গেট ঠেলে ঢুকে আসে আহেলি। পরনে ট্র্যাকসুট ঘামে ভিজে গেছে। এক মুখ হাসি নিয়ে সামনে এসে বলে, নিশ্চয়ই খুব টেনশন করছিলে?

আহেলির ঘর্মাক্ত মুখে আঁচল বুলিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে পারমিতার। উপায় নেই, সে এখন নাইট গাউন-এ। পারমিতা বলে, চিন্তা হবে না, কখন বেরিয়েছিস বল তো! কোথায় ঘুরলি এতক্ষণ?

অনেক দূর গেছিলাম। ভীষণ মিল আমাদের চিত্তরঞ্জন পার্কের সঙ্গে। দারুণ লাগছিল। শুধু ক্লাইমেটটাই যা একটু আলাদা। এখানকার ওয়েদারে হিউমিডিটি খুব বেশি। বোলপুরেও এতটা নয়। কথা বলতে বলতে ঘরে ঢুকে গেল আহেলি। পারমিতা চলল ওর ব্রেকফাস্ট রেডি করতে, যাক, মেয়ের তা হলে সল্ট লেক পছন্দ হয়েছে।

এ দিকে বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে আহেলি, মাকে বেশ ভালই পট্টি পরানো গেল। একটুও টের পায়নি আহেলি আসলে কোথায়

গিয়েছিল। অবশ্য পাবেই বা কী করে, তার গায়ে তো শোভাবাজারের গন্ধ লেগে নেই।

আজ দৌড়তে বেরনোর আগেও ঠিক ছিল না শোভাবাজার যাবে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তার ওপর একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, ইচ্ছেটা মাথায় আসে। ড্রাইভারের চেহারাটা জেনুইন। আহেলি ট্যাক্সির কাছে গিয়ে জানতে চায়, এখান থেকে শোভাবাজার কতক্ষণ লাগবে?

সকালের দিক তো, জ্যাম অতটা থাকবে না। ধরুন মিনিট পনেরো।

ট্যাক্সিতে উঠে বসেছিল আহেলি। সাজানো গোছানো কলকাতাটা ক্রমশ পুরনো হয়ে এল। ভিড়, রাস্তার ওপর সবজিবাজার, ছোটখাটো জ্যাম পেরিয়ে পাঁচমাথার মোড়। নেতাজির মূর্তিটা আগে না দেখলেও ভীষণ চেনাচেনা লাগছিল। মায়ের মুখে তো শুনেইছে, ছবিও দেখেছে টিভি, নিউজ পেপারে।

মোড়ের সিগন্যালে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল গাড়ি। ছাড়া পেয়ে একটু ঘুরেই ড্রাইভার জানতে চাইল, শোভাবাজারে কোথায় নামবেন?

শোভাবাজার কি এসে গেছে? চার পাশে তাকিয়ে জানতে চেয়েছিল আহেলি।

না, আসছে। নামবেন কোথায়?

কোথাও না। একটু ঘুরুন।

সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষে ড্রাইভার। সামনের সিটে আর একটু হলে মাথা ঠুকে যেত আহেলির। ড্রাইভার বলে, সরি, ম্যাডাম আর যেতে পারব না। আপনি প্লিজ নেমে যান।

কেন! নেমে যাব কেন? সবিস্ময়ে জানতে চেয়েছিল আহেলি।

জায়গা ঠিকঠাক না বললে গাড়ি যাবে না।

আহেলি বুঝতে পারে ড্রাইভার কোনও কিছুর ঝামেলায় আশঙ্কিত হচ্ছে। গাড়িতে ওঠার আগে ড্রাইভারের চেহারা দেখে আহেলি আশ্বস্ত হয়ে নিয়েছিল। তখন কে জানত ড্রাইভারই আহেলিকে ভয় পাবে! নরম গলায় আহেলি তখন বলে, দেখুন দাদা, এখানে আমার এক রিলেটিভের বাড়ি। লোকেশনটা ভুলে গেছি। আপনি একটু ঘুরলেই চিনতে পারব।

রাস্তার নামটা অন্তত বলুন।

শ্যামপুকুর স্ট্রিট।

সে তো লম্বা রাস্তা। সব জায়গায় গাড়ি ঢুকবে না।

যতটুকু যাওয়া যায়, চলুন!

অত্যন্ত অনিচ্ছায় গাড়ি স্টার্ট দেয় ড্রাইভার। আহেলির চোখের সামনে তখন

মায়ের থেকে শোনা শোভাবাজারের বাস্তব চিত্র। পুরনো দোতলা, চারতলা বাড়ি, কোনও কোনও বাড়ির ছাদে একরাশ পায়রা। সরু সরু গলি। ছোটখাটো মন্দির। টালির চালের কলোনি। কর্পোরেশনের কলের মুখ নেই। অবিরত জল পড়ে যাচ্ছে। সেখানেই এক সঙ্গে দু'-চার জন লোক স্নান সেরে নিচ্ছে। রেশন দোকানে লাইন। কোনও এক বাড়ির বারান্দায় মুদিখানা। এক চিলতে জায়গা পেলেই চায়ের দোকান। দু'-একটা চিড়ে ভাজা, বাদাম, ছোলা, ছাতুর দোকানও চোখে পড়ল। কত বৈচিত্র্য ওইটুকু জায়গার মধ্যে। কলকাতার বহু দিনের অতীত একটু যেন রেস্ট নিচ্ছে শোভাবাজারে। ড্রাইভার দু'বার গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলেছিল, এটা রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ি। আর একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বলল, এটা বাঘবাড়ি। দেখছেন, গেটের মাথায় বাঘ। এটাই আসল রাজবাড়ি। ...ড্রাইভার ততক্ষণে বুঝে গেছে, আহেলি জায়গাটা এমনি ঘুরে দেখছে। ভাঙা বাঘবাড়িটা অদ্ভুত প্যাটার্নের। প্রাচীন আরকিটেক্ট। সদ্য রং করা হয়েছে। তবু বাড়ির খাঁ খাঁ ভাবটা ঢাকা দেওয়া যায়নি। ও বাড়ির সামনে একটা ভাঙা পালকি রাখা থাকলে, বেশ মানাত।

এ সব কিছুর মধ্যে নতুন ফ্ল্যাটবাড়ি, ঝকঝকে শো-রুমও দেখা গেল। মা নিশ্চয়ই এগুলো দেখেনি। একটা বিশাল বাড়ির রকে মডার্ন সাজগোজ করা কয়েকটা কলেজ-পড়ুয়া মেয়েকে দেখা গেল। ড্রাইভারকে নাম জিজ্ঞেস করতেই বলল, জয়পুরিয়া কলেজ।

আহেলি রোমাঞ্চিত হল, মা এই কলেজেই পড়ত। মর্নিং-এ মেয়েদের সেকশন। কিন্তু এত সব বাড়ি, গলির মধ্যে কোনটা যে আহেলির মামার বাড়ি, কোনটাই বা চ্যাটার্জিবাড়ি কিছুই আন্দাজ করা যাচ্ছে না। কাউকে জিজ্ঞেস করতেও কেমন দ্বিধা হচ্ছে, বাড়িদুটো যদি কেউ দেখিয়েও দেয়, আহেলি তো আর দেখা করতে যেতে পারবে না। ইনফ্যাক্ট সে দেখা করতে আসেওনি। মায়ের কুমারীবেলাটা দেখতে এসেছিল। অনেক গল্প শুনেছে মায়ের কাছে, অনেক কথা না বলেওনি। সেই না বলা কথাগুলো জানতে চায় আহেলি। তার ওপর নির্ভর করে আহেলিকে বেশ কিছু ডিসিশন নিতে হবে।

শোভাবাজারের গোলক ধাঁধাঁয় ঘুরতে ঘুরতে এক বার মনে পড়েছিল সেই ছেলেটার কথা। মৈনাক। ওদের বাড়ির নাম্বারটাও মনে পড়ে। কিন্তু হুট করে তো কারওর বাড়ি যাওয়া যায় না। গিয়ে কী বলবে? তার থেকে বরং ছেলেটার সঙ্গে যদি হঠাৎ রাস্তায় দেখা হয়ে যায়, বেশ হয়। ক্লাবে ছেলেটির সঙ্গে দেখা হতেই মায়ের মুখে অদ্ভুত এক আলো জ্বলে উঠতে দেখেছিল আহেলি, মায়ের ওই

এক্সপ্রেশান আগে কখনও দেখা যায়নি। আহেলি নিশ্চিত, ওই ছেলেটার সূত্র ধরেই মায়ের অতীতে অনায়াসে পৌঁছনো যাবে।

শোভাবাজারে ঘুরতে ঘুরতে ছেলেটাকে খুঁজছিল আহেলি, পাওয়া সম্ভব নয় জেনেও। ছেলেটা বেশ অদ্ভুত, খামখেয়ালি, একটু অগোছালো। যেন শোভাবাজারের বৈচিত্র্য আর বনেদিয়ানার ছাপ ওর চেহারায় মিশেছে। ধুতি-পাঞ্জাবি পরলে ওকে দারুণ মানাবে— ভেবেই হেসে ফেলে আহেলি।

তোর ব্রেকফাস্ট দিয়েছি। খেয়ে নে। মায়ের গলা।

হাসি মুছে ডাইনিং-এ আসে আহেলি।

মা-মেয়ে, মুখোমুখি খাবার টেবিলে বসেছে। একমনে খেয়ে যাচ্ছে আহেলি, মাকে একবার তাড়া দেয়, কী হল, তুমি খাও।

খাচ্ছি। বলে, চায়ের কাপটা তুলে নেয় পারমিতা। খুব সন্তর্পণে আহেলিকে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে, মনুকে সেই একবারই ফোন করেছিলি তো না কি?

হ্যাঁ, কেন? অবুঝ দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকায় আহেলি। পারমিতা বলে, না, আসলে আর এক বার যদি ফোন করতিস, তখন তো ঘুমোচ্ছিল।

তার মানেই সহি সালামাত বাড়িতে পৌঁছে গেছে। আবার খবর নেওয়ার কী দরকার!

আহেলির ভাষায় এখনও একটু আধটু দিল্লি মিশে আছে, শুনতে ভালই লাগে। পারমিতা মূল প্রসঙ্গে ফেরে, মনুকে এক বার যদি এ বাড়িতে আনানো যেত, সে দিন ভাল করে কথাই হল না।

আহেলি বলে, নাম্বার তো বার করাই আছে। নিজেই একটা ফোন কর না।

তা করা যায়। আচ্ছা, দিস নাম্বারটা। বলে, স্যান্ডউইচে কামড় মারে পারমিতা। মাথা নিচু থাকলেও টের পায়, মেয়ে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। খানিক পরে আহেলি বলে ওঠে, আচ্ছা মা, মৈনাকের সঙ্গে তোমার কী কী কথা বাকি আছে?

মেয়ের প্রশ্নে খুবই বিব্রত বোধ করে পারমিতা। অজুহাতের সুরে বলে, কিছুই না, পাড়ার কে কেমন আছে, এই সব জানতাম আর কী।

তোমার পাড়া, তুমি নিজে গিয়েই তো খবর নিতে পার।

সে যাওয়াই যায়। আসলে তোর দিদা যদি জানতে পারে, আমি ও পাড়ায় গেছি অথচ বাড়ি যাইনি, খুবই কষ্ট পাবে।

আহেলির খাওয়া শেষ। ন্যাপকিনে মুখ মুছতে মুছতে বলে, তুমি দিদার কাছে কেন যাও না, আজও আমি জানি না। বাবাকে জিজ্ঞেস করলে বলে, তোমার কাছে জানতে। আমি তো বড় হয়েছি, এবং অবশ্যই ফ্যামেলির অ্যাডাল্ট মেম্বার।

আমার বোধহয় এ বার জানা উচিত, কোন কোন রিলেটিভদের সঙ্গে আমাদের রিলেশানটা কেমন। খারাপ হলে, কেন খারাপ। ভাল হলে, কেন?

মেয়েকে এত গুছিয়ে কথা বলতে দেখে, রীতিমতো নার্ভাস হয়ে যায় পারমিতা। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বলে, এই দেখ, ভুলে গেছি! তোর বাবা বলেছিল, তুই ফিরলে একটা ফোন করতে।

দুপুর! কোকিলটা সেই থেকে পিছনে লেগেছে। যত বারই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে মৈনাকের, ততবারই তারস্বরে চেঁচিয়ে ভেঙে দিচ্ছে ঘোর। ব্যাটা বসেছে জানলার কাছে আম গাছটায়। বসন্ত এসেছে কলকাতায়, জানানোর দায়িত্ব যেন ওর একার কাঁধেই পড়েছে।

যে কোনও ক্রিয়েটিভ মানুষের দুপুরে ঘুমনো উচিত। কেন না উৎকৃষ্ট ঘুমই মানুষকে সৃষ্টিশীল করে। দিনে রাতে দু'বার ঘুমলে, জেগে ওঠার পর প্রতিবারই নতুন নতুন আইডিয়া আসে মাথায়। মানুষ অনেক বেশি উৎপাদনক্ষম হয়।

বাইরের কিছু দেশে না কি কোম্পানির এগজিকিউটিভদের দুপুরে ঘুমনোর নির্দিষ্ট সময় এবং অ্যান্টিচেম্বার থাকে। তথ্যটা কার থেকে জেনেছিল মৈনাক এখন আর মনে নেই। তবে কথাটা সত্যি। হাতেনাতে অনেক বার প্রমাণ পেয়েছে। সেই কারণেই সুযোগ পেলেই দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নেয়। এ ব্যাপারে জায়গার কোনও বাছাবাছি নেই তার। যখন বাড়ির বাইরে থাকে, ভিক্টোরিয়ার গাছের তলায় ঘুমিয়েছে, গরমে বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের এসিতে। যদিও কস্টলি, টিকিট কেটে ঘুমতে হয়। তবে বেশ আরামদায়ক। ট্রামে ঘুমিয়ে পড়া তার প্রিয় বিলাস। বাগবাজার ট্রাম ডিপোর কন্ডাক্টাররা তাকে ভাইপোপ্রতিম ভালবাসে। ট্রাম ডিপোয় ঢোকার বেশ খানিকক্ষণ পর তাকে ডেকে দেয়।

দুপুরে ঘুমিয়ে রানাদার কত সমস্যার যে সমাধান করেছে মৈনাক তার ইয়ত্তা নেই। সেই একই কারণে আজ খাওয়া-দাওয়ার পর একটু গড়িয়ে নিচ্ছিল, কোথা থেকে এসে গেল বেহায়া কোকিল। পাখিটা এখনও ডেকে যাচ্ছে, দূরের কোনও বাগান থেকে উত্তর দিচ্ছে আর একটা কোকিল। মিত্তির বাড়ির বাগান থেকে সম্ভবত। নাঃ, ঘুম আর আসবে না। বিছানায় উঠে বসে মৈনাক। জানলার বাইরের রোদে বিকেলের রং লেগেছে। মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে আসছে হাওয়ায়। গন্ধটা চেনে মৈনাক, আমমুকুলের গন্ধ। আজ বিকেলটা তো দিব্যি প্রেম প্রেম পরিবেশ,

এ দিকে মাথা খুঁড়ে দুপুরে ঘুমিয়ে এখনও একটাও ঠিকঠাক প্রেমের গল্পের সন্ধান পেল না।

গতকাল পুরোটা দিন সে আঁতিপাতি করে প্রেমের গল্প খুঁজে গেছে, বেশ কয়েকজন বন্ধুকে ফোন করেও লাভ হয়নি। সব ক্লাসিক গল্পের রেফারেন্স দিচ্ছে। রাহুল বোসের তা চলবে না। এখনকার সময়ের ওপর গল্প চাই।

মৈনাক জানত, রানাদা কাল বার বার ফোন করবে। বাজার থেকে ফিরে মাকে বলছিল, ফোন এলে যেন বলে ডানলপে পিসির বাড়ি গেছে, পরশু ফিরবে। মা হরেদরে সব ফোনেই তা বলে গেছে।

ততক্ষণে বাড়ির সব বই, পত্রিকা, বার করে ছত্রাখান করেছে মৈনাক। প্রার্থিত গল্প না পেয়ে, গেছে সোনাদার ঘরে। সোনাদা তখন অফিসে। বউদিকে সমস্যার কথা বলে, সব বই নামিয়ে খুঁজে গেছে। তখনই চোখে পড়েছিল সোনাদার নতুন বই, যেটা গত শারদীয়ায় বেরিয়েছিল। বইটার কভার, উৎসর্গপত্র দেখে রেখে দিয়েছে। সোনাদা প্রেমের কাহিনী লিখবে না, আগের দুটো নাটক দেখেছে মৈনাক, ভীষণ কাঠখোট্টা। রাজনীতির কচকচিতে ভরপুর। এই বইটা সুতপা বউদিকে উৎসর্গ করেছে। এটাই ওর প্রথম বই।

মৈনাকের খোঁজাখুঁজির মাঝে সুতপা বউদি চা নিয়ে আসে। বলে, তোমাকে দেখে বুদ্ধদেবের সেই গল্পটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, কোনও এক সদ্য সন্তান হারানো শিষ্যাকে বলেছিলেন না, এক মুঠো চাল নিয়ে এসো এমন গৃহস্থের কাছ থেকে, যে বাড়িতে কেউ কোনও দিন মরেনি।

উপমাটা কতটা লাগসই ধরতে না পেরে অবাক চোখে তাকিয়ে ছিল মৈনাক। বউদি বলে, আসলে এখনকার দিনে নির্মল প্রেম, 'তোমাকে ছাড়া বাঁচব না' টাইপের ভালবাসা হয় না। লেখকরা খামোকা কেন বানিয়ে লিখতে যাবে। বুদ্ধদেবের শিষ্যার মতো তুমি অযথা ঘুরে মরছ।

বউদি কিছু ভুল বলেনি, যে কোনও গল্প উপন্যাসের প্রথমটা, মাঝের কিছুটা পড়েই মৈনাক টের পাচ্ছিল প্রেমের 'প' নেই। তবে অবৈধ প্রেম নিয়ে অনেকেই নাড়াচাড়া করেছেন। মৈনাক জানে প্রেম কখনওই অবৈধ হয় না। কিন্তু রাহুল বোস কি সেটা বুঝবে? তা ছাড়া সো কলড অবৈধ প্রেমের গল্পগুলো স্বাভাবিক ভাবেই জটিল।

মৈনাককে নিরাশ করে বউদি ততক্ষণে সংসারের কাজে ডুবে গেছে। হঠাৎ একটা পয়েন্ট তখন মাথায় এসেছিল মৈনাকের। চেঁচিয়ে বউদিকে ডাকে।

হাত মুছতে মুছতে সুতপা বউদি দরজায় এসে দাঁড়ায়। মৈনাক বলে, আচ্ছা

বউদি, তোমার আর সোনাদার মধ্যে যদি প্রেম না-ই থাকে, তা হলে প্রথম বইটা সোনাদা কেন তোমাকে উৎসর্গ করল?

অফিসের আগে ঠিক সময় ভাত পাবে বলে।

মৈনাকের পয়েন্টটা যেন ব্যাডমিন্টনের কক, বউদি এক চাপে বসিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল। হাসিটার মধ্যে কিন্তু কোনও কপটতা নেই, খুবই নির্মল।

বউদি চলে যাওয়ার পরই বিল্টুটা কোথা থেকে এসে পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, কী খুঁজছ মনুকাকু। আমি হেল্প করব।

নাঃ, তোমাকে আর হেল্প করে কাজ বাড়াতে হবে না। বলে, তখনকার মতো খোঁজায় বিরতি দিয়েছিল মৈনাক। তারপর বাড়িতে ফিরে, ভরপেট খেয়ে দুপুরে টানা ঘুম লাগিয়েছিল। গতকাল কোকিলটা ডাকেনি। তবে ঘুমিয়ে কোনও কাজও হল না। বিকেলে গিয়েছিল বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরিতে, সেখানেও হতাশ হতে হয়েছে।

এত বড় একটা সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে ভেবে রাতে ভাল করে ঘুম আসছিল না। তবু একটা ক্ষীণ আশার সম্ভাবনা কখনও সখনও বুদবুদের মতো ভেসে উঠছিল মনে, রানাদার যা কনভিন্স করার ক্যাপাসিটি, রাহুল বোসকে নিশ্চয়ই এতক্ষণে অন্য গল্প খাইয়ে দিয়েছে।

মৈনাকের ধারণা ভুল প্রমাণ করে, মাঝ রাতে ফোন বেজে উঠেছিল। সাদা মনে ফোনটা ধরে মৈনাক, রানাদা বা রাহুল বোস নিশ্চয়ই নয়! আগে করেছিল। মা একই রেকর্ড চালিয়েছে।

ফোন তুলে হ্যালো বলার সঙ্গে সঙ্গে, ও প্রান্তে রানাদা বলেন, কী করে স্টুপিড, ঢপ মেরে লুকিয়ে থেকে লাভ কী হবে শুনি। সিনেমাটা হলে তোরও তো কিছু টাকা আসবে না কি! আমার ফিনান্সিয়াল কন্ডিশান খুব একটা সুবিধের নয়। প্রোডিউসারটাকে ছাড়া চলবে না। যে করে হোক গাঁথতে হবে।

সে তো বুঝলাম, কিন্তু গল্প যে পাচ্ছি না। অনেক খুঁজেছি। নিরুপায় গলায় বলেছিল মৈনাক। রানাদা ও সব শোনার পাত্র নন। বলেন, আমি কিছু জানি না, গল্প তোমায় বার করতেই হবে। লেখকের 'রাইট' জোগাড় করার দায়িত্ব আমার। দু' দিনের বেশি সময় নেওয়া যাবে না। লোকটাকে আমি কোনও ক্রমে ঠেকিয়ে রেখেছি। এবং বুঝে গেছি লোকটা জেনুইন। ওর সম্বন্ধে খোঁজখবর করেছি, ক্লিন লোক। আমার কপাল ভাল। লোকটা অন্য কোথাও না গিয়ে প্রথমে আমাদের কাছেই এসেছে। আজ সকাল থেকে বার চারেক ফোন করেছে রাহুল বোস। বলেছি, তুই মরিয়া হয়ে ভাল গল্পের খোঁজে আছিস। দু'-একটা আইডিয়া

ইতিমধ্যেই দিয়েছিস আমাকে, আমার পছন্দ হয়নি। রাহুল বোস তোর ফোন নাম্বার নিল, নিশ্চয়ই ফোন করেছে, জবাব পেয়েছে আমার মতোই। সত্যিই এর মধ্যেই বড় বড় সেলিব্রিটিদের মতো স্টাইল নিতে শুরু করেছিস। ...এক সঙ্গে এত কথা রানাদা আগে কখনও বলেননি। বোঝা যাচ্ছিল, খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন খাঁটি প্রোডিউসার পেয়ে। এ দিকে খেয়াল নেই কী মারাত্মক কঠিন কাজ মৈনাকের ঘাড়ের ওপর চাপিয়েছেন।

ফোনের এ প্রান্তে মৈনাককে চুপ থাকতে দেখে রানাদা বলেন, অত ভাবার কিছু নেই, তুই ইয়াং ছেলে, এখনকার ছেলে-মেয়েদের ভালই বুঝিস। মনে মনে একটা গল্প তৈরি করে ফেল। তারপর নিয়ে আয় আমার কাছে। আমি দেখি, যদি কিছু কনট্রিবিউট করতে পারি।

ফোন কানে নিঃশব্দে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসেছিল মৈনাক, গল্প লেখা যদি এতই সহজ হত, সিনেমা বার বার সাহিত্যের দরবারে গিয়ে দাঁড়াত না। রানাদাকে দান ফেরত দিতে মৈনাক বলে, আচ্ছা রানাদা আপনার আর মিতা বউদির বিয়ে তো অ্যাফেয়ার করে। সেই ঘটনা থেকে কিছু ধার করা যায় না?

উচ্চগ্রামে হেসে রানাদা বলে, দ্য জোক অব দ্য মিড নাইট। থ্যাঙ্ক য়ু।

কেন, ভুল কী বললাম? আপনাদের তো প্রায় দশ বছর প্রেম করার পর বিয়ে। রিলেশনটা এখনও দারুণ। প্রেমটা নিশ্চয়ই খাঁটি ছিল।

তা কেন থাকবে না। এখন সে সব ভাবলে, বড্ড মেলোড্রামাটিক লাগে। পছন্দ হয় না। আমাদের ভালবাসা এখন নিরুপায় গাধার পিঠে বোঝার মতন। গাধাটা শুকনো, জ্বলে যাওয়া মাঠ পার হচ্ছে, পিঠে ভালবাসার বোঝা। গাধাটা আমিও হতে পারি, তোর বউদিও হতে পারে, তুইও ক'দিন পর হবি। বলে, যাত্রার খলনায়কের মতো হাসছিলেন রানাদা। প্রোডিউসার সামলানোর টেনশনে হয় কোটার বাইরে গিয়ে পেগ চাপিয়েছিলেন। হাসি থামিয়ে, 'ও কে, কাল আবার কথা হবে। গুড নাইট।' বলে, ফোন কেটেছিলেন রানাদা। মৈনাকের বাকি রাত চৌপাট। যখনই চোখ বুজে এসেছে, মনের চোখে ভেসে উঠেছে, জ্বলে যাওয়া মাঠ, একটা নিরুপায় গাধা, পিঠে বিশাল বোঝা। গাধাটা হেঁটে যাচ্ছে, মাঠ কিছুতেই ফুরচ্ছে না।

আজ সকালে উঠে মৈনাক ঠিক করেছিল, গল্প নিয়ে আর একফোঁটা ভাববে না। মাথাটা ফাঁকা রেখে দিয়ে অপেক্ষা করতে হবে, যদি কোনও গল্পের কথা মনে পড়ে, অথবা কোনও আইডিয়া, এমনিই উড়ে আসবে মাথায়। টেনশান করলেই সমস্তটা গুলিয়ে যাচ্ছে।

পরিকল্পনা মাফিক মৈনাক সকাল বেলা যেচে বাজার গেছে। বাজারওলাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ জমিয়ে, চিনেছে টাটকা, ভাল জিনিস। বাড়িতে এসে খুঁটিয়ে কাগজ পড়েছে। টিফিন খেয়ে পুরনো বন্ধু শৈবালের বাড়ি গেছে। শৈবালের পাখির ব্যবসা, সারা দিন বাড়িতেই থাকে। ওদের বাড়িতে গেলে সময়টা ভালই কাটে, সিঁড়িতে, বারান্দায় সব জায়গায় খাঁচা, মেন এভিয়ারি ছাদে। সর্বক্ষণ ছাদে কিচির মিচির। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় মনে হয় উপরে ভোর আছে। আশ্রমের উঠোনে পড়েছে দিনের প্রথম নরম রোদ।

আজকে ছ'জোড়া হলুদ টিয়া দেখল মৈনাক। শৈবাল আর ওর বউ কেয়া দু'জনেই পাখির পরিচর্যায় সারা দিন কাটিয়ে দেয়। দু'জনের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দারুণ। এদের ভালবাসার মিডিয়াম হচ্ছে পাখি, এদের নিয়ে কি কোনও গল্প হয় না? ওরা দুটিতে যখন পাখিদের দেখভাল করছিল, মৈনাক স্পষ্ট ওদের দুটো ডানা গজিয়ে উঠতে দেখে। এ সব সুররিয়ালিস্টিক ব্যাপার ফিল্মে রাখলে, ফ্লপ অবধারিত।

ওদের বাড়ি থেকে বিদায় নেওয়ার সময় মৈনাক ঠিক করে, এ বার ধীরে ধীরে পাখির ব্যবসায় চলে যাবে। সিনেমা করার থেকে অনেক ভাল কাজ। বাড়ি এসে খেয়েদেয়ে শুয়েছে আর একটা পাখি পিছনে লেগে গেল।... এ সব ভাবতে ভাবতে বিছানায় ভোম হয়ে বসে আছে মৈনাক। কোকিলটা অনেকক্ষণ হল আর ডাকছে না। আকাশে গুড়গুড় আওয়াজ হচ্ছে, অথচ মেঘ নেই। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শব্দটাকে চিনতে পারে মৈনাক, হেলিকপ্টারের আওয়াজ। তাড়াতাড়ি জানলার কাছে যায়। আকাশের দিকে তাকাতে দেখে, খুব নিচু দিয়ে একটা হেলিকপ্টার উড়ে যাচ্ছে। ওটার দিকে টানা তাকিয়ে থাকতে থাকতে কী যেন মনে পড়তে থাকে, কোনও একটা গল্প, না কি সিনেমা?

হেলিকপ্টারটা দূরে মিলিয়ে যেতেই একটা সিনেমার দৃশ্য মনে পড়ে। গত ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে নন্দনে দেখেছিল। ফিল্মটার নাম মনে পড়ছে না। যতদূর সম্ভব ফ্রান্সের ছবি। গল্পটা দিব্যি এগোচ্ছিল, মাঝপথে জট পাকিয়ে যায়। সিনেমাটা শেষ হওয়াব আগেই হল থেকে উঠে গিয়েছিল মৈনাক। সেই আধখানা গল্প এখন মাথায় খোঁচা মারছে, গল্পটাকে অনায়াসে প্রেমের গল্পে ট্রান্সফার করা যায়।

ফিল্মটা শুরু হয়েছিল হেলিকপ্টার থেকে নেওয়া শট দিয়ে। উড়ন্ত পাখির দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে ব্যস্ত শহর, হাইরাইজ বিল্ডিং, ক্রমশ শহর ছেড়ে এগিয়ে যাচ্ছে সেই দৃষ্টি। তখনও হেলিকপ্টারটাকে দেখা যায়নি। হাইওয়ে, টিলা, নদী, জঙ্গল পেরিয়ে আকাশ-দৃষ্টি নামতে থাকে একটা সবুজ গ্রামে। গ্রামের আশপাশ পাহাড়ে

ঘেরা। মাঠের ধুলো উড়িয়ে হেলিকপ্টার ল্যান্ড করে। কপ্টার থেকে বেরিয়ে আসে ত্রিশ, পঁয়ত্রিশের অতীব সুন্দরী একটি মেয়ে না কি মহিলা। বেশ ব্যক্তিত্বময়ী। মেয়েটির সঙ্গে নামে চারজন পুলিশ, দু'জন উকিল। সবাই মিলে হাঁটতে থাকে, অবশেষে একটা কাঠের বড় বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। বাগানওলা বাড়িটা ভারী সুন্দর দেখতে। একটু অপরিচর্যা আর পুরনো হওয়ার দরুন বাড়িটার রূপ যেন আরও খুলেছে। হেলিকপ্টারের পার্টি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতেই দুঃস্থ চেহারার এক মাঝবয়সি লোক বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। তখনই জানা যায়, এই বাড়িটা আসলে হেলিকপ্টারে আসা ব্যক্তিত্বময়ীর। দুঃস্থ লোকটা বাড়িটা জবরদখল করে আছে। এদের উচ্ছেদ করতেই ভদ্রমহিলা উকিল, পুলিশ সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। মহিলার কিশোরীবেলাটা এই বাড়িতেই কেটেছে। শহুরে সভ্যতায় ক্লান্ত হয়ে মহিলা ফিরে এসেছেন নিজের গ্রামের বাড়িতে, এবার থেকে এখানেই থাকবেন।

উকিল, পুলিশের সঙ্গে যখন কথা হচ্ছে দুঃস্থ লোকটার, লোকটা কাকুতি মিনতি করছে আর দুটো দিন থাকতে দেওয়ার জন্য, সেই সময় জঙ্গল পথে একটা বছর উনিশের মেয়েকে আসতে দেখা যায়। মেয়েটার দু'হাতে দুটো জলের বালতি। একটু দূরেই থমকে দাঁড়ায় মেয়েটা। বাড়ির সামনে কী হচ্ছে, পুরো ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করে। ক্লোজআপে দেখা যায় মেয়েটার মুখ অভিমানে ফুলে উঠছে, চোখে উপচে আসছে জল। চোখ মুছতে পারছে না, হাতে ভারী বালতি। এলোমেলো বাদামি চুলের ধবধবে ফর্সা মেয়েটাকে তখন দুঃখিনী বনদেবী মনে হচ্ছিল। শটটা কাট হয়ে দেখা গেল, কাঠের বাড়িটার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে পুলিশ। ঘর থেকে জিনিসপত্তর ছুড়ে বাইরে ফেলছে। পরের শটে বনদেবী হাতের বালতি ফেলে ছুটে যায় বাড়ির দিকে। তখন যা আশা করা যায়, মেয়েটি পুলিশকে বাধা দেবে জিনিসগুলো ফেলতে। তা কিন্তু হয় না। উনিশের মেয়েটা ঘরে ঢুকে পুলিশের অনুকরণে জিনিস টেনে বাইরে ফেলতে থাকে। তাই দেখে পুলিশও থমকে যায়।

অনেক কিছুর সঙ্গে মেয়েটা একটা ফোটোফ্রেমও বাইরে ফেলেছে, ফ্রেমটার কাচ ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে চার পাশে। এমন সময় দেখা যায় ব্যক্তিত্বময়ী পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছেন ফোটোফ্রেমের দিকে. ফ্রেমটা তুলে ধরতেই আন্দাজ করা যায়, ছবিটা ব্যক্তিত্বময়ীর কিশোরীবেলার। উনিশের মেয়েটি ব্যক্তিত্বময়ীর কিশোরীবেলা ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। মধ্য তিরিশের বাড়ির আসল মালকিন অদ্ভুত করুণা মেশানো রাগত দৃষ্টি নিয়ে তাকায় উনিশের দিকে। বনদেবী তখনও ফুঁসছে।

বনদেবীর মুখটার সঙ্গে কার যেন খুব সিমিলারিটি আছে। টালিগঞ্জের কোনও আর্টিস্ট? আচমকাই মৈনাকের মনে পড়ে আহেলির কথা। পারমিতাদির গাড়ির আলোছায়ায় সেই মুখ। দারুণ মানাবে। কিন্তু এই গল্পটার মধ্যে প্রেম কোথায়? এ তো কিশোরীবেলার অধিকার বোধ নিয়ে ছবি। দুটি মেয়েরই কিশোরীবেলা এখানে কেটেছে, আইনত মালিক শহুরে মহিলা। কিন্তু আবেগের স্থান তো আইনের ওপরে।

নাঃ, যেভাবেই হোক গল্পটার মধ্যে প্রেম পাইল করবে মৈনাক। কেসটা লেগে যাবে মনে হচ্ছে।...আকাশের দিকে তাকিয়ে বিকেলের পাইলটের উদ্দেশে ধন্যবাদ দেয় মৈনাক। ভাগ্যিস হেলিকপ্টারটা তাদের বাড়ির ওপর দিয়ে নিয়ে গেল।

মনু, তোর সঙ্গে কে যেন দেখা করতে এসেছে। মায়ের ডাকে জানলা থেকে ঘুরে দাঁড়ায় মৈনাক।

ছেলের মুখে দু'দিনের পুরনো মেঘ কেটে যেতে দেখে অণিমা বলেন, কী ব্যাপার রে, বেশ খুশি খুশি মনে হচ্ছে! যা খুঁজছিলি পেয়েছিস?

উত্তর না দিয়ে মৈনাক বলে, দাঁড়াও, কে এসেছে বলতে হবে না। দেখি আমি গেস করতে পারি কি না। একটা বছর উনিশের মেয়ে এসেছে।

অণিমা মাথা নাড়েন। আহেলিকে মনে করে কথাটা বলেছিল মৈনাক। যদিও কোনও কারণ নেই মেয়েটার আসার। সেই যে দেখা হয়েছিল ক্লাব ফেরত, তারপর আর কোনও যোগাযোগ নেই। একটু আগে ভাবা সিনেমাটায় ওকে কাস্টিং-ই করে ফেলল মৈনাক। মেয়েটার চেহারায় এমন কিছু একটা আছে, কিছুতেই মন থেকে সরানো যাচ্ছে না।

আর একটা নাম ট্রাই করে মৈনাক, ইলাদি এসেছে তা হলে।—বলেই ভাবে ইলাদিকে মা চেনে, এবং বেশ অপছন্দ করে। 'মৈনাক নেই' বলে দোরগোড়া থেকেই বিদায় করে দিত। ইলাদি ইন্ডাস্ট্রির সেরিব্রাল অভিনেত্রীদের মধ্যে এক জন। অনেক দিন গ্রুপ থিয়েটারে কাটিয়ে, একটু বেশি বয়সে টিভি, ফিল্মে এসেছে। মায়ের অপছন্দের কারণ, ইলাদি একবার স্লিভলেস শর্ট গেঞ্জি আর জিনস পরে এ-বাড়িতে এসেছিল। ভক্তি ভরে মৈনাকের বাবা-মাকে প্রণামও করে। মায়ের মন ভেজে না। পরে যখন মৈনাক বলেছিল, ইলাদির দুটো মেয়ে আছে, মা তখনই জানিয়ে দেয়, মেয়েটা আর যদি কখনও আসে, ঢুকতে দেব না।

কী হল, আর কারওর নাম বলবি? তাড়া দেয় মা।

হঠাৎ যেন মনে পড়েছে, এই ভাবে মৈনাক বলে, পারমিতাদি। সিওর পারমিতাদিই এসেছে।

কে পারমিতা? ভ্রূ কুঁচকে জানতে চান অণিমা।

আরেঃ, পারমিতাদিকে ভুলে গেলে! দাশগুপ্তবাড়ির মেয়ে। পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় চলে এসেছে। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আজ হয়তো বাপেরবাড়ি এসেছিল, দেখা করে যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে।

পারমিতাদির নাম শোনার পর মায়ের মুখে কোনও পরিবর্তন হল না। গম্ভীর ভাবে বলে, নাম বললেন, রাহুল বোস। তোর সঙ্গে খুব দরকার। বেশ সাহেবসুবো দেখতে, ফ্রেঞ্চ কাট...

মায়ের কথা শেষ হওয়ার আগেই খাটের নীচে চোখ চলে যায় মৈনাকের, ওর তলায় ধরে যাব তো? মাকে বলে, লোকটাকে বলে দাও আমি বাড়ি নেই।

সে কীরে, ভদ্রলোককে নীচের ঘরে বসিয়ে, তোকে ডাকতে এলাম।

কাম সারসে। লোকটা কি গাড়ি নিয়ে এসেছে?

তা তো জানি না। তা ছাড়া গাড়ি তো আমাদের গলিতে ঢুকবেও না। বড় রাস্তায় রেখে এসেছে হয়তো।

মৈনাক বোঝে প্রশ্নটা বোকাবোকা হয়ে গেছে, রাহুল বোসের মতন বড়লোক গাড়ি ছাড়া বেরোয় না। ভাগ্যিস তাদের গলিতে গাড়ি ঢোকে না। মৈনাক বলে, কী আর করবে, যাও ভদ্রলোককে ওপরে পাঠাও।

সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে মা বলে, কোনও মানুষকে দেখে ভয় পাওয়া ভাল লক্ষণ নয়, তুই তো আর কারওর থেকে টাকা ধার বা চুরিচামারি করিসনি!

মা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই মৈনাকের চোখ পড়ে চৌকাঠের বাইরে, ওখানেই চকচক করছে তার নতুন চটি জোড়া। তাড়াতাড়ি গিয়ে চটিদুটো হাতে তুলে নিয়ে ঘরে আসে। এদিক ওদিক দেখে নিয়ে আলমারির তলায় ঢুকিয়ে দেয়। সিঁড়ি দিয়ে ভারী পায়ের আওয়াজ উঠে আসছে। বইয়ের র‍্যাক থেকে দু'চারটে বই বার করে বিছানায় ছাড়িয়ে দেয় মৈনাক। তারপর নিজে বিছানায় উঠে, যে কোনও একটা বই নিয়ে আধশোয়া হয়।

দরজার কাছে ঘন ছায়া বলে, আসব?

বই বন্ধ করে উঠে বসে মৈনাক। রাহুল বোসের উদ্দেশে বলে, আপনি আবার কষ্ট করে আসতে গেলেন কেন? আর একটু কাজ বাকি আছে, আমি নিজেই আপনার সঙ্গে দেখা করতাম।

রাহুল বোসের মুখে আশার আলো জ্বলে ওঠে। বলেন, গল্প রেডি?

প্রায় রেডি। আপনি এসে বসুন, বলছি।

ঘরে একটা মাত্রই চেয়ার। রাহুলবাবু এসে বসেন। মৈনাক দ্রুত ভাবতে থাকে ফেস্টিভ্যালে দেখা ছবিটার মধ্যে কীভাবে প্রেম ঢোকানো যায়। রাহুল বোস অধীর আগ্রহে মৈনাকের দিকে তাকিয়ে আছেন। মৈনাক বলে, একটু গুছিয়ে নিয়ে বলছি।

ও কে, নো প্রবলেম। টেক ইওর অন টাইম। বলে, রাহুল বোস ঘরের চার পাশে চোখ বোলাতে থাকেন। ভদ্রলোককে এখন একটু যেন রিল্যাক্স লাগছে। ধরেই নিয়েছেন গল্প রেডি করে ফেলেছে মৈনাক। প্রসঙ্গ অন্য খাতে নিয়ে যাওয়ার তাগিদে মৈনাক বলে, আপনার নিশ্চয়ই খুব অসুবিধে হয়েছে বাড়ি চিনতে?

একটুও হয়নি। আমার ড্রাইভার নর্থ ক্যালকাটার ছেলে। লেন, বাই লেন সব চেনে। ড্রাইভারের কথা আসতে আবার বুকটা ধড়াস করে ওঠে, লোকটা যদি জুতোটা ফেরত চায়! সে-জুতো এখন কোথায় পড়ে আছে কে জানে!

আপনার রুমটাও খুব সুন্দর। টিপিক্যাল আর্টিস্ট মানুষের ঘর। পুরনো আমলের দরজা, জানলা, বাইরে গাছপালা।

রাহুল বোসের কথায় যথেষ্ট লজ্জা পায় মৈনাক। বলে, আর্টিস্ট বলবেন না, আর্টিসান বলতে পারেন। রানাদাকে টুকটাক হেল্প করি আর কী!

ডোন্ট সে লাইক দ্যাট। রানাবাবু আপনার ওপর খুব ডিপেন্ড করেন। কাল যে ক'বার ফোন করেছি, বলেছেন, চিন্তা করবেন না। মৈনাক ঠিক একটা গল্প বার করবে। এবং স্টোরিলাইনটা দুর্দান্ত হবেই। ছেলেটার ফিকশান সেন্স সাংঘাতিক। ফিল্মের ব্যাপারে খুবই ডেডিকেটেড।

প্রোডিউসার তাজা রাখতে ফালতু গ্যাস খাইয়েছেন রানাদা, ফ্লোরে মৈনাককে যাচ্ছেতাই গালাগালি করেন। পরে গাড়িতে বসে আবার ক্ষমাও চেয়ে নেন। দুঃখ এই যে, তখন টেকনিশিয়ান, আর্টিস্টরা সামনে থাকে না। মিতা বউদির কাছে এ নিয়ে এক বার কমপ্লেন করেছিল মৈনাক। বউদি খুব ঝেড়েছিল রানাদাকে। অবশ্য তাতেও শোধরাননি।

বলুন, স্টোরিলাইনটা এ বার শোনা যাক।

রাহুল বোসের কথায় সোজা হয়ে বসে মৈনাক আর বোধহয় ঠেকানো যাবে না। তবু এক বার মরিয়া চেষ্টা করে, ফিল্মটার জন্য একটা হেলিকপ্টার ভাড়া করতে হবে। কোনও অসুবিধে নেই তো? বাজেট পারমিট করবে?

একটু ভেবে নিযে রাহুল বোস বলেন, মনে হয় অসুবিধে হবে না। আপনি গল্পটা বলুন।

ঠিক তখনই চা নিয়ে দোতলায় উঠে এল মা। একটু ক্ষণের অন্তত রেহাই পাওয়া গেল। মৈনাক আবার সেই সিনেমার গল্পে ডুব দেয়। হাসি মুখে অতিথিসেবা করছে মা, হয়তো টের পেয়েছে, এই মানুষটার সঙ্গে মৈনাকের সৌভাগ্যও এসেছে বাড়িতে। মায়ের পরিতৃপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে মৈনাকের মাথায় আইডিয়া আসতে শুরু করে, ওই ব্যক্তিত্বময়ী বাড়ি উদ্ধার করতে উকিল নিয়ে আসলেও, পুলিশ নিয়ে আসবে না। পুলিশের জায়গায় থাকবে, ভদ্রমহিলার অফিসের সাবর্ডিনেট কোনও ইয়াং ছেলে। যাকে মহিলা মনে মনে পছন্দ করলেও, মুখে এখন অব্দি কিছু বলেননি। ভেবেছিলেন এই নিরালা গ্রামে এসে মনের কথা বলবেন। ছেলেটিও তার মহিলা বস-এর সান্নিধ্য পছন্দ করে।

ছেলেটি মালকিনের আদেশ মতো দখলদার পরিবারকে উচ্ছেদ করতে এসেছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, ওই বনদেবী টাইপের মেয়ে, সে আসলে ছেলেটির বাল্যপ্রেমিকা। কোনও এক বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রেমিকার পরিবার শহর ছেড়ে গ্রামে আত্মগোপন করে। ছেলেটি এবার কী করবে? নিজের ভালবাসাকেই উচ্ছেদ করতে এসেছে সে।... ভাবতে ভাবতে সিলিং-এর দিকে চোখ চলে গিয়েছিল মৈনাকের। মা বলে, কী রে চা-টা খা, জুড়িয়ে যাবে যে। আমি নীচে যাচ্ছি। আবার চা লাগলে বলিস।

ভাবনা থেকে ফিরে মৈনাক চায়ের কাপ তুলে নেয়। লম্বা চুমুক মেরে শুরু করে গল্প, ধরুন, বাংলা বিহারের মাঝে এক গ্রাম। কোনও এক কালে সে-গ্রাম সমৃদ্ধ ছিল। রেলস্টেশন আছে। অযত্নে দাঁড়িয়ে থাকা সাহেবি আমলের স্কুল। ইতস্তত দু'-একটা পাকা বাড়ি, গ্রামের বেশ ভেতরে ও রকমই একটা বাগানবাড়ি আজ ভগ্নপ্রায়, ঝোপ জঙ্গলে ভর্তি। ওই বাড়িতে এক ডাক্তার থাকতেন। খুব নামকরা ডাক্তার। কলকাতায় পসার ছিল। উনি কিন্তু গ্রামে থাকাই পছন্দ করতেন। ওঁর সঙ্গে থাকতেন স্ত্রী আর এক মেয়ে। সেই মেয়ে এখন বিরাট এক কোম্পানির বস। শহরের ফাস্ট লাইফে মেয়েটি ভীষণ ক্লান্ত, তার মানসপটে মাঝেমধ্যেই ভেসে ওঠে কিশোরীবেলায় ফেলে আসা সেই গ্রাম। মেয়েটা এ বার ফেরত আসছে নিজের বাড়ি, সঙ্গে...

গভীর মনোযোগ দিয়ে গল্পটা শুনছেন রাহুল বোস। মুখ দেখে আন্দাজ করা যাচ্ছে, খারাপ লাগছে না। মৈনাক উৎসাহ পেয়ে হেলিকপ্টারে চাপিয়ে মেয়েটিকে পুরনো বাড়িতে নিয়ে আসে। তখনই একটু থামতে বলেন রাহুল বোস। তারপর বলেন, মেয়েটি হঠাৎ হেলিকপ্টারে আসতে যাবে কেন? ভাল কোনও এসি কার-এ এলেই তো পারে।

মনে মনে জিভ কাটে মৈনাক। মুখে বলে, তা পারে। এই জন্যেই রানাদা তাকে বলে, তোর মাঝেমধ্যে বিদেশি সিনেমার চোঁয়া ঢেকুর ওঠে। বাংলায় ফিরে আয়। বাংলার জল, মাটি, সংস্কৃতি মাথায় রেখে ভাব। রানাদার কথা শিরোধার্য করে গল্পটা এগিয়ে নিয়ে যায় মৈনাক।

ভেতর ভেতর একটা টেনশন হয়, শেষটা ভাবা হয়নি। যদি বলতে বলতে ম্যাজিকের মতো এন্ডিংটা এসে যায়, এই আশায় বুক বেঁধে থাকে। কিন্তু না, সেই একই জায়গায় এসে থামতে হয়, 'ছেলেটি এ বার কী করবে?'

রাহুল বোস বলেন, সত্যিই খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে। সত্যিই ছেলেটা এবার কী করবে? কাকে বেছে নেবে?

গম্ভীর ভাব করে বসে থাকে মৈনাক। রাহুলবাবু তাড়া দেন, কী হল, এর পর কী?

এর পরই গল্পটাকে একটু গোলমাল পাকিয়ে ফেলেছে। বলে, মৈনাক।

কে গোলমাল পাকিয়েছে? গল্পটা কার?

আমার এক বন্ধুর, লিটল ম্যাগাজিনে বেরিয়েছিল। রাহুল বোস বলেন, ও, তা গড়বড়টা কেমন শুনি।

মনে মনে 'জয় মা' বলে মৈনাক বলতে শুরু করে, আমার বন্ধুর উগ্র রাজনীতির ওপর সামান্য দুর্বলতা আছে, ফলে ওর মতোই শেষ করেছে। জবরদখল পরিবারের মেয়েটি ওই অঞ্চলের উগ্রপন্থীদের সঙ্গে দেখা করে, আলাপ আগেই ছিল। ওদের হয়ে মেয়েটি কাজও করেছে। উগ্রপন্থীদের বলল, বুর্জোয়া ব্যক্তিত্বময়ীকে তাড়িয়ে দিতে। উগ্রপন্থীরা ভদ্রমহিলাকে হুমকি দিল, ইনি কর্ণপাত করলেন না। তারপর ব্লাস্টিং। ভদ্রমহিলাকে বাঁচাতে গিয়ে ছেলেটি প্রাণ দিল। ছেলেবেলার প্রেমিককে হারিয়ে অল্পবয়সি মেয়েটি শোকে পাথর। এখানেই গল্প শেষ।

নাঃ, শেষটা তেমন জমল না। বাট দ্য থিম ইজ ভেরি গুড। আপনার বন্ধুকে বলে, শেষটা চেঞ্জ করা যায় না?

সহজে রাজি হবে বলে মনে হয় না। কথা বলে দেখি, গল্পের রাইটটাও তো কিনে রাখতে হবে।

সে তো বটেই। কিন্তু ইনকমপ্লিট স্টোরির রাইট কিনে কি কোনও লাভ হবে আমাদের? আগে শেষটা নিয়ে ডিসিশনে পৌঁছনো যাক।

রাহুল বোস যে পাক্কা ব্যবসায়ী, বুঝতে অসুবিধে হয় না মৈনাকের, লোকটার হাত দিয়ে ফালতু টাকা খরচা করানো যাবে না। মৈনাক বলে, এক কাজ করা যাক,

হাজার দশেক টাকা অ্যাডভান্স করে দি। টাকা পেয়ে হয়তো একটু নরম হবে। আমাদের ইচ্ছে মতো শেষটা করে নিতে পারব।

খুব ভাল কথা, চলুন, গাড়িতেই আমার চেক বুক আছে, এখনই চেক কেটে দিচ্ছি। বলে, চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়তে যাচ্ছিলেন রাহুলবাবু, এমন সময় ঘরের ফোনটা বেজে উঠল। এখন আবার কে ফোন করল, ভ্রূ কুঁচকে বিছানা থেকে নেমে আসে মৈনাক। নিশ্চয়ই রানাদা করেছেন, খুবই চিন্তায় আছেন, প্রোডিউসার না ফসকে যায়। রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলে মৈনাক। ও প্রান্তে অল্পবয়সি মেয়ের গলা, মৈনাক চ্যাটার্জিকে একটু দেবেন?

বলছি।

একটু ধরুন। বলে মেয়েটি বোধহয় পাশে কাউকে দিল। ও প্রান্ত এ বার বলে উঠল, হ্যালো মনু, আমি পারমিতাদি বলছি রে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ বলো, না, দাঁড়াও সেদিনকার ঘটনার জন্য আগে 'সরি' চেয়েনি। আসলে শরীরের ওই অবস্থা নিয়ে তোমাদের বিব্রত করতে ইচ্ছে করছিল না। বাস ধরে সোজা বাড়ি চলে আসি।

জানি। তুই যে সেফলি বাড়ি পৌঁছেছিস, রাত্তিরে ফোন করে জেনে নিয়েছিল আহেলি।

মৈনাকের মনে পড়ে মা বলেছিল বটে, রাত্তিরে একটা মেয়ে ফোন করেছিল। সে তা হলে আহেলি। মৈনাক বলে, আমার ফোন নাম্বার পেলে কী করে?

ফোন ডিরেক্টরি থেকে, শোন না, তুই কি একদিন আমাদের বাড়িতে আসতে পারবি?

কেন পারব না! কবে যেতে হবে বলো? ইনফ্যাক্ট একটা বিশেষ কারণে আমিই তোমাদের খুঁজে বার করতাম।

কী জন্যে রে?

সেটা প্রথমে তোমার মেয়েকে বলব। সে যদি রাজি হয়, তারপর তোমার সঙ্গে কথা।

হেঁয়ালি করিস না। কী ব্যাপার বল। ও প্রান্ত থেকে অধৈর্য কণ্ঠে জানতে চায় পারমিতাদি। মৈনাক বলে, তোমার পাশে আহেলি কি আছে? ওকে দাও বলছি।

না, নেই। পাশের ঘরে গেছে।

তা হলে তোমার কথা আগে সেরে নাও। বলে মৈনাক। ও প্রান্ত একটু নীরব থেকে বলে, হ্যাঁরে, তোর সোনাদা কেমন আছে রে?

ভাল। বলে, চুপ করে যায় মৈনাক। এর থেকে বেশি আর কিই বা বলা যায়।

ও প্রান্ত আবার নীরব। হঠাৎ বলে ওঠে, ওর ফোন নাম্বারটা দিবি, ডিরেক্টরিতে পাচ্ছি না।

পাবে না। বউদির নামে ফোন। রিসেন্ট নিয়েছে। নাও নোট করো নাম্বার...

ফোন নাম্বার বলার পর মৈনাক বলে, এবার তোমার মেয়েকে ফোনটা দাও।

একটু ধর, দিচ্ছি। বলে, রিসিভার রেখে পারমিতাদি সম্ভবত মেয়েকে ডাকতে গেল। রেখে যাওয়া রিসিভার হয়ে ভেসে আসছে ওয়েস্টার্ন মিউজিক। সুরটা চেনার চেষ্টা করে মৈনাক, পারে না। রিসিভার তোলার শব্দ পায়। ওপ্রান্ত বলে, হ্যাঁ, বলুন কোনও ভণিতা না করেই মৈনাক শুরু করে, সেদিন তোমার সঙ্গে ভাল করে আলাপ হল না, বলার সুযোগ পাইনি, আমি সিনেমায় অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টরের কাজ করি। পারমিতাদিও অবশ্য সেটা জানে না। অনেকদিন পর দেখা হল তো।

বুঝলাম। তারপর?

মেয়েটা বড্ড গম্ভীর দিচ্ছে তো, মৈনাকও রাশভারী চালে বলে, আমাদের নেক্সট ফিচার ফিল্ম-এর জন্য নতুন মেয়ে দরকার। আমার মনে হচ্ছে তোমাকে রোলটায় মানাবে। যদি রাজি থাকো, তোমার দু'-একটা ফোটো আমাকে দিতে হবে। আমার ডিরেক্টরকে দেখাব।

আপনার বলা শেষ হয়েছে?

হ্যাঁ।

সিনেমায় অভিনয় করার কোনও ইচ্ছে আমার নেই।

খুবই হতাশ হয়ে পড়ে মৈনাক, এ আবার কী, একটা টিনএজার মেয়ে সিনেমার অফার সরাসরি না করে দিল! মৈনাকের কেমন জানি সন্দেহ হয়। বলে, তুমি কি আমায় ঠিক বিশ্বাস করতে পারছ না? আমায় কিন্তু পারমিতাদি ছোট থেকেই চেনে। যদি বলো...

কথা কেড়ে নিয়ে ও প্রান্তের আহেলি বলে, জানি। আপনারা এক পাড়াতেই থাকতেন। সে কারণেই আপনার কাছে কিছু কথা জানার আছে আমার।

কী কথা জানতে চায় মেয়েটা? সেটা নিয়ে অবশ্য পরে ভাবলেও চলবে, আপাতত ওকে রাজি করাতে হবে রোলটার জন্য। বনদেবী চরিত্রটা ভাবতে গেলেই ওর মুখটা মনে আসছে। মৈনাক বলে, ভালই হল, আমি কাল তোমাদের বাড়ি যাচ্ছি, ফোটোগুলো গুছিয়ে রেখো। পারমিতাদিকে রাজি করানোর দায়িত্ব আমার। আর তোমার যা বলার কালকেই বোলো।

আপনি আবার ভুল করছেন, সিনেমায় অভিনয় করার কোনও ইন্টারেস্ট

আমার নেই। সেকেন্ডলি কাল আমি বোলপুরে ফিরে যাচ্ছি।

বোলপুরে কেন?

আমি শান্তিনিকেতনে থাকি, বিশ্বভারতীতে বি এ করছি।

মৈনাক বুঝতেই পারে আর কোনও চান্স নেই। সাড়া না পেয়ে আহেলি বলে, এরপর কলকাতায় এলে আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা করব। কথাগুলো জানা আমার খুব দরকার।

মৈনাক শুধু বলে, আচ্ছা।

ও প্রান্তে আহেলি বলে, মাকে কি আর একবার দেব? কিচেনে আছে।

না, থাক। তোমাদের বাড়ির নাম্বারটা দাও।

আহেলি নাম্বার বলে, ফোন সেটের পাশে রাখা প্যাডে মৈনাক নাম্বার টুকে নেয়। 'ছাড়ছি' বলে ও প্রান্তের ফোন কেটে দেয় আহেলি। বিরস মুখে রিসিভার নামিয়ে রাখতে গিয়ে মৈনাক শোনে, কী রাজি করানো গেল না?

রাহুল বোস যে ঘরেই আছেন, ভুলে গিয়েছিল মৈনাক। মাথা নেড়ে বিছানায় গিয়ে বসে। রাহুলবাবু বলেন, হয়ে যাবে রাজি। গল্পটা শুনলে রাজি না হয়ে পারবে না। মার্ভেলাস স্টোরিলাইন। শেষটা ঠিক মতো সাজিয়ে নিতে পারলে হয়তো হিট-ই করে যাবে ছবিটা।

কথাটা এমন ভাবে বললেন রাহুল বোস যেন ছবি হিট করে যাওয়াটা ওঁর কাছে ফাউ। ছবি বানানোটাই আসল। আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়া গেছে, লোকটা যে কেন ছবিটা করতে চাইছে। সেটা এখনও রহস্যের মধ্যে রয়ে গেল!

মৈনাককে হতাশ ভঙ্গিতে বসে থাকতে দেখে রাহুল বোস বলেন, কী হল, চলুন। চেকটা নেবেন তো!

মুখোমুখি হতেই হবে ড্রাইভারের। এড়ানো যাবে না। কী আর করা যাবে, টাকা যখন পাচ্ছেই এক জোড়া জুতো নয় কিনেই দেবে। আলমারির তলা থেকে চটি বার করে পায়ে দেয় মৈনাক। রাহুল বোসকে সঙ্গে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে। রাহুলবাবু বলেন, গল্পটা কি রানাবাবু শুনেছেন?

না।

তা হলে চলুন না, এখন গিয়ে শুনিয়ে আসি।

এক্ষুনি গিয়ে লাভ হবে না। সমস্ত রেডি করে রানাদার কাছে যাওয়া ভাল, নইলে প্রশ্ন করে পাগল করে দেবেন।

সব রেডি করে মানে?

এই ধরুন, স্ক্রিপট কে করবে, কাস্টিং কী হবে। লোকেশন সিলেক্ট করা। প্রি-প্রোডাকশনেরও আগে যে সব কাজ আর কী।

কথা বলতে বলতে মৈনাকরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলিতে এসেছে। রাহুলবাবু বলেন, ভাল কথা, লোকেশনটা কোথায় হচ্ছে?

টাটা, ঘাটশিলা রুটে অথবা বোলপুরের দিকে। লোকেশনে গিয়ে সেটা ঠিক করতে হবে।

ফাইন। কবে যাচ্ছেন লোকেশনে?

দেখি, কালও যেতে পারি। দেদার মিথ্যে কথা বলে যেতে একটুও গলা কাঁপছে না। মৈনাকের। রানাদা জানলে ঝাড় দেবে। গল্পটা শুনলেও রানাদা বুঝতে পারবে আধখেচড়া ব্যাপার। কিন্তু কিছু করার নেই, রানাদাই বলেছে প্রোডিউসার ধরে রাখতে।

বিকেলের আলোয় চুপিসাড়ে সন্ধে ঢুকে পড়ছে। গলির মুখে বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে রাহুলবাবুর গাড়ি। ড্রাইভার গাড়ির বাইরে, উইন্ড স্ক্রিন মুছছে। আর একটু এগোতেই মৈনাকের চোখে পড়ে, সোনাদাকে। রাহুলবাবুর গাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে, গাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে। কী দেখছে?

মৈনাকরা গিয়ে পৌঁছতেই সরে আসে সোনাদা। মৈনাকের সঙ্গে চোখাচোখি হতে অপ্রস্তুত হাসে। মৈনাক বলে, আজ তাড়াতাড়ি ফিরলে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, হয়ে গেল তাড়াতাড়ি। বলে, সোনাদা বাড়ির গলি ধরে। মৈনাকের মাথায় খটকাটা থেকে যায়। কেন সোনাদা ও ভাবে গাড়িটা দেখছিল। সোনাদা কি বৈভবের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, না কি অন্য কোনও কারণ?

গাড়িতে ঢুকে গিয়ে চেক বই বার করছেন রাহুলবাবু। জিজ্ঞেস করেন, নাম কী লিখব?

নামের দরকার নেই। শেষটা চেঞ্জ করতে যদি রাজি না হয়। আপনি বেয়ারার দিন।

মৈনাকের কথা মতো চেক লিখতে থাকেন রাহুলবাবু। আড়চোখে একবার ড্রাইভারের দিকে তাকায় মৈনাক, ওমা, এ কী, ড্রাইভারটি যে লাজুক ভঙ্গিতে হাসছে! তৎক্ষণাৎ ড্রাইভারের পায়ের দিকে চোখ যায় মৈনাকের, নতুন বুট। মৈনাকের জন্যই বাবুর কাছে পেয়েছে, সেই কৃতজ্ঞতায় হাসছে মনে হয়, হাসি বিনিময় করে চোখ সরিয়ে নেয় মৈনাক, যাক, একটা ব্যাপারে অন্তত টেনশন ফ্রি হওয়া গেল।

নিন। বলে, চেক বাড়িয়ে ধরেছেন রাহুলবাবু। টাকার অ্যামাউন্টটা গোটা গোটা

অক্ষরে লেখা, মাসখানেক দিব্যি চলে যাবে। মৈনাকের বুকের ভেতর কে যেন বিরক্তির সঙ্গে পাশ ফিরে শোয়। সম্ভবত বিবেকবাবু। ভদ্রলোকের ঘুমটা কিছুতেই গাঢ় করা যাচ্ছে না। চেকটা নিয়ে পকেটস্থ করে মৈনাক।

রাহুলবাবু বলেন, আমি আপাতত রানাবাবুর কাছেই যাচ্ছি। স্টোরিলাইন যত দূর পর্যন্ত হয়েছে, বলব ওঁকে?

না, দরকার নেই। আমিই বলব। আপনি শুধু জানিয়ে দেবেন, গল্প মোটামুটি ঠিক হয়েছে। কয়েকটা যোগাযোগ সেরেই আমি ফোন করছি রানাদাকে।

ড্রাইভার গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিয়েছে। কী যেন মনে পড়তে রাহুলবাবু বলেন, ও হ্যাঁ, আর একটা কথা। আপনি যে লোকেশন দেখতে যাবেন, তার জন্য তো কিছু পকেটমানি লাগবে।

বিনয়ের সঙ্গে মৈনাক বলে, সে সব নিয়ে আপনাকে এখন ভাবতে হবে না। আমি আপাতত চালিয়ে নেব।

রাহুলবাবু মাথা নেড়ে বলেন, আমি সে কথা বলছি না। এক্সপেন্সটা দিচ্ছি না, এই কারণে, আমি আপনার সঙ্গে যাব। সব খরচ আমার।

কথাটা শেষ করে অমলিন হাসছেন রাহুল বোস। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। ভদ্রলোকের উৎসাহ দেখে থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মৈনাক।

বিকেল উতরানোর আগেই আজ বাড়ি ফিরছে অনীশ। একটু আগে গলির মুখে দামি গাড়িটা দেখে, বুকটা এক বার 'ধক' করে উঠেছিল, অনিবার্য ভাবে মনে হয়েছিল সে হয়তো দেখা করতে এসেছে। সবে ভাবছে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করবে, গাড়ির মালিক কোন বাড়ি গেছে, তখনই মনু একটা ফ্রেঞ্চ কাট ভদ্রলোককে নিয়ে গাড়ির কাছে এল।

অনীশকে গাড়ির কাছে ঘুরঘুর করতে দেখে, কী ভাবল, কে জানে! ক'দিন ধরেই একটা আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে অনীশকে। খালি মনে হচ্ছে, পারমিতা যখন কলকাতায় ফিরেছে দেখা করতে আসবেই। ওর দেখা মানে তো সৌজন্য সাক্ষাৎ হবে না; অনেক সতর্কভাবে তৈরি করা অনীশের নিরাপত্তাবলয়ে আঘাত হানবেই। ওর ধরনটাই এ রকম, অন্ধ, একগুঁয়ে। পারমিতাকে কি তা হলে এখন ভয় পায় অনীশ? অথচ এক সময় পারমিতাই ছিল অনীশের ভাললাগা, নিশ্বাস নেওয়ার জায়গা, বিশ্বস্ত বন্ধু, কামনার নির্বাপণ। অনীশের অভ্যেসের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল পারমিতা। সেই মেয়েটার উপস্থিতি অশুভ লক্ষণ হয়ে দেখা দিয়েছে অনীশের কাছে। এর জন্য পারমিতাকে দায়ী করা যায় না। অনীশের জীবনে বেশ

কিছু আকস্মিক ঘটনা পরম্পরা এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। সেই সব ঘটনা, দিনগুলো ভুলে যেতে চায় অনীশ। পারমিতা দূরে সরে গিয়ে ভুলতে সাহায্য করেছিল। কেন ফিরে এল আবার?

পাঁচিলের গায়ে অনীশদের সদর আলাদা। চৌকাঠ ডিঙিয়ে উঠোনে আসে অনীশ। নীচের তলায় মা থাকে। ওপর তলায় অনীশরা। মায়ের ঘরের পাশের ঘরটা অনুর। ফাঁকাই পড়ে থাকে। চাকরি জীবনে আর কলকাতায় ফিরতে পারবে বলে মনে হয় না।

ওপরের ঘরে বিল্টুর পড়ার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। নীচের দরজায় দাঁড়িয়ে কলিং বেল না টিপে, কড়া নাড়ে অনীশ। মা রান্নাঘর থেকে 'কে! কে রে?' বলে, একটু পরে দরজা খোলে। অনীশকে দেখে অবাক হয়ে বলে, কী রে, এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলি! শরীর-টরীর খারাপ না কি?

মাথা নেড়ে অনীশ মায়ের ঘরে গিয়েই বসে। অন্যদিন হলে ওপরে উঠে যেত। একটু জিরিয়ে নিয়ে, চা খেয়ে দেখা করতে আসত মায়ের সঙ্গে। অথবা মা উঠে যেত ওপরে। কাল থেকে রুটিনটা বার বার ভেঙে যেতে চাইছে।

আজ যেমন অফিসে কাজ করতে করতে বিকেলের দিকে বাড়ির জন্য মনটা উতলা হল। কোনও কারণ নেই এমনিই। মনে হল অনেকদিন সুতপা, বিল্টু, মায়ের সঙ্গে বসে গল্প করেনি। লেখা, নাটক, সাহিত্যসভা সামলাতে গিয়ে একটু যেন উপেক্ষা করে ফেলছে ঘরের মানুষকে।

বাড়ি তাড়াতাড়ি এল, অথচ ওপরে উঠতে উদ্যম পাচ্ছে না।

নে, চা-টা ধর। আমি বউমাকে খবর দিচ্ছি তুই এসেছিস। হাতে চায়ের কাপ ধরিয়ে ঘুরে যায় মা। অনীশ বলে, থাক, এখন ডেকো না। বিল্টুকে পড়াচ্ছে, ক্ষতি হবে।

মা আবার অনীশের দিকে ফেরে। কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ। বলে, আমার কিন্তু বাপু তোর শরীর গতিক ভাল ঠেকছে না।

বলছি তো কিছু হয়নি। তুমি সবেতেই এত চিন্তা কর কেন! অনীশের গলায় অসহিষ্ণুতার ছোঁয়া। মায়ের তাতে কিছু যায় আসে না। নতুন উদ্বেগে জানতে চায়, তা হলে কি অফিসে কিছু হল?

উত্তর দিতে ভাল লাগছে না। চুপচাপ চা খেয়ে যায় আনীশ। মা-ও খানিক নীরব। তবে পাশ থেকে যায়নি। একটু পরে বলে ওঠে, খবর পেলি কিছু?

কথাটা চাবুক হয়ে পিঠে নামে অনীশের। শিউরে সোজা হয়ে বসে। বছর কুড়ি আগের সেই প্রশ্নটা আবার করছে মা। এখনও ভোলেনি! সুরটাও একই রয়ে

গেছে। শুধু প্রশ্নের মধ্যে আকুলতাটা কেমন জানি নিস্তেজ। বাবার কথা জিজ্ঞেস করছে মা। বাবার কোনও খবর। গভীর বিস্ময়ে মায়ের মুখের দিকে তাকায় অনীশ। চোখ নামিয়ে নেয় মা। কুণ্ঠিত স্বরে বলে, দাঁড়া, বউমাকে ডেকে দিই।

মা চলে গেলে, একা ঘরের ফ্যানের দিকে চেয়ে বসে থাকে অনীশ। মা-কে আজ পর্যন্ত বাবার কোনও খবর দিতে পারেনি সে। বড় ভীরু, অপরাধী লাগে নিজেকে। দ্রুত ধেয়ে আসে বাবার স্মৃতি। বড় আপনভোলা, শিল্পী মানুষ ছিলেন বাবা। অসম্ভব প্রতিভাধর অভিনেতা। সারাক্ষণ নাটক, অভিনয় নিয়েই ডুবে থাকতেন। চেহারাটাও ছিল রাজপুরুষের মতো। গমগমে কণ্ঠস্বর। বাবাকে নিয়ে ভীষণ গর্ব ছিল অনীশের। যখনই বাবার হাত ধরে দোকান বাজার বেরোত, আশপাশের মানুষদের মনে হত ছোটখাটো সাধারণ মানের। পাড়ার অনেকেই বাবার মুখোমুখি হলে দাঁড়িয়ে পড়ে নমস্কার করতেন। বাবা প্রতি নমস্কার জানাতেন বিনয়ের সঙ্গে।

এখনও অনীশের স্পষ্ট মনে আছে, পাড়ার কোনও গলি দিয়ে হয়তো হেঁটে যাচ্ছে বাবার সঙ্গে। গৃহস্থের জানলায় মহিলাদের হুড়োহুড়ি লেগে যেত। তারা হয়তো আগের সন্ধেতেই রঙ্গনা হলে তাপস চ্যাটার্জিকে অভিনয় করতে দেখেছে।

খ্যাতি ব্যাপারটা নিয়ে কোনও দিন মাথা ঘামাতেন না বাবা। ভাল কাজ করার জন্য মনের মধ্যে থাকত তীব্র ক্ষুধা। সিনেমার অ্যাক্টিং-এর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেননি। এ দিকে থিয়েটারপাড়াও হয়ে আসছে নিস্প্রভ। মনের দিক থেকে একটু যেন দমে গিয়েছিলেন। যাত্রার অফার আসত, নিতেন না। সিনেমার ছোটখাটো রোলও না করে দিতেন। ধীরে ধীরে অনীশদের আর্থিক অবস্থা খারাপ হতে লাগল। তার প্রভাব পড়ত খাবার পাতে। নিচু গলায় হলেও, মা নিত্য দিন গঞ্জনা দিত বাবাকে। বলত, আর তিন ভাইয়ের মতো তুমিও তো চাকরি করতে পার। ছেলেদুটো একটু ভালমন্দ খেয়ে বাঁচতে পারে। এখন ওদের পড়াশোনার কত চাপ। এই খেয়ে ধকল নিতে পারবে?

এই সব শোনার পর বাবার মুখ বিবর্ণ, পাণ্ডুর হয়ে যেত। বলতেন, চাকরি সবার জন্য নয় মাধবী। শিল্পী মানুষ চাকরি করতে যাওয়া মানে, প্রতিষ্ঠানেরই ক্ষতি।

উত্তেজিত হত মা। সেই সময় মুখ ফসকে ছেলেদের সামনে বলে ফেলত, শিল্পী. শিল্পী করে আর গাওনা গেয়ো না। তাই যদি হত, তুমি সিনেমা যাত্রার ডাক ফিরিয়ে দিতে না এ ভাবে। কেন যে থিয়েটার নিয়ে পড়ে আছ, সে আমি ভাল করেই জানি।

এই হেঁয়ালিটা বুঝতে আরও কিছু বছর সময় লেগেছিল অনীশের। ততদিনে তাদের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। তার থেকেও খারাপ হয়েছে থিয়েটারের পোস্টার। অর্ধনগ্ন নারী শরীরের উত্তেজক ভঙ্গির কুশ্রী ছবি। মিস অমুকের নাম বড় বড় অক্ষরে লেখা। বাবা, মণিকামাসির নাম ছোট অক্ষরে। আর গৃহস্থের জানলায় ভিড় হত না। দেওয়ালের পোস্টারগুলো যেন বাবাকে ভেঙাত।

দেরি করে বাজার যেতেন বাবা। দামটা সস্তা পড়ত। তখনও বেছে নিয়মিত মাছ নিয়ে আসতেন। সপ্তাহে দু'তিন দিন সন্ধের দিকে মণিকামাসি আসত, সঙ্গে ভাল মাছ বা মুরগির মাংস। মা রান্না করত যত্ন করে। বাবা, মণিকামাসি থিয়েটারের সর্বনাশ নিয়ে সারা সন্ধে আলোচনা করতেন। এখানেই একটা হিসেব মেলাতে পারত না অনীশ, থিয়েটারের অবস্থা খারাপ হয়ে গেলে, বাবা কেন একা গরিব হয়ে যাবে। মণিকামাসি তো দিব্যি আছে। দিব্যি ভাল শাড়ি, গয়না পরছে, ভাল খাবার দাবার নিয়ে আসছে...

রহস্যটা উদ্ধার হয় অনেক পরে। এত কিছুর মধ্যেও বাবা অনুশীলন ছাড়েননি। রোজ ভোরবেলা উঠে আবৃত্তি করতেন। অনীশকেও বলতেন করতে। গলা মেলাত অনীশ। বাবাকে কখনওই মদ, সিগারেট খেতে দেখা যায়নি। মহলার জন্য কখনও কখনও সহ অভিনেতাদের ডেকে আনতেন বাড়িতে। টানা রিহার্সাল চলত। প্রায়শই থিয়েটারের দু'-একজন দুপুরে খেত এ বাড়িতে। বিনা বিরক্তিতে রেঁধেবেড়ে দিত মা। তারা খেতে বসে মায়ের রান্নার প্রশংসা, বাবার অভিনয় নিষ্ঠার গুণকীর্তন করত খুব। মণিকামাসি এর বাইরে ছিল না। সেই সব প্রশংসা মৃদু হাসি সহযোগে মা বেশ উপভোগ করত। তখন কে বলবে আড়ালে মা কী হারে গঞ্জনা দেয় বাবাকে! আসলে মায়ের চরিত্রটাই অদ্ভুত, বাইরের সব মানুষের সঙ্গে দারুণ ব্যবহার করবে, যত রাগ বাবার ওপর। এত করেও মা কিন্তু জয়েন্ট ফ্যামেলির অন্য পরিবারের কাছে উপেক্ষাই পেয়ে এসেছে। কাকা, জ্যাঠার পরিবারের কেউ খুব দরকার ছাড়া অনীশদের পোর্সানে আসত না। একে অপরের সঙ্গে মেলামেশা হত ছাদে অথবা বাড়ির বাইরে। বড়জ্যাঠার মেয়ে বেলিদি প্রথমে অনীশের মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়। মেয়ে তো, একটু আগেই পেকে ছিল। প্রায়ই মণিকামাসির কথা তুলত, হ্যাঁ রে, কখন আসে, কখন যায়? অনীশ গোড়ার দিকে সরল মনে উত্তর দিত। তারপর এক সময় লক্ষ করল মাণিকামাসির প্রসঙ্গ উঠলেই জেঠিমা, কাকিমারাও ওকে ঘিরে ধরেছে। ওদের এত কৌতূহলের কারণ বুঝতে না পেরে অনীশ মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, ওরা মণিকামাসির সম্বন্ধে এত জানতে চায় কেন?

মা বলেছে, জানি না বাবাকে জিজ্ঞেস কর।

কলেজে উঠে অনীশ জানতে পারে, মণিকামাসি কলকাতার এক বড়লোকের রক্ষিতা। যিনি বাবাদের প্রোডাকশানে ইনভেস্ট করেন।

মণিকামাসির জন্য দুঃখই হয়েছিল খুব। আহা বেচারি, যতই দামি শাড়ি গয়না পরে থাকুক, এ সবই তো পেয়েছে নিজেকে বন্ধক দিয়ে। গরিব হলেও বাবা সে তুলনায় অনেক ভাল আছে। 'সিম্পল লিভিং হাই থিঙ্কিং, ব্যাপারটা বাবাকে দেখেই শিখছিল অনীশ। তখন ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি মায়ের সেই হেঁয়ালি মার্কা গঞ্জনা এ ভাবে ফলে যাবে। বাবা থিয়েটার ছেড়ে দিলেও মণিকামাসিকে ছাড়তে পারেননি। পালিয়ে গেলেন। যদিও এই সম্ভাবনার লক্ষণ ক'দিন আগেই প্রকট হয়েছিল। অনীশ তখনই টের পায় তাদের পরিবারে হঠাৎই এক বিপর্যয় নেমে আসতে পারে, কিন্তু তার কিছু করার ছিল না। বাবার দ্রুত পতনে সে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল।

একদিন অনেক রাত করে বাড়ি ফিরলেন বাবা। বাড়ি নয়, বাড়ির দোরগোড়ায়। যে বাবা কোনও দিন মদ ছুঁতেন না, সদরে দাঁড়িয়ে মাতালকণ্ঠে চেঁচাতে শুরু করলেন, মাধবী, মাধবী। তোমার একটা ছেলেকে পাঠিয়ে দাও. আমি বাড়ি ফিরেছি, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারব না। ...বারংবার একই কথা বলছিলেন বাবা। দোতলার ঘরটাই ছিল বাবার থাকা, শোওয়া, সাধনার জায়গা। বাবার চিৎকারে, কাকা-জ্যাঠার পোর্সানের আলো জ্বলে উঠে, আবার নিভেও গেল। অনীশ দৌড়ে যাচ্ছিল বাবাকে তুলে নিয়ে আসতে। মা চোখ পাকালো, খবরদার যাবি না। বাড়ি অব্দি যখন এসেছে, ওপরেও উঠতে পারবে। ঘরের জানলাগুলো ফটাফট বন্ধ করে দিল মা। বাবা তখনও চেঁচাচ্ছেন, কী হল মাধবী, কথা কানে গেল না! ছেলেদুটো কি না খেতে পেয়ে মরেই গেল? আরে বাবা, আমাকে নিতে আসতে যদি লজ্জা করে, তা হলে অন্তত আলোফালো দেখাও, এখানটা যে বড্ড অন্ধকার।

মা গুম হয়ে বসে রইল ঘরে। অনু মায়ের পাশ ঘেঘে দাঁড়িয়ে দাদার দিকে চেয়ে থাকল। অনীশ সারা ঘর জুড়ে পায়চারি করছে অসহায় ভাবে। কলেজে পা রাখলেও মায়ের বিরুদ্ধাচারণ করার ক্ষমতা তার নেই। এমনই ছিল মায়ের ব্যক্তিত্ব।

এক সময় বাবার চিৎকার থেমে গেল। মা বলল, যা দেখে আয়, অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল কি না।

টর্চ হাতে নিয়ে তক্ষুনি দৌড়েছিল অনীশ। সদরে গিয়ে দেখে বাবা নেই। গলি

শুনশান। অন্ধকার গলি ধরে এ দিক ও দিকে ছোটাছুটি করতে থাকল অনীশ, বাবার কোনও চিহ্নই নেই। মনে হতে লাগল, বাবা হয়তো আসেইনি। ডাকটা ছিল নিশির ডাক। ভাবনাটা মাথায় আসতেই ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল অনীশ, অপঘাতে মারা যাওয়ার পর আত্মার ঘরে ফেরার গল্প অনেক শোনা যায়। বাবার ফিরে আসার ব্যাপারটা সে রকমই কিছু নয় তো? কলেজে পা রাখা অনীশের এ সব বিশ্বাস করার কথা নয়, তবু ওই মুহূর্তে মন ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

প্রচণ্ড আশঙ্কায় খবরটা মাকে এসে দেয়। অত্যন্ত নিরুত্তাপ কণ্ঠে মা বলে, ভালই হয়েছে, যেখান থেকে এসেছিল, সেখানেই ফিরে গেছে। তোরা শুয়ে পড়।

মায়ের কথা মতো শুয়ে পড়লেও, ঘুম এল না সারা রাত। কানে বাজছিল বাবার চিৎকার। ভোর হতে মনুর বাবা বিনয়কাকা এলেন বাবার কী হয়েছে জানতে, কেন রাত্তিরে চেঁচামিচি করছিল।

বিনয়কাকার সামনেই মা একদম ভেঙে পড়ে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, ঠাকুরপো এখনও সময় আছে, তোমার দাদাকে সামলাও, ও তো নিজেকে শেষ করে ফেলছে। মায়ের পেটের ভাই হয়ে তোমরা যদি ওকে না দেখো, তা হলে আর কে দেখবে!

গম্ভীর মুখে মায়ের বিলাপ শুনলেন বিনয়কাকা। তারপর অনীশকে বললেন, চল আমার সঙ্গে, চেনাজানা জায়গাগুলো খুঁজে দেখি।

অনীশ তক্ষুনি রেডি। বেরিয়ে পড়ল কাকার সঙ্গে। নানান রাস্তায় ঘুরপাক খেতে খেতে, দু'তিন রুটের বাসে উঠে নেমে অনীশ বুঝতে পারল, কাকা-জ্যাঠাকে যতটা বাবার সম্পর্কে, উদাসীন মনে হয়, তা কিন্তু সত্যি নয়। বাবা যেতে পারে এমন অনেক জায়গাই চেনেন বিনয়কাকা। ছ'সাতটা বাড়ি, দুটো হোটেল ঘুরে, অনীশরা গেল বেলেঘাটায় এক প্রাসাদতুল্য বাড়ির সামনে। গেটের থামে পিতলের প্লেটে 'শিবনাথ সাহা' লেখা। গেটের দারোয়ানকে বিনয়কাকা বললেন, মণিকাদেবীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

দারোয়ান বিনয়কাকার পরিচয় জানতে চাইল। কাকা নিজের নাম বলে, বাবার নামটাও যোগ করে দিলেন, মেমসাহেব কো যাকে বোলো, তাপস চ্যাটার্জি কা ভাই, ঔর লেড়কা আয়া হ্যায়।

দারোয়ান ভেতর বাড়ি থেকে ঘুরে এসে বলল, মেমসাহেব কা তবিয়ত ঠিক নেহি হ্যায়, দেখা নেহি হোগা।

বিমর্ষ মুখে ফিরে আসতে আসতে বিনয়কাকা বললেন, ভুল হল রে, মালিকের

সঙ্গে দেখা করতে চাইলে ভাল হত। ভদ্রলোককে বলে আসতাম পোষা পা
সামলে রাখতে।

সেই প্রথম কাকা অনীশের সঙ্গে এত খোলাখুলি কথা বললেন, অথবা ব
যেতে পারে, টেনে নিলেন বাড়ির গুরুজনদের দলে।

ক্লান্ত, বিধ্বস্ত হয়ে অনীশ, বিনয়কাকা বাড়ি ফিরে এসে, অবাক! বাবা ফি
এসেছেন। দোতলা থেকে দরাজ কণ্ঠের আবৃত্তি ভেসে আসছে।

বিনয়কাকা বললেন, তুই যা। বউদিকে আপাতত বকাবকি করতে বারণ কর
আমি বেলার দিকে মেজদার সঙ্গে দেখা করে, বুঝিয়ে বলব।

কাকা চলে যেতে অনীশ বিড়াল পায়ে ঢুকেছিল নিজেদের পোর্সানে। ম
রান্নাঘরে অন্যান্য দিনের মতো রান্নায় ব্যস্ত। মায়ের পাশে মেঝেতে বসে অ
স্কুলের পড়া করছে। পরিস্থিতি মোটামুটি স্বাভাবিক। তারপর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে
ঘরে গিয়েছিল অনীশ। আবৃত্তি থামিয়ে বাবা অনীশকে দেখে হাসলেন। ভোরে
সূর্যের মতো হাসি। দাড়ি কামিয়ে, চান করে রাতের সমস্ত গ্লানি মুছে ফেলেছেন
বললেন, কোথায় কোথায় খুঁজে এলি?

যাঁর কর্মকাণ্ডে বিব্রত অনীশ, তাঁর সামনেই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল
বাবা আবার বলেন, রাতে শুয়েছিলাম ঘোষালবাড়ির রকে। দেখলাম, তুই ট
জ্বালিয়ে ছোটাছুটি করছিস। বেশ লাগছিল। অনেকদিন পর গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছি
নিজেকে।

কথার মাঝখানে অনীশ বলে উঠেছিল, তারপর কোথায় গেলেন?

ভোরবেলা উঠে গেলাম খড়পট্টির ঘাটে। অনেকক্ষণ ধরে গঙ্গার বাতা
খেলাম। মনটা ঝরঝরে হয়ে গেল। তারপর গেলাম লাইব্রেরিতে। সুবোধবাবু
অনেকদিন থেকেই বলাচ্ছিল 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথম নাট্যরূপটা জোগাড় কর
দিতে। বলে, বাবা টেবল থেকে একতাড়া কাগজ তুলে দেখালেন, এই হল
'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথম নাট্যরূপ। ১৮৭৩ সালে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়
আমি ভাবছি, অবিকল এই নাট্যরূপ ফলো করে নাটকটা নামাব। চলে যা
থিয়েটারের গোড়ার দিকে। বিনোদনের চাহিদা মেটাতে মেটাতে প্রফেশনা
থিয়েটার এখন নিম্নরুচির দর্শকদের পোষা মেয়েমানুষ হয়ে গেছে।

কথাগুলো বলে বাবা নিজের পড়ার টেবিল চেয়ারে গিয়ে বসলেন। ডুব দিলে
১৮৭৩ সালে বাংলা থিয়েটারের প্রথম যুগে। অনীশ নিশ্চিন্ত হয়েছিল, বাব
আবার নাটকে নতুন করে উৎসাহ পাচ্ছে।

অনীশকে বিভ্রান্ত করে রাত্তিরের ঘটনা মোড় নিল অন্য দিকে, সদরে

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার পরও বাবা ফিরলেন না। ঘোষালবাড়ির রকে দু'জনকে চাদর মুড়ে শুয়ে থাকতে দেখে, ধাক্কা দিয়ে ডেকেছিল অনীশ। দু'জনের কেউই বাবা নন। রাস্তার ভিখারি।

পরের দিন দুপুর গড়িয়ে গেল। কখন জানি বাতাসে উড়ে একটা খবর চলে এল পাড়ায়। মণিকাদেবীও উধাও হয়েছেন বেলেঘাটার বাড়ি থেকে। অনেক খুঁজেও বাবাকে আর পাওয়া গেল না। অনীশ ধরেই নিল, বিনোদনের গহ্বরে ঢুকে যাওয়া নাটক নয়, মণিকামাসিকে নিয়েই পালিয়ে গেছেন বাবা।

এ কী গো, চোখ বন্ধ করে বসে আছ! তোমার কি সত্যিই শরীর খারাপ?

সুতপার গলা পেয়ে বর্তমানে ফেরে অনীশ। একটু আশ্চর্য লাগে, মায়ের কাছে খবর পেয়ে সুতপা নিশ্চয়ই দেরি করেনি নীচে আসতে, মিনিট খানেকের মধ্যেই পিছনের এত ক'টা বছর ঘুরে এল অনীশ।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সুতপা বলে যাচ্ছে, ফ্যানটাও চালাওনি দেখছি, জ্বর এল না কি?

মায়ের সামনে অনীশের কপালে হাত রেখে জ্বর দেখতে অস্বস্তি হচ্ছে সুতপার। অনীশ সোজা হয়ে বসে বলে, না, না সে রকম কিছু নয়। একটু টায়ার্ড লাগছিল। তা ছাড়া আজ তো ফ্যান চালানোর মতো গরম পড়েনি।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে অনীশ। ওর সহজ ভঙ্গি দেখে মা, সুতপা একটু আশ্বস্ত হয়। মা বলে, মুড়ি মাখা খাবি তো, না কি অন্য কিছু করে দেব?

যা হোক একটা দাও, বলে অনীশ সুতপাকে জিজ্ঞেস করে, বিল্টু কোথায়, নীচে এল না তো।

যাও, ঘরে গিয়ে দেখো। আমি তোমার খাবার নিয়ে যাচ্ছি।

নীচের কলঘরে হাতমুখ ধুয়ে, সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় ওঠে অনীশ। ঘরে এসে দেখে বিল্টু কান ধরে বিছানার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের কাছে বইখাতা ছড়ানো। অনীশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, কী হল রে?

কানে হাত রেখেই অপরাধী কণ্ঠে বিল্টু বলে, 'ইয়াক' বানান পারিনি।

একটু যেন খারাপই লাগে অনীশের, আহা রে ক'দিন আগেও এই মেঝেতে হামা টেনেছে ছেলেটা, এখনই ওকে এত কঠোর ভাবে মানুষ করা হচ্ছে! অনীশ বলে, বানানটা হচ্ছে...

তোমাকে বলতে হবে না। আমি জানি।

জানিস তো, কান ধরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? অবাক হয়ে জানতে চায় অনীশ।

তখন জানতাম না। এখন মনে পড়ে গেছে।

মনে যখন পড়েই গেছে, বানানটা বলে, কান ছেড়ে বসে পড়।

বিল্টু বানানটা বলতে যাবে, সুতপা বাটি হাতে ঘরে ঢোকে, ও সব আমি শুনা
না। ওকে আধ ঘণ্টা এখনও কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

সুতপার হাত থেকে মুড়ির বাটি নিয়ে অনীশ বলে, কেন! বলছে তো ওর মনে পড়ে গেছে।

মনে পড়েছে, না হাতি। আমি নীচে গেছি, সঙ্গে সঙ্গে বই দেখে নিয়ে নির্ঘাত।

ঠিকই তো, এ দিকটা ভেবে দেখেনি অনীশ। ছেলের দিকে তাকাতে দেখে ঠোঁট টিপে হাসছে। সত্যিই আজকালকার দিনে বাচ্চারা এই বয়সেই ক বুদ্ধিমান! মায়েদেরও এদের সঙ্গে পাল্লা টানতে হচ্ছে। অনীশ ছোটবেলায় অনে বারই এই সিচুয়েশনে পড়েছে। বই দেখার কথা ভাবতেই পারেনি। চেয়ারে গি বসে অনীশ।

বাবা, রং পিচকারি কিনতে যাবে না?

কান ধরা অবস্থাতেই বলে বিল্টু। অনীশের খেয়াল পড়ে, পরশুই দোল। আজ যখন রবীন্দ্র সরণি দিয়ে আসছিল, ফুটপাতে বেশ কিছু রঙের দোকান দেখেছে সুতপা আলমারি খুলে কী যেন করছিল। বলে ওঠে, না, বাবা আজ যাবে না শরীর ভাল নেই। রং কাল কেনা হবে।

কী হয়েছে বাবার? বলে, কান ছেড়ে বিছানা থেকে নেমে আসে বিল্টু। তখন ওর আড়ালে থাকা জানলার বাইরের আহ্লাদি চাঁদটাকে দেখতে পায়। অনীশ। মনে পড়ে সেই মেয়েটার মুখ। দোলের দিন সকালবেলা একমুঠো আবির নিয়ে ত্রস্ত পা গলি ধরে হেঁটে আসছে। দু'-একজন ওকে রং মাখালো, মাথা নিচু করে তা গ্রহ করলেও, উলটে ওদের রং দিল না। মেয়েটির এখনও রং খেলা শুরু হয়নি। ও মুঠোয় ধরা যে আবির, সেটা নিজের প্রেমিককে মাখিয়ে রং খেলায় মাতবে।

বাবা, বলো না, কী হয়েছে তোমার? মুড়ির বাটিতে থাবা বসিয়ে জানতে চা বিল্টু।

কিচ্ছু হয়নি। চল, মুড়ি খেয়েনি, তারপর তোকে নিয়ে রং কিনতে যাব।

ইয়া: বলে, বিল্টু হাতদুটো ওপরে তুলে আবার নীচে নামিয়ে কনুই ভাঁজ করে এটা আন্তর্জাতিক আনন্দ প্রকাশের স্টাইল। সত্যি, টিভি আমাদের কত কি শেখাচ্ছে!

বিল্টুর উচ্ছ্বাস দেখে সুতপাও না হেসে পারে না। পরিবারের এই মধু বাতাবরণ অনীশকে বড় শান্তি দেয়। অনেক খারাপ ঘটনা, অপমান, উপেক্ষা সহ করে অনীশ আজ এখানে পৌঁছেছে। এখন আর পৃথিবীটাকে তত খারাপ লাগে

না। বিশেষ করে যে ঘরে বিল্টুর মতো চাঁদের টুকরো ছেলে আছে, সে পরিবারে বিষণ্ণতা স্থায়ী হয় না। সুতপাও ভীষণ ভাল মেয়ে। এত গুছিয়ে সংসার করে, মায়ের সঙ্গে কখনওই ঝগড়া করে না, কাকা, জ্যাঠার ফ্যামেলির মেম্বাররাও সুতপার জন্যই এ পোর্সানে আসতে আগ্রহ পায়। চ্যাটার্জিবাড়ির মেজছেলের পোর্সানের আধোঅন্ধকার সুতপাই কাটিয়ে দিয়েছে। অনীশের কেমন জানি সন্দেহ হয়, বিয়ের আগে এক বছর প্রেমপর্বে সুতপা প্যারালালি 'সুখী দাম্পত্য'র একটা ক্রাশ কোর্স করেছে নিশ্চয়ই। আজ কেন জানি সুতপা, বিল্টুকে নিয়ে হাঁটতে ইচ্ছে করছে, সুতপাকে নিয়ে আজকাল বেরোনই হয় না। শেষ বোধহয়, নিজের লেখা নাটকটা আকাদেমিতে দেখতে নিয়ে গিয়েছিল। সুতপার উদ্দেশে অনীশ বলে ওঠে, যাবে না কি আমাদের সঙ্গে, রং কিনতে?

আমার আর খেয়ে দেয়ে...

সুতপার কথার মাঝে ফোন বেজে উঠল। টিভির টেবিলের পাশে ফোনসেট। সুতপা গিয়ে রিসিভার তোলে, হ্যালো। হ্যালো...

বার পাঁচেক হ্যালো বলার পরও সাড়া পায় না সুতপা। ততক্ষণে সাপের শরীরের মতো ঠান্ডা ভয় অনীশের পা বেয়ে উঠতে শুরু করেছে। পারমিতা কি? বিরক্ত হয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখে সুতপা। তারপর অনীশের দিকে ঘুরে গিয়ে বলে, কী ব্যাপার বলো তো। তুমি অফিস থেকে ফেরার আগেও ফোনটা এসেছিল। কোনও উত্তর দিচ্ছে না!

অবলা পশুর মতো নিরীহ চাউনি নিয়ে সুতপার দিকে তাকিয়ে থাকে অনীশ। ধীরে ধীরে সুতপার কপালে পড়া বিরক্তির ভাঁজ মিলিয়ে যায়। ফিক করে হেসে বলে, তোমার কোনও মহিলা পাঠক নয়তো? বাবা, একটা উপন্যাসেই এই অবস্থা!

বোকা বোকা হেসে নিজেকে ধাতস্থ করে অনীশ। তারপর বলে, চলো না আমাদের সঙ্গে, একটু ঘুরে আসবে।

না বাবা, আমার অত সময় নেই, ঘরের বেশ কিছু কাজ পড়ে আছে। মায়ের সঙ্গে রান্নায় হাত লাগাতে হবে। বলে, বিল্টুর বইপত্তর গোছাতে থাকে সুতপা।

কোনও ভূমিকা ছাড়াই অনীশ হঠাৎ বলে ওঠে, জানো সুতপা, মা মনে হয় এখনও বিশ্বাস করে, বাবা একদিন ফিরে আসবেন।

হ্যাঁ, না আসারই বা কী আছে। তোমার বাবার এখন কত বয়স হয়েছে? ছেষট্টি-সাতষট্টি। কোনও যদি অঘটন না হয়ে থাকে, ফিরে আসতেই পারেন।

বেশ অনায়াস ভঙ্গিতে কথাটা বলল সুতপা। কথার পিঠে অনীশ বলে, বাবা যদি হঠাৎ ফিরে আসেন, তুমি কী করবে?

মানে? ভ্রূ কুঁচকে জানতে চায় সুতপা।

প্রশ্নটাকে একটু গুছিয়ে নিয়ে অনীশ বলে, মানে, বাবার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা আসবে? ওঁর সেবা শুশ্রূষা করতে ইচ্ছে করবে তোমার?

অন্যমনস্ক ভাবে সুতপা বলে, জানি না। তবে ওঁকে আমার দেখতে বড় ইচ্ছে করে। জানতে কৌতূহল হয় মায়ের মতো সংসারপ্রিয় মানুষ, তোমাদের মতো বাধ্য, ভাল ছেলেদের ছেড়ে কেন চলে গেলেন উনি? ওই মহিলা কোন মায়ায় ভুলিয়েছিলেন ওঁকে?

সুতপা জানে না তার প্রশ্নগুলো করা হচ্ছে অন্ধকারের উদ্দেশে। বাবা কোনও দিনই আসবেন না উত্তর দিতে। সত্যি জানে একমাত্র অনীশ। আজও সে কথা মায়ের সামনে মুখ ফুটে বলে উঠতে পারেনি।

অধোমুখে অফিসের জামা প্যান্ট বদলায় অনীশ। সুতপা বিল্টুকে রেডি করতে থাকে।

বিল্টুকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে অনীশ। আকাশের চাঁদটাও যেন চলেছে তাদের সঙ্গে। হাওয়ায় বসন্তের স্মৃতি উসকে দেওয়া গন্ধ। শ্যামপুকুর মাঠে রাবণ পোড়ানো হত। অনীশ লিডার। ভাই বোনেরা ক'দিন ধরেই কাঠকুটো, ছেঁড়া জামা জোগাড় করছে, খড়পট্টি ঘাটের কারণে বিচালির অভাব নেই। পারমিতার বাবা পাড়ার বড়লোকদের একজন। কাকাবাবুর থেকে অনেক টাকার বাজি আদায় করত পারমিতা। এ দিকে এত ভীতু, কানে আঙুল দিয়ে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে নেড়াপোড়া দেখত। অনীশ পিছনে লাগতে ছাড়ত না, বাবার টাকার বাজির আওয়াজটাই শুনলে না, দুঃখ পাবেন কাকাবাবু। পুরোটাই তো লোকসান।

ভয় ভয় মুখেই চোখ পাকাত পারমিতা। রাবণ-পোড়া আলোয় সেই দৃষ্টি হয়ে উঠত ভয়ংকর সুন্দর।

শ্যামপুকুর মাঠে এখন স্কুলবাড়ি উঠে গেছে। কাছাকাছি আর নেড়াপোড়া হয় না। সেই সব পুরনো কথা কি মনে আছে পারমিতার?

মানুষের বয়স বাড়ে, কত কোষ মরে যায়। জন্মায় নতুন কোষ। সেই সব মৃত কোষেই ছিল হয়তো শ্যামপুকুরের স্মৃতি, অনীশকে ভালবাসার তীব্র অভিলাষ।

অনীশের শরীরেও অনেক সেল মরে গেছে। এমন হতেই পারে, কাল পরশু হয়তো পারমিতার সঙ্গে দেখা হল রাস্তায়, খুবই সাবলীল ব্যবহার করবে দু'জন। পারমিতার সঙ্গে যদি বর, মেয়ে থাকে, আলাপও করিয়ে দেবে। অনীশও হেসে বলবে একদিন এসো না বাড়িতে। পারমিতা বলবে, যাব'খন। তারপর যে যার পথ

ধরবে। আসলে মৃত কোষের সঙ্গে তাদের ভালবাসাও মরে গেছে। রয়ে গেছে তেজ, বর্ণহীন জলছাপের মতো কিছু ছবি। .... এইটুকু ভেবে বেশ ভারহীন লাগছে অনীশের। মনে হচ্ছে পারমিতার কলকাতায় ফিরে আসা, তার সুরক্ষিত সংসারে কোনও চিড় ধরাতে পারবে না।

পারমিতাদের বাড়ি ক্রস করে গেল অনীশ। পাশে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে বিল্টু। কী কী কিনবে তার লিস্ট আওড়াচ্ছে। আর একটু এগোলেই বটতলা গলি। শর্টকাটে রবীন্দ্র সরণি পৌঁছানো যায়। কুড়ি বছর আগে ওই গলির ল্যাম্পপোস্টের তলায় মার খাওয়া কুকুরের মতো পড়েছিল অনীশ। গ্লানিমাক্ত দিনটাকে ভুলে যেতে চেয়ে, গত কুড়ি বছর বটতলা গলিতে পা রাখেনি সে। আজ মনে হচ্ছে রাখাই যায়। ছেলে সঙ্গে আছে বলে অস্বস্তি হচ্ছে। ওকে তো আর বাবার অপমানের ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না।

মেঘলা ভোর। অথচ বাতাসে মিশে নেই কোনও বিষণ্ণতা। আছে রহস্যময় গোপন আশ্বাস। অনেকক্ষণ হল ঘুম ভেঙেছে আহেলির। সেই থেকে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে। সল্ট লেকের রাস্তায় এখনও কেউ মর্নিং ওয়াকে বেরয়নি। ঝাঁকড়া গাছগুলোও যেন ঝিমোচ্ছে। কাছাকাছি কোথাও একটা পাখি ডাকছে মিষ্টি সুরে— সি-ই-ই... চি-ইপ চিপ চিপ চিপ। কোন পাখির ডাক কে জানে! শান্তিনিকেতনেও নানান পাখি ডাকে, অচেনা ফুলের গন্ধ ভেসে থাকে বাতাসে। দাদুকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে অচেনা গাছ, ফুল, পাখির নাম। দু'দিন যেতেই ভুলে যায় সব। খানিকটা ইচ্ছে করেই ভোলে সে। কেন মনে রাখতে যাবে? সে তো নিজেই একজন অচেনা মানুষ। নিজের আসল পরিচয় এখনও জানে না আহেলি। তবে জানতে পারবে, শীঘ্রই পারবে জানতে। সে রকমই এক আশ্বাস মিশে আছে বাতাসে।

আজ 'গণদেবতা' ধরে বোলপুর ফিরে যাবে আহেলি। প্রথম বার শান্তিনিকেতনে দোল কাটাবে। বন্ধুরা বার বার আসতে বলে দিয়েছে। বেশ কিছু বন্ধু বৈতালিকে, স্টেজের ফাংশানে থাকবে। ওদের পারফরম্যান্স দেখার আগ্রহ হচ্ছে খুব। এদিকে হয়তো একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে নিজের প্রশ্নের উত্তর পেতে। এতদিন ধরে বুকে পাথর হয়ে বসেছিল প্রশ্নটা।

কাল শোভাবাজার ঘুরে এসে, সন্ধেবেলা মৈনাকের সঙ্গে ফোনে কথা বলে মনে হল, সত্যিটার খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। মৈনাক ছেলেটা বেশ প্রাণখোলা। তবে

অস্থির প্রকৃতির। ও কি শান্ত হয়ে দু'দণ্ড বসে আহেলির প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে? যথেষ্ট সন্দেহ আছে! হঠাৎ বলে কি না আহেলিকে সিনেমায় অভিনয় করাবে। কেন, কলকাতায় কি অ্যাকট্রেস পাওয়া যাচ্ছে না! আচ্ছা পাগল ছেলে।

কাল বিকেলে মাকে না কি বলেছিল আসবে এ বাড়িতে। সন্ধে অব্দি অপেক্ষা করে মা বেরোল মার্কেটিং-এ। আহেলিকে বলে গেল, যদি মৈনাক এসে পড়ে চা-টা দিয়ে গল্প করে একটু আটকে রাখবি। আমি খানিকক্ষণের মধ্যেই এসে যাব।

মৈনাক তো এলই না, ফোনও করল না একটাও! কাল কিছুটা সময় ওকে একলা পাওয়া যেত। অবশ্য আহেলি ঠিক করেছে সামনের উইকএন্ডেই কলকাতায় আসবে। মৈনাকের বাড়িতে ফোন করে মিট করতে বলবে কোনও রেস্টোরেন্ট অথবা অন্য কোথাও। মৈনাকের সঙ্গে তার জরুরি কিছু কথা আছে।

দরজায় ঠক ঠক শব্দ। তারপর বাবার গলা, আহেলি! আহেলি! উঠেছিস মা?

দরজায় ছিটকিনি দেওয়া নেই। ইচ্ছে করলেই ঠেলে ঢুকতে পারে বাবা। ঢুকবে না। শিষ্টাচারের দোহাই দিয়ে মা এই আড়াল তৈরি করে দিয়েছে। ছোটবেলায় খুব বাবার নেওটা ছিল আহেলি। যত বড় হয়েছে, মা এসে দাঁড়িয়েছে মাঝখানে। আচরণটা খুবই খারাপ। পিছনের কারণটাও কদর্য। মাকে এই সব সময় ছোট মনের মানুষ মনে হয়। অথচ অন্য কোনও পরিস্থিতিতে মায়ের মতো উদার মানুষ খুব কম দেখা যায়। মায়ের এই বাতিকগ্রস্থ সতর্কতার আড়ালে লুকিয়ে আছে কঠিন সত্য।

আবার ঠক ঠক। আহেলি বলে, হ্যাঁ, বাবা উঠেছি।

দরজা খুলে যায়। সলিল ঢোকে। মেয়েকে তাড়া দিয়ে বলে, তোর ট্রেন তো সাড়ে আটটায়। তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নে।

নিচ্ছি বাবা, ক'টা বাজে এখন?

সাতটা বেজে গেল। রাস্তায় আবার যদি জ্যাম থাকে।

আহেলি সচকিত বিস্ময়ে বলে, ও মাই গড, সাতটা। আমি তো বাইরের আলো দেখে ভেবেছি ছ'টাও বাজেনি।

বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে, কী বোরিং ওয়েদার যে শুরু হল আজ। বলে, ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল সলিল, আবার ফিরে আসে। মেয়ে জিনিসপত্তর গোছানোয় ব্যস্ত। সলিল সেদিকে তাকিয়ে বলে, মাকে এ বার নিয়ে যেতে পারতিস। তোদের ওখানে বসন্তোৎসব। পারমিতা গানবাজনা ভালবাসে।

বাবার এই ধরনের কথা শুনলে মাথায় রাগ উঠে যায় আহেলির। অদ্ভুত মানুষ। মা চিরকাল বাবাকে দূরে সরিয়ে রেখে দিল, আর উনি স্ত্রীর অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য সব সময় ব্যস্ত। আচ্ছা, একেই কি ভালবাসা বলে? ভালবাসা এতটা একতরফা

হবে! বাবা এখনও যায়নি দেখে আহেলি বলে, মা তো যাবে বলে কিছু বলল না।

হয়তো চাইছিল, তুই বলিস।

এবার সত্যিই রেগে গেল আহেলি। হাতের ম্যাক্সিটা বিছানায় ছুড়ে সরাসরি বাবার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, আচ্ছা, ওখানে কি আমার নিজের বাড়ি যে মাকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে যেতে হবে!

ও ভাবে বলছিস কেন। পারমিতার কথাটাও এক বার ভাব, বেচারা নিজের হাতে গোছানো বাড়ি ছেড়ে এসে নতুন করে এখানে সংসার পাতছে। এ সময় প্রত্যেক মেয়েই একটু ডিপ্রেশনে ভোগে। আউটিং-এ গেলে ভালই লাগত।

তুমিও চলো। বাবাকে অপ্রস্তুত করার জন্যই কথাটা বলে আহেলি। একটুও বিব্রত না হয়ে সলিল বলে, মাথা খারাপ, তোরা বেরোলেই আমি যাব পুরনো আড্ডায়। আগের সব বন্ধুদের খুঁজে বার করতে হবে।

আহেলি বোঝে বাবার সঙ্গে এখন তর্ক করে লাভ নেই। বলে, ঠিক আছে, তুমি যাও, আমি মাকে জিজ্ঞেস করে দেখছি।

জিজ্ঞেস নয়, রাজি করা। বলে, ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সলিল। আহেলি কিটব্যাগে মোটামুটি সব গুছিয়ে নিয়েছে। বাবা যখন বলছে মায়ের কাছে যেতেই হয়।

রান্নাঘরে ব্রেকফাস্ট তৈরি করছিল পারমিতা। আহেলি পিছনে দাঁড়াতেই কেমন করে জানি টের পেল, জিনিসপত্তর ঠিকঠাক নিয়েছিস তো?

হ্যাঁ, মা।

যা, তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢোক, রেডি হয়ে নে। বেলা হল তো অনেক। মন্টু এসেছে নাকি তোর বাবা ড্রাইভ করবে? না করাই ভাল, ওর তো কলকাতার রাস্তায় ড্রাইভিং-এর হ্যাবিট নেই। সব ক'টা কথা আহেলির দিকে না তাকিয়ে বলে গেল পারমিতা। আহেলি বলে, মা, তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

এ বার মুখ ফেরায় পারমিতা। কপালে দুশ্চিন্তার রেখা, কী ব্যাপার, মেয়ের কি ওখানে ফিরতে ইচ্ছে করছে না? কোনও সমস্যা হয়েছে? মনের কথা চেপে রেখে পারমিতা বলে, আমি আবার যেতে যাব কেন?

চলো না, ভাল লাগবে। বসন্তোৎসব আছে।

দুর্বল একটা ছুতো তুলে পারমিতা বলে, কী করে যাব, শুধু তো তোর টিকিট রিজার্ভ হয়েছে।

ফরগেট অ্যাবাউট ট্রেনের টিকিট। আমরা না হয় মন্টুদাকে নিয়ে কার-এ যাব। বাবা ক'দিন ট্যাক্সি হায়ার করে অফিস যাবে।

মেয়ের বুদ্ধিতে পরাস্ত পারমিতা বলে, না রে, আমার ভাল লাগবে না। শুনেছি আজকাল ভীষণ ভিড় হয় ওখানে। অত ক্যায়স আজকাল আর সহ্য হয় না।

কথার সূত্রে আহেলির মনে পড়ে যায়, ছোটবেলা থেকে মায়ের মুখে সে একটা জায়গার গল্প বার বার শুনেছে। দাদু-দিদার সঙ্গে গিয়েছিল মা। মিটার গেজ লাইন। কু ঝিক ঝিক ট্রেন। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মাঠ চিরে, গ্রামের ভেতর দিয়ে চলেছে ট্রেন... কোন একটা স্টেশনে নেমে গরুর গাড়ি। মায়েরা উঠেছিল মাটির দোতলা বাড়িতে, ধানগোলা, পুকুর, কত গাছ-পালা, পাখি... জায়গাটার নাম মা কিছুতেই মনে করতে পারে না। জার্নিটা এত সুন্দর বর্ণনা করে। কল্পনায় অনেক বার সেখানে চলে গেছে আহেলি।

মা এখনও শান্তিনিকেতনে না যাওয়ার অজুহাত দিয়ে যাচ্ছে, ...তা ছাড়া তুই দেখলি তো কাল কলেজ স্ট্রিটে গিয়ে চারটে বই নিয়ে এলাম। ওগুলো না পড়ে আমার শান্তি নেই।

উত্তরে আহেলি বলতেই পারত, সে তুমি যাওয়ার পথে, দাদুর বাড়িতে পড়ে নিতে পারবে। বলে না, কারণ, ওই চারটে বই এখন তিনটে হয়ে গেছে। ভয়ে ভয়ে বাথরুমে ঢোকে আহেলি। বাড়ি থেকে বেরনোর আগে পর্যন্ত মা যেন টের না পায়, একটা বই আহেলি নিয়ে পালাচ্ছে।

বছরের একটা দিন মানুষ তার ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছে যায়। সেদিন মানুষ আত্মহত্যা করতে পারে। কাউকে বাঁচাতে পারে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। পরাক্রান্ত শত্রুকে অনায়াসে পরাজিত করতে পারে। দারোগার চোখের সামনে তাঁর মেয়েকে চুমু খেতে পারে অবলীলায়।

সেই দিনটাকে শনাক্ত করতে হয়, নইলে অজান্তে কখন যেন বয়ে যায় দিনটা।

এ বছরে আজকের দিনটাই যে মৈনাকের সেই দিন হাওড়া স্টেশনে ছ' নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসেই সেটা টের পেয়েছিল মৈনাক। 'গণদেবতা' এক্সপ্রেস যেন মরা কেঁচো, তার গায়ে থিক থিকে পিঁপড়ের মতো মানুষের ভিড়। কলকাতাব সংস্কৃতিমনস্ক নারী-পুরুষরা র‍্যাফ বাহিনীর দাপটে ট্রেনের বন্ধ দরজার সামনে ঘোরাফেরা করছে। রেলপুলিশ বহু চেষ্টা করেও গেটের সামনে লাইন করাতে পারেনি। পরিস্থিতি দেখে মৈনাকের মনের ভিতরে ঘুমিয়ে থাকা জেদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, যে করে হোক আজ জানলার পাশে সিট পেতে হবে। পেতেই হবে। আনরিজার্ভড কামরার সামনে সব থেকে করিতকর্মা বলিষ্ঠ লোকটাকে পছন্দ করে। পিছন পিছন ঘোরা শুরু করেছিল মৈনাক। বোঝাই যাচ্ছিল গেট খোলার সঙ্গে সঙ্গে

এই লোকটাই প্রথমে কামরায় পা রাখবে।

হয়েওছিল তাই, আর প্ল্যান মতো মৈনাক লোকটাকে কামরায় পা দেওয়ার আগে, পড়ে যাচ্ছিলাম ভান করে সজোরে ধাক্কা মারে। সেই ফাঁকে অবশ্য চারটে প্যাসেঞ্জার ঢুকে গেল, তবু কামরায় উঠে জানলার পাশেই জায়গা পেয়েছিল মৈনাক। এখন সেই সিটে বসেই বহাল তবিয়তে চলেছে শান্তিনিকেতনের দিকে।

আজ আর একটা অবশ্যভুল করেনি মৈনাক। অনেক বার এ রকম হয়েছে, তাড়াহুড়ো করে ট্রেনে উঠে ঠিক ভুল জানলার পাশে গিয়ে বসেছে। যেখানে বসলে হাওয়া মুখে এসে পড়বে না। ভুল শোধরানোর মুহূর্তটুকু পায়নি। মৈনাকের পরের লোকটা এসে ঠিক জায়গা দখল করে, মিটিমিটি হেসেছে মৈনাকের দিকে চেয়ে। চোখ সরিয়ে নিয়ে মৈনাক এমন ভাব করে, তার যেন কোনও ইচ্ছেই ছিল না হাওয়া খাওয়ার।

আজ সমস্তটা ঠিকঠাক হলেও, চার পাশে চোখ বুলিয়ে মনটা ভীষণ খচখচ করছিল মৈনাকের, সমস্ত সিট অধিকার করে বসে আছে হাট্টাগোট্টা জোয়ান। অসহায় করুণ দৃষ্টিতে মহিলা, বৃদ্ধরা খুঁজছে সহৃদয় কোনও মানুষ, যে নিজের জায়গাটা ছেড়ে দেবে।

ছেড়ে যদি দিতেই হয়, কোনও রূপসিকেই ছাড়া উচিত। এ বার সেই রূপসি ঠিক করবে, তার সিট এক ঘণ্টা অন্তর কোন বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার সঙ্গে ভাগ করবে। সে রকম কোনও সুন্দরী চোখে পড়ছিল না মৈনাকের। অথচ অপরাধবোধটাও এড়াতে পারছিল না। ট্রেন তখনও ছাড়েনি। পাশের ছেলেগুলোর মধ্যে অপরাধবোধের কোনও উপস্থিতি নেই। এবং ছেলেগুলোর হাবভাব দেখে মনেও হচ্ছিল না বসন্তোৎসবে যাচ্ছে। সিট দখলটা যেন ওদের ভোরবেলার মশকরা।

ট্রেন ছাড়ার দু'মিনিট আগে উপমাটা যে এ ভাবে বাস্তবে রূপ নেবে, ভাবতেই পারেনি মৈনাক, কোথা থেকে এক দঙ্গল কলেজ পড়ুয়া মেয়ে এসে দাঁড়াল মৈনাকদের সিটের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে জায়গা ছেড়ে দিল ছেলের দল। মেয়েগুলোকে বলল, তোরা যা দেরি করলি, ভাবছিলাম আমাদেরই না যেতে হয় বোলপুরে।

চল না বাবা, তোরা। নেকু গলায় বলল একটা মেয়ে।

পাগল! দোলের সময় ওখানে কেউ যায়। পুরো মস্তিটাই মাটি হবে আমাদের। তোরা যা, ক'দিন চুটিয়ে ঢং করে আয়। বলল, বাপের বিগড়ে যাওয়া এক ছেলে। মেয়েগুলোর চোখে তখনও কৃতজ্ঞতা। ট্রেন ছাড়ল। জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে মেয়েগুলো দু'-একজন ছেলের হাত ছুঁল, এবং ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই

মেয়ে ক'জন উছলে পড়ল ঠাট্টার হাসিতে। ওদের ঠাট্টার বিষয় ছিল ওই ছেলেগুলোর বোকা বদান্যতা। যারা ভোররাতে উঠে এই সব মেয়েদের জন্য সিট জোগাড় করেছে।

সমগ্র পুরুষ জাতির একক প্রতিনিধি হয়ে বড় অপমানিত লাগছিল মৈনাকের। তখনই সে ঠিক করে মেয়েগুলোর দিকে এতটুকু মনোযোগ দেবে না। না দিয়ে খোশমেজাজে হাওয়া খাচ্ছিল। একটু পরেই মেয়েগুলো শুরু করল গান। রবীন্দ্রনাথ দিয়ে শুরু করে, চলে গেল বাংলাব্যান্ডে। সেখান থেকে হিন্দি, আবার রবীন্দ্রনাথ। খারাপ গাইছিল না ওরা। দু'-একজনকে তো মনে হল রীতিমতো চর্চা করে। চুপচাপ বসে থাকলে, পাছে ওরা মনে করে মৈনাক গানগুলো শুনছে, তাই নিজের ব্যাগ থেকে ওয়াকম্যান বার করে কানে দিয়েছিল। মেয়েগুলো বোধহয় একটু অপমানিত হয়। খানিক বিরতি দিয়ে তুমুল উৎসাহে উঁচু পর্দায় শুরু করে গান। মৈনাক নির্বিকার চেয়ে থাকে জানলার বাইরে। মুখোমুখি সিটে বসে থাকা মেয়েটা একটু ঝুঁকে কিছু একটা বলে।

ঝুঁকে কথা বলাটা যে তার অমোঘ অস্ত্র, মেয়েটা ভাল করেই জানে। ওই ভঙ্গির ফলে কৃপণ পোশাক উপচে প্রকাশিত হয় ধবল পর্বত যুগলের অনেকটা। মৈনাক কিছুতেই এ সবে ভুলবে না। সিনেমা লাইনে থাকার ফলে খোলামেলা পোশাক তার চোখে সয়ে গেছে। কান থেকে হেডফোন নামিয়ে মৈনাক জানতে চেয়েছিল, কিছু বলছেন?

আপনার কি আমাদের গান ভাল লাগছে না?

এ রকম স্পষ্ট জিজ্ঞাসায় সামান্য অপ্রস্তুত হলেও, সামলে নিয়ে মৈনাক বলেছিল, না তো, বেশ ভালই লাগছে। ক্যাসেটের মিউজিকের সঙ্গে মিশিয়ে শুনছি তো, টেস্ট খুলে গেছে।

দেখি, দেখি কী শুনছেন। বলে, মেয়েটি প্রায় ছিনিয়ে নিল ওয়াকম্যানটা। কানে দিয়ে বলল, উরে সাটা, হরিপ্রসাদের বাঁশি রে...

সেই ওয়াকম্যানটা এখনও ফেরত পায়নি মৈনাক। মেয়েগুলোর কানেকানে ঘুরছে। ওদেরকে ইতিমধ্যে দু'বার সাপ্লাই দিতে হয়েছে অন্য ক্যাসেট। কোনও একজন বিখ্যাত বলেছিলেন, মেয়েরা একবার যদি কিছু কেড়ে নেয়, ফেরত দিলে জানতে হবে প্রাণটি শুষে নিয়েই দিয়েছে। সত্যিই কি কেউ বলেছিলেন, না কি এইমাত্র বানাল মৈনাক, ঠিক ঠাহর করতে পারে না। আসলে তার ভাবনাচিন্তাগুলো অনেক সময়ই মহাপুরুষদের বাণীর পাশ ঘেঁষে যায়।

অতএব মৈনাক এখন আসন্ন শোক ভুলতে অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু

কিছুতেই পারে না। দিদি কত শখ করে ওয়াকম্যানটা জন্মদিনে দিয়েছিল, ও যদি জানতে পারে জিনিসটার অন্ত্যেষ্টি এই ভাবে হয়েছে, ভীষণ দুঃখ পাবে। মৈনাকের অবস্থা অনেকটা শিয়ালের গর্ত থেকে পালিয়ে বাঘের গুহায় ঢুকে পড়ার মতন। রাহুলবাবুর গাড়ি এড়িয়ে সে ট্রেনপথ বেছে নিয়েছিল শান্তিতে যাবে বলে, যাত্রা শুভ হল না।

কাল রাহুলবাবু চলে যাওয়ার ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যেই ফোন করেছিলেন রানাদা। বললেন, কী রে, তুই তো দেখছি অচিরেই আমাকে ছাড়িয়ে যাবি। এর মধ্যেই প্রোডিউসারের থেকে চেক বার করে নিয়েছিস!

মৈনাক আমতা আমতা করে বলতে যাচ্ছিল, না, আসলে গল্পটা বন্ধুর থেকে...

ও সব ঢপ আমাকে দিস না। তুই ভাল করেই জানতিস গল্প শুনেই আমি ধরতে পারব এটা তোর স্টোরিলাইন। তোর আগাপাস্তালা আমার জানা। তাই রাহুলবাবুকে বারণ করে দিয়েছিস গল্পটা আমাকে বলতে। কিন্তু তিনি এত এক্সসাইটেড হয়ে পড়েছেন গল্প শুনে, চেপে রাখতে পারলেন না। যাই হোক, আইডিয়া ভাল। শেষটা কী করবি তাড়াতাড়ি ভাব। আর হ্যাঁ, শুনলাম তুই না কি লোকেশন দেখতে যাচ্ছিস? অথচ ডিরেক্টর কিছু জানে না!

আর কোনও মিথ্যের আশ্রয় না নিয়ে মৈনাক বলেছিল, না, আসলে শেষটা নিয়ে একটু ঝামেলায় পড়ে গেছি, তাই ভাবছিলাম আউটিং-এ যদি মাথাটা খোলে।

নট এ ব্যাড আইডিয়া। কিন্তু রাহুলবাবুও যে তোর সঙ্গে যাবে বলছে, মাথা ফাঁকা পাবি? সে তো সব সময় তোর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে গল্পের আশায়।

ধুর, ওঁকে নেব না। একাই যাব।

যাবি কোথায়?

মৈনাকের মুখ থেকে ঝট করে বেরিয়ে যায়, 'বোলপুর'। কেন বেরিয়েছিল আবিষ্কার করে ফোন শেষ হওয়ার পর। বোলপুরের নাম শুনে রানাদাও উৎসাহী হলেন। বললেন, চল, আমিও যাব। পরশু তো ওখানে বসন্তোৎসব। অনেক দিন যাওয়া হয়নি। আমারও একটু ব্রেক দরকার। লিটল ব্রেক। মাথাটা একদম জ্যাম হয়ে আছে।

উত্তরে মৈনাক তো বলতে পারে না, আপনার মাথাটা হালকা হলেও, আমার মাথাটা আপনি জ্যাম করে ছাড়বেন। রিসিভার কানে রেখে চুপ করে ছিল মৈনাক। রানাদা বোধহয় ওর মনের কথা পড়তে পারলেন। তাই বলে উঠলেন, তোর কোনও চিন্তা নেই। তুই তোর মতো ঘুরবি, আমি রাহুলবাবু একসঙ্গে থাকব।

আবার কেন ওঁকে নিচ্ছেন! বলে, মৃদু আপত্তি জানিয়েছিল মৈনাক। রানাদা

বলেন, কেন নিচ্ছি, না বোঝার তো কিছু নেই। লোহা এখন গরম আছে, মাঝেমাঝে পিটিয়ে নিজেদের পছন্দ মতো শেপে নিয়ে আসতে হবে। তা ছাড়া ট্রিপটা বিলাসবহুলই হবে আশা করি। তুই এক কাজ কর, সকাল সাতটার সময় শোভাবাজার মেট্রোর সামনে দাঁড়িয়ে থাক, আমরা তুলে নেব।

ঠিক আছে। বলে রিসিভার রাখতে যাচ্ছিল মৈনাক। রানাদা বলে ওঠেন, এই দাঁড়া, কাউকে কিছু বলিসনি তো, প্রোডিউসার পেয়েছি, গল্প মোটামুটি রেডি...

না বলিনি।

ভেরি গুড। একদম চুপচাপ থাকবি। করওর কাছে কোনও কোয়ারিতেও যাবি না। কে যে কখন কাঠি করে দেবে, কোনও ঠিক নেই। কাল তা হলে 'কল টাইম' সকাল সাতটায়। গুড নাইট।

বেড়াতে যাওয়ার প্রসঙ্গে 'কল টাইম' কথাটা ব্যবহার করতে দেখে বোঝা গিয়েছিল, রানাদা মুডে আছেন। ধরেই নিয়েছেন ফিল্মটা হচ্ছেই। এ দিকে মৈনাকের তো চিন্তার শেষ নেই, কীভাবে স্টোরিটা এন্ড করবে! তখনই মাথায় প্রশ্নটা এসেছিল, আমি কেন শান্তিনিকেতন জায়গাটা বাছলাম? অবচেতন থেকে উত্তরটা পেতে দেরি হয়নি, রাহুলবাবু থাকাকালীন আহেলির ফোন এসেছিল, ও বলেছে কাল বোলপুরে ফিরে যাবে। আবার এ কথাও বলেছে, মৈনাকের সঙ্গে তার না কি কিছু কথা আছে। ফলে মৈনাকের অবচেতন মন পছন্দ করেছে শান্তিনিকেতন। মেয়েটা তাকে কি একটু আকর্ষণ করছে? সম্ভাবনার কথা ভেবে সতর্ক হয়েছিল মৈনাক, যদি পারমিতাদি টের পায় মেয়ের সামনেই হয়তো মৈনাকের কান মুলে দেবে।

মিনিট পনেরো হয়নি রানাদা ফোন করছেন, মৈনাককে অবাক করে আর একটা ফোন এসেছিল। ইলাদির ফোন, হ্যাঁরে মৈনাক, শুনলাম তোরা না কি নতুন ছবিতে যাচ্ছিস?

তোমাকে কে বলল? নির্বিকার ভাবে জানতে চায় মৈনাক।

ভাসে রে, এ সব কথা ইন্ডাস্ট্রির হাওয়ায় ভাসে। শুধু শোনার কান থাকা চাই।

আমি কিন্তু কিছু শুনিনি। তুমি বোধহয় ভুল ইনফর্মড হয়েছ। বলে, সরাসরি খবরটা উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল মৈনাক। ইলাদির তথ্য সূত্র কত স্ট্রং বোঝা গেল পরের কথায়, শোন, আমাকে লুকিয়ে লাভ হবে না। আমি এও জানি, স্টোরির ওয়ান অফ দ্য লিড রোলস আমার এজ-এর। সো রোলটা যেন আমার জন্যে থাকে। নইলে জানিস তো, তোকে কী করব!

ইলাদি ফোন রাখার পর মৈনাক ভেবে পায় না কে ইলাদিকে খবরটা দিয়েছে?

রানাদা একটু আগে বলল, কাউকে কিছু বলিস না। আর এর মধ্যেই খবর রটে গেল! রানাদাই মনে হয় প্রোডাকশনের কারওর সঙ্গে আকার ইঙ্গিতে আলোচনা করতে গেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সেই ব্যক্তিই। এমনিতে ইলাদির অভিনয় ক্ষমতাকে খুবই মান্য করে মৈনাক। কিন্তু এ ভাবে রোল চেয়ে নিজেকে কেন যে ছোট করে, শ্রদ্ধাটাই কমে যায়। আর সব থেকে মুশকিল হচ্ছে ইলাদিকে এড়ানো। মহিলা যে কখন কী করবে, কোনও ঠিক নেই। সেই যে একবার বাড়িতে চলে এল বিচ্ছিরি ড্রেস করে। মা তো খেপে আগুন। আর এক দিন খুব বিপদে ফেলেছিল মৈনাককে, সেই ঘটনাটা মনে করিয়ে দিয়ে ফোনে হুমকিটা দিল। হয়েছিল কী, রানাদার সিরিয়ালে একটা গুরুত্বপূর্ণ রোল করছিল ইলাদি। তখন ইলাদির টাইট সিডিউল চলছে, রানাদার জন্য একটা নাইট শিফটে রাজি হল। সেদিন ইলাদি দিনেরবেলায় দুটো খেপ মেরেছে, মাঝে বোধহয় কোথাও একটু ড্রিঙ্ক করে থাকবে। মৈনাকদের শট দিতে গিয়ে বার বার এনজি হচ্ছিল। কখনও এক্সপ্রেশন ঠিক হচ্ছে না, কখনও বা কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। ক্রমে রানাদার মেজাজের পর্দা চড়ছে। এর মধ্যে ইলাদি আবার বলে বসল, রানাদা, তুমি না ফিচারের মতো অ্যাক্টিং চাইছ। সিরিয়ালে এত খুঁত খুঁতানির কোনও মানে হয় না।

বার্স্ট করল রানাদা, কেন, সিরিয়াল কি তোমাকে পয়সা দিচ্ছে না? তা হলে কেন তুমি অনেস্টলি কাজ করবে না? মাল খেয়ে মাতলামি করার জন্য তোমাকে ডাকা হয়নি।

ব্যস ইলাদি কাঁদতে কাঁদতে ছুটল মেকআপ রুমে। সেদিন ফ্লোরে প্রোডিউসার অমিত মুখার্জি ছিলেন, করুণ চোখে তাকালেন মৈনাকের দিকে।

শুটিং ক্যানসেল হলে অনেক টাকা লস হবে।

অগত্যা মৈনাককেই মেকআপ রুমে যেতে হয়েছিল। অন্য কাউকে অবশ্য ইলাদি অ্যালাউ করত না।

প্রায়ান্ধকার ঘর। সোফার হাতলে মাথা রেখে কাঁদছে ইলাদি। মৈনাক মাথার কাছে গিয়ে ডেকেছিল, ইলাদি প্লিজ, কন্ট্রোল ইওরসেল্ফ। এত সেন্টিমেন্টাল হলে চলে না। তুমি তো জানো রানাদা একটু টেম্পারামেন্টাল। তা ছাড়া সবাই রাত জেগে কাজ করছে, সামান্য টেনশন তো হবেই ফ্লোরে।

বাচ্চা মেয়ের মতো চোখ মুছে, নাক টেনে ইলাদি বলেছিল, তোরা তো সবাই রাতটুকুই জাগছিস। আমি যে দুটো ডে-শিফট টানলাম। এর মধ্যে বাড়ি থেকে বার বার ফোন আসছে, ছোট মেয়েটা আজ স্কুলে যায়নি। জ্বর এসেছে। সন্ধের পর নিশ্চয়ই বাড়ি ফিরেছে রজত, এখন অব্দি একটাও ফোন করেনি। লক্ষ্মীর মাকেও

বোধহয় বারণ করে দিয়েছে, ফোনে মেয়ের খবর জানাতে। সকালে বাড়ি গিয়ে দেখব, আমার স্বামী দেবতাটি মুখ গোমড়া করে বসে আছে। যেন আমিই মেয়ের জ্বর আসার জন্য দায়ী। কত বার বলেছি, ঠিক আছে, আমি তা হলে অ্যাক্টিং ছেড়ে দিচ্ছি। তখন আবার হাতেপায়ে ধরে। এক ধাক্কায় অনেকটা আরাম কমে যাবে তো... বলে, একটু থেমেছিল ইলাদি। তারপর হঠাৎ মৈনাকের কাঁধে দুটো হাত আঁকশির মতো ঝুলিয়ে মহানায়িকার স্টাইলে বলে, আমাকে কেউ ভালবাসে না মৈনাক। শিল্পী থেকে আমি কখন যেন যন্ত্র হয়ে গেছি। টাকা কামানোর যন্ত্র। তোদের ডিরেক্টরও তাই মনে করে। পয়সা দিচ্ছে মানেই আমার সেরাটা দিতে হবে। তা কি সব সময় হয়! যন্ত্রও নিয়মিত যত্ন, পরিচর্যা পায়। আর আমি... এত অব্দি ঠিকই ছিল। ডায়লগগুলো মনে হচ্ছিল মাঝারি মানের স্ক্রিপ্ট রাইটারের লেখা। তারপরই আর্টিস্ট নিজের মুখে নিজেই কথা বসাতে শুরু করল। বুকে লেপটে গিয়ে ইলাদি বলেছিল, আমাকে একটু ভালবাসবি মৈনাক? অনেক দিন কেউ বাসেনি। একটু ভালবাস, দেখবি আমি আবার কাজে ফিরে যেতে পারব।

কে যে কী অভিপ্রায়ে বিশেষ ধরনের মদটা খাইয়েছিল ইলাদিকে কে জানে! তবে মদের কাজটা দেরি করে শুরু হওয়াতে লোকটা খুবই ঠকে গেছে। ইলাদি তৃষ্ণার্তের মতো ঠোঁট তুলে ধরেছিল, একটা চুমুর জন্য আকুল প্রত্যাশা। ইউনিটের এতগুলো লোকের পেটের কথা ভেবে আলগোছে একটা চুমু খেয়েছিল মৈনাক। পর মুহূর্তেই টের পায় মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে, গরম বালির মতো চুমুটা নিমেষে শুষে নিয়ে ইলাদি সুইচ টেপার মতো পটাপট নিজের পোশাক খুলতে থাকে।

বাহুপাশ আলগা হওয়াতে পালিয়ে বাঁচে মৈনাক। ইতিমধ্যেই ঘরের চুঁইয়ে আসা আলোতে দেখে নিয়েছে ইলাদির করুণ শঙ্খের মতো দুই স্তন। যার গায়ে সমুদ্র শ্যাওলার দাগ। ইলাদির শরীরে কালো সাগরের গর্জন।

দৃশ্যটা ভোলেনি মৈনাক। যৌনচেতনার চোরা পথে সে দৃশ্য যখন মৈনাকের মানসপটে ভেসে ওঠে, প্রবল অনীহা তৈরি হয় নারীশরীরের প্রতি। এই সব কারণেই বুঝি মৈনাকের সৌন্দর্যবোধ কিছুটা ভোঁতা হয়ে গেছে।

সে রাতে আর শুটিং হয়নি। রানাদা 'প্যাক আপ' বলার পর প্রতিজ্ঞা করে ইলাদিকে আর কোনও দিন কোথাও কাস্টিং করবে না। ইলাদি ছাড়ার পাত্রী নয়, মৈনাকদের ইউনিটকে ভীষণ পছন্দ করে। কখন কী কাজ হতে যাচ্ছে, সর্বদা খবর রাখে। কালকের ফোনটা তারই প্রমাণ। তখনকার মতো ইলাদিকে উড়িয়ে দিলেও সক্কালবেলায় খুব হেনস্তা হতে হয়েছে। রানাদার কথা অনুযায়ী শোভাবাজার

মেট্রোর সামনে পিঠে ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল মৈনাক। রাহুলবাবুর গাড়িও আসে টাইম মতো। আরোহীদের মধ্যে ইলাদিকে দেখে প্রচণ্ড রাগ হয়ে যায় মৈনাকের। পিছনের সিটে রানাদার পাশে বসে হাসছে, 'কেমন দিলাম' মার্কা হাসি। রানাদাও হাসছিলেন বোকাবোকা। বললেন, কী হল, উঠে আয়!

তক্ষুনি একটা বুদ্ধি আসে মৈনাকের মাথায়। বলে, আমি ট্রেনে যাচ্ছি। আরও কয়েকজন বন্ধু যাচ্ছে। আপনারা এগোন, ওখানে গিয়ে দেখা হবে।

দু'-এক বার জোরাজুরি করে রানাদা রাজি হলেও, রাহুলবাবু কিছুতেই ছাড়তে বাজি হচ্ছিলেন না। অনেক বুঝিয়ে নিস্তার পেয়েছে মৈনাক। তারপর ট্যাক্সি ধরে সোজা হাওড়া স্টেশন।

স্যান্ট্রোয় চাপাচাপি করে যাওয়ার থেকে ট্রেনেই ভাল যাচ্ছে মৈনাক। ওয়েদারও বেশ ঠান্ডা। হু হু করে হাওয়া এসে ঘেঁটে দিচ্ছে মৈনাকের চুল। হাওয়ায় মাঠ, ঘাট, গাছপালা, নদী, পুকুরের গন্ধ। দূরে দূরে গ্রাম রেখা। এই মুহূর্তে অবশ্য ট্রেনটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। কোন স্টেশন কে জানে! মৈনাকের সাইডে প্ল্যাটফর্ম পড়েনি, একটু দূরে রেলের ফেনশিং।

জানলা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে কামরার ভেতরে চোখ বোলায় মৈনাক, কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। বোলপুর আসার আগেই এত লোক নেমে গেল না কি। সামনের মেয়েগুলো অবশ্য আছে। তবে তাদের মুখে আগের উচ্ছ্বাসের বদলে কীসের যেন আশঙ্কা।

ওদের সিটের শেষ মেয়েটার হাতে মৈনাকের ওয়াকম্যান, হেডফোনটা গলায় ঝুলছে। মুখোমুখি বসা মেয়েটিকে মৈনাক জিজ্ঞেস করে, কোন স্টেশন এটা?

থমথমে মুখে মেয়েটি বলে, মেমারি।

অনেক প্যাসেঞ্জার নেমে গেছে দেখছি!

নামেনি, ট্রেন ছাড়লেই আবার উঠে আসবে। আধ ঘণ্টা হয়ে গেল দাঁড়িয়ে আছে তো। ঠেস মারা সুরে কথাটা বলে মেয়েটি। ভাবটা এমন, আপনি কি ঘুমোচ্ছিলেন?

তাড়াতাড়ি সিট ছেড়ে উঠে পড়ে মৈনাক, দেখতে হবে তো ব্যাপারটা কী হল? এতক্ষণ কোনও স্টেশনে দাঁড়ানোর কথা নয়, এক্সপ্রেস ট্রেন। পিঠব্যাগটা নিজের জায়গায় রেখে এগিয়ে যায় মৈনাক।

ট্রেন থেকে নেমে দেখে, প্ল্যাটফর্ম প্যাসেঞ্জারে ছয়লাপ। অনেকেই অধৈর্য হয়ে নেমে পড়েছে। এদিক ওদিক তাকাতে ইন্ডাস্ট্রির দু'-একজন চেনা চোখে পড়ল। তাদের মধ্যে অভিনেতা, অভিনেত্রীও আছে। একই সঙ্গে চোখে পড়ে স্টেশন মাস্টারের অফিসে উপচে পড়ছে ভিড়। অফিসটা প্ল্যাটফর্মের ওপরেই। পায়ে পায়ে

স্টেশন মাস্টারের ঘরের দিকে এগোয় মৈনাক।

অফিসে ঢুকে দেখে সাংঘাতিক কাণ্ড, যাত্রীগণ স্টেশন মাস্টারের ঘাড়ে, টেবিলে পাশের চেয়ারে উঠে পড়েছে। বক্তব্য হচ্ছে, এক্ষুনি কন্ট্রোলে ফোন করুন, ইয়ার্কি না কি চল্লিশ মিনিট ধরে এক্সপ্রেস ট্রেন সাইড করে রেখেছেন...

মাস্টারমশাই প্যাসেঞ্জারের নির্দেশ মতো মান্ধাতা আমলের ফোন তুলে কাকে যেন বলেন, কিছু করুন, হাজার দু'য়েক প্যাসেঞ্জার আমাকে ঘিরে রেখেছে...

সংখ্যাটায় বেশ বাড়াবাড়ি করলেন মাস্টারমশাই। তা করুন, এতে যদি ট্রেনটা তাড়াতাড়ি ছাড়ে মন্দ কী।

মৈনাককে ধাক্কা মেরে একজন প্রায় হুমড়ি খেয়ে স্টেশন মাস্টারের সামনে গিয়ে পড়ল, হাতে ডিজিটাল মুভি ক্যামেরা। যাচ্ছিল বসন্তোৎসবের ছবি তুলতে। এই সিচুয়েশনটা ফাউ পাওয়া গেল।

এরই মধ্যে বিক্ষোভ অবস্থানকে একটু অন্য মাত্রা দিতে কে যেন বলে উঠল, ভাঙ, লাইট-ফ্যান সব ভেঙে ফেল।

ঠাকুর্দার আমলের ফ্যানের দিকে চোখ যায় মৈনাকের, কেমন যেন মায়া হয়। বুড়ো বয়সে এ কী হুজ্জোতে পড়লেন উনি। বেশ তো ঘটঘট করে গ্রামের স্টেশনে দিন কেটে যাচ্ছিল। ...পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে। বাড়ছে ভিড়। ভিড়ের মধ্যে বেশ কিছু অবাঙালির হম্বিতম্বি শুনে বোঝা গেল, এঁরাও যাচ্ছেন শান্তিনিকেতনে। বিকেলের ফাংশন মিস করতে চান না। মৈনাক বসন্তোৎসবে আগেও এসেছে, তখন এত অবাঙালি চোখে পড়েনি, বোঝাই যাচ্ছে শান্তিনিকেতনে বীভৎস ভিড় হবে। এই সব মারমুখী, অসহিষ্ণু বাঙালি, অবাঙালি রবীন্দ্রানুরাগীরা ওখানে গিয়ে কেমন থাকবে কে জানে! তবে এরাই যে আগের জন্মে রবীন্দ্রনাথের অন্তিম যাত্রায় গণ্ডগোল পাকিয়েছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এদের কি কোনও জন্মেই শান্তি হবে না!

স্টেশন মাস্টার এখনও কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারেননি, ট্রেন কখন ছাড়বে। অপর আপলাইন দিয়ে দুটো মেল ট্রেন চলে যাওয়ার পর রব উঠল, চলো, সবাই লাইনে বসে পড়ি।

অর্থাৎ রেল অবরোধ। কালকের কাগজে ভেতরের পাতায় খবরটা ছাপা হবে। মৈনাক বুঝতেই পারে ঘটনা যে দিকে গড়াচ্ছে যাত্রা নির্বিঘ্ন হবে না। এত ঝামেলা সয়ে বেড়াতে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। পাবলিক লাইনে গুছিয়ে বসার আসার আগেই ডাউন বর্ধমান লোকাল ধরে কলকাতা ফিরতে হবে।

অফিস ঘর থেকে উদাস মুখে বেরিয়ে আসছিল মৈনাক, দরজার পাশে যাকে

জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে. কষ্ট-কল্পনাতেও তাকে এখানে আশা করেনি. আহেলি! পরনে বাঁশপাতা রঙের খাটো কুর্তা আর পাজামা। অল্প কোঁকড়ানো ঘন কালো চুল গার্ডারে বাঁধা। ছোট সাইড ব্যাগটা বুকের কাছে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মৈনাককে দেখে অবাক হওয়ার বদলে অসহায় দৃষ্টি ফুটে উঠল চোখে। ওর চোখ দুটোর মধ্যে একটু যেন ছলছলে ভাবও লক্ষ করল মৈনাক। আহেলি কিছু বলছে না দেখে, মৈনাকই প্রথাগত শুরু করে, তুমি এখানে, মানে এই ট্রেনে, কী ব্যাপার?

ট্রেন কখন ছাড়বে? আহেলির গলায় কান্নার ছোঁয়া। বোঝাই যাচ্ছে গোলমাল দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গেছে। দিল্লিতে মানুষ হয়েছে, এ ধরনের অভিজ্ঞতা ওর সম্ভবত প্রথম। তবে যে প্রশ্নটা করেছে, উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন। উত্তরের জন্য অবরোধে সামিল হতে হবে। সান্ত্বনার সুরে মৈনাক বলে, এখনই ছেড়ে যাবে। এ লাইনে হামেশাই এ রকম হয়।

মৈনাককে দেখে একটু বোধহয় আশ্বস্ত হয়েছে আহেলি। বলে, আপনি কোথায় চললেন?

কেন বসন্তোৎসবে। বেশিরভাগ প্যাসেঞ্জার যে উদ্দেশ্যে যাচ্ছে।

মাথা নিচু করে হাঁটতে থাকে আহেলি। একটু সময় নিয়ে বলে, কাল তো ফোনে বললেন না, বসন্তোৎসবে যাবেন। কখন ঠিক হল?

একটু যেন অপ্রস্তুত বোধ করে মৈনাক। আহেলি কি কিছু মিন করল। সামাল দিতে মৈনাক বলে, কাল রাতে বন্ধুরা মিলে হঠাৎ প্ল্যান করলাম...

আপনার বন্ধুরা কোথায়?

ওরা কার-এ গেছে। বলার পর, কথাটা নিজের কানেই ভীষণ খটকা হয়ে বাজে। প্রসঙ্গ ঘোরাতে মৈনাক জিজ্ঞেস করে, তুমি কোন কমপার্টমেন্টে উঠেছ?

আঙুল তুলে এসি কামরা দেখায় আহেলি। বলে, চলুন না, বাকিটা আমার সঙ্গে যাবেন।

তা কী করে সম্ভব, ওটা রিজার্ভ কমপার্টমেন্ট।

রিজার্ভ না আরও কিছু। কত লোক এমনি উঠে পড়েছে।

তবু মৈনাক যাবে না। এই মেয়েটার সামনে এসে যদি চেকার তাকে অপমান করে, সহ্য করতে পারবে না কিছুতেই। না বলার আরও অন্য যুক্তি খুঁজতে থাকে মৈনাক। ভাবনার মাঝে পিছন থেকে দু'বার কাঁধে হাত পড়ে। শ্যামলদা আর অলীক। দু'জনেই টিভির স্টার। 'ভাল আছিস, মৈনাক'। বলে সৌজন্য করে। হেসে ঘাড় হেলায় মৌনাক। উলটো দিক থেকে রিমা আর পৌষালি অলস হেঁটে আসছে। মৈনাকের থেকে দেরি করে হুঁশ হয়েছে, থেমে আছে ট্রেন। দু'জনের ড্রেস দেখলে

মনে হবে, প্লেন থেকে নামল। থ্রি কোয়ার্টার জিনস, স্লিভলেস গেঞ্জি। ইদানীং ফিল্ম টিভি একসঙ্গে কাঁপাচ্ছে দু'জনে। মৈনাকের সঙ্গে চোখাচোখি হতে, হাই, হ্যালে হল। ওরা জানতে চায়, রানাদা আছে না কি সঙ্গে? অর্থাৎ খেজুর করবে। মৈনাব মাথা নাড়ে।

চেনাজানারা হালকা হতে আহেলি জিজ্ঞেস করে, এরা কারা?

প্রসঙ্গ ঘুরে গেছে বুঝে আশ্বস্ত হয় মৈনাক। বলে, গেস করো।

মনে হচ্ছে সিনেমা, টিভির অ্যাক্টর, অ্যাকট্রেস। আসলে বেশি দিন হয়নি তে বেঙ্গলে এসেছি, টিভিও খুব একটা দেখা হয় না।

নাও ইউ মাস্ট বি কনভিন্সড। তোমাকে ফিল্মে অ্যাক্টিং-এর অফারটা আমি বেসলেস ভাবে দিইনি।

বিশ্বাস আমার তখনও হয়েছিল। বাট আই ফেলড্ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াই ইউ চোজ মি?

বিকজ ইউ আর দ্য রাইট চয়েজ ফর দিস রোল।

হোয়াটস দ্য রোল লাইক?

স্টেশনে দাঁড়িয়ে এ ভাবে বলা যাবে না। শান্তিনিকেতনে গিয়ে বলব। আর তোমারও যেন আমার থেকে কী একটা জানার আছে!

কথাটা মনে করিয়ে দিতেই একটু যেন উন্মনা হয়ে যায় আহেলি। অন্য দিকে দৃষ্টি ভাসিয়ে কী যেন ভাবে। এই অবসরে আহেলির রূপ বর্ণনার একটা মানানসই উপমা খুঁজতে থাকে মৈনাক। অনেক পাখি, ফুল নদীর নাম মনে আসছে, কিন্তু সবই যেন আহেলির রূপের কাছে জোলো। আগের বার দেখা হয়েছিল আলো অন্ধকারের মায়ায়। আজ দিনের আলোয় ওর রূপ প্রকৃতির মতোই সাবলীল। ছিপছিপে গড়ন পা, হাত, আঙুল, চোখ, নাক ভীষণ নিখুঁত, চোখাচোখা। সব যেন কোনও কারিগরের নিপুণ ক্যালকুলেশনে গড়া। পাছে সৃষ্টিটি অঙ্কের মতো নীরস লাগে, তাই অঢেল পেলবতা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে শরীরে। খাঁজকাটা গড়নে পেলবতা মিশে শরীর হয়েছে ধারালো মসৃণ। পরনে সবুজ টপটা যেন কোনও পাখি বা কিছুর অনুষঙ্গ মনে করিয়ে দিতে চাইছে। কোন পাখি?

আপনি ওখানে গিয়ে কোথায় উঠছেন?

আহেলির প্রশ্নে ঘোর ভাঙে। প্রথমটায় খুব স্বাভাবিক ভাবে উত্তর দিতে যাচ্ছিল মৈনাক। তারপরই খেয়াল পড়ে। আরেঃ এটা তো মেজর প্রশ্ন! থাকবে কোথায় মৈনাক? রাহুলবাবুরা কোথায় উঠছেন, তা নিয়ে কোনও কথা হয়নি। এত ভিড়ে কোনও হোটেলে জায়গা পাওয়া যাবে না। তা হলে কি গাছতলা? আহেলি হয়তে

একটা বন্দোবস্ত করতে পারবে, কিন্তু সে কথা তুলে নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করতে চায় না মৈনাক। বলে, সম্ভবত পূর্বপল্লীর গেস্টহাউসে। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর জানতে পারব।

ঠিক আছে, আমি দেখা করে নেব। আজ গৌর প্রাঙ্গণে আসছেন তো? জানতে চায় আহেলি।

অবশ্যই। বলার পর মৈনাক লক্ষ করে প্যাসেঞ্জাররা ট্রেনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ইঞ্জিনের দিকে তাকাতেই দেখে, সিগনাল সবুজ। আহেলিকে বলে, গাড়ি ছাড়বে। তুমি তোমার কমপার্টমেন্টে ওঠো। বোলপুর প্ল্যাটফর্মে দেখা হবে।

দেখা হল না। বোলপুর স্টেশনে নেমে, প্ল্যাটফর্মের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত চিরুনি তল্লাসি চালিয়েও পাওয়া গেল না আহেলিকে। শান্তিনিকেতনে থাকতে আর বোধহয় দেখাও হবে না। হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে কোথায় পাবে আহেলিকে! মৈনাকের আপশোশ হয়, আহেলিকে শান্তিনিকেতনের নির্দিষ্ট একটা জায়গায় দাঁড়াতে বলা উচিত ছিল।

গণদেবতা থেকে নামা যাত্রীরা স্টেশনের গেট পেরিয়ে যাচ্ছে, শেষের দিকে মৈনাক, এখনও চোখ বোলাচ্ছে এদিক ওদিক। দেখা হয়ে গেল সেই মেয়ের দলের সঙ্গে। একটি মেয়ে হুল ফোটানো ভঙ্গিতে জানতে চাইল, কী হল, হারিয়ে ফেললেন!

বাকি মেয়েগুলো হাসতে হাসতে নুয়ে গেল। চোখ সরিয়ে নেয় মৈনাক। মেয়েগুলো সুযোগ বুঝে শোধ নিচ্ছে। মেমারী থেকে গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েগুলো মৈনাককে কৌতূহল ভরে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি টিভি লাইনে কিছু করেন?

না।

সব আর্টিস্ট তো আপনাকে চেনে দেখলাম।

আমি সিনেমায় কাজ করি।

ওঃ তাই না কি। কী ধরনের কাজ?

ডিরেকশনে আসিস্ট করি।

এ মা, সরি, আপনার সঙ্গে আমরা তখন থেকে কী সব বিহেভ করেছি।

ইটস অল রাইট।

আচ্ছা, ওই মেয়েটি কে, সবুজ টপ পরে, আপনার সঙ্গে কথা বলছিল। ওকে তো টিভি, সিনেমায় দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

হ্যাঁ, ও প্রথম অভিনয় করছে আমাদের ছবিতেই। আমারই আবিষ্কার মেয়েটি। বেশ ভাল না?

র‍্যালাটা নেওয়ার সুবাদে একটু পরেই অক্ষত অবস্থায় ওয়াকম্যানটা ফেরত পেয়েছিল মৈনাক। এখন অহংকারে কাদা ছুঁড়ে চলে গেল মেয়েবাহিনী। সব শেষে মৈনাকই বেরোয় গেট থেকে। ওর জন্য কোনও চেকারও দাঁড়িয়ে ছিল না।

একজন কিন্তু ছিলেন অপেক্ষায়। একটু দূর থেকে চেঁচাচ্ছেন, মৈনাক, এ দিকে আসুন। এখানে।

রাহুলবাবু। ধড়ে প্রাণ আসে মৈনাকের। যাক, থাকা নিয়ে আর কোনও চিন্তা নেই। গেটের সামনে এখনও ভিড়।

যাত্রীরা রিকশা, অটোওলাদের সঙ্গে দরাদরি করছে। লোকজন কাটিয়ে মৈনাক রাহুলবাবুর সামনে যায়। রাহুলবাবু বলেন, গাড়ি ওপাশে পার্ক করেছি। চলুন।

গাড়ির উদ্দেশ্যে হাঁটতে হাঁটতে রাহুলবাবু বলে চলেন, আমি তো চিন্তায় পড়ে গেছি। আপনি তো জানেন না, আমরা কোথায় উঠব। হিসেব মতো ট্রেন আগে চলে আসার কথা। ভাগ্যিস লেট করল।

গাড়ির কাছে পৌঁছতে দেখা গেল, রানাদা, ইলাদি নেই। মৈনাক জিজ্ঞেস করল, ওরা কোথায়? রাহুলবাবু বললেন, ওঁদের হোটেলে নামিয়ে দিয়ে এসেছি।

কোন হোটেল?

রাহুলবাবু বলেন, প্রান্তিকের কাছে হোটেলে 'রোজিয়েট'।

মৈনাক বুঝতে পারে সুযোগ পেয়ে ভাল জায়গাতেই সাইজ হয়েছেন রানাদারা। 'রোজিয়েট' এখানকার সব থেকে দামি হোটেল। কিন্তু মৈনাকের কোনও উৎসাহ জাগছে না। আহেলিকে হারিয়ে ফেলে মনটাই দমে গেছে। আহেলির সঙ্গে দেখা না হলে সে তো মেমারি থেকে ফেরার ট্রেন ধরত। আচ্ছা, এটাকেই কি প্রেমে পড়া বলে? বোধহয়! মৈনাকের কমপার্টমেন্টে অতকটা মেয়ে ছিল, যৌবনের সদম্ভ ঘোষণায় তারা আকর্ষণ করার চেষ্টা করছিল মৈনাককে, তখন বেশ বিরক্তই হচ্ছিল মৈনাক। অথচ... —আসুন স্যার। রাহুলবাবুর ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে দিল। লোকটার মুখে এখনও কৃতজ্ঞতার হাসি লেগে আছে।

•

রাস্তায় গিজগিজ করছে ভিড়। রিকশা, সাইকেল, বাস, কলকাতা থেকে আসা প্রাইভেট কার সব মিলিয়ে বোলপুর শহরে হইহই কাণ্ড। এ সবের মধ্যে দিয়ে রাহুলবাবুর ড্রাইভার স্মুথ ড্রাইভিং করছে। রাস্তা একটু ফাঁকা হতে রাহুলবাবু বলেন, আপনার বন্ধুদের তো দেখলাম না?

মিথ্যের কখনও শেষ হয় না, মৈনাক বলে, ওরা আমার আগেই প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে গেছে, আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। জানতাম আসবেন।

ভেরি গুড। তা ট্রেন জার্নিতে স্টোরির এন্ড পোর্সানের কোনও সলিউশন হল?

মনে মনে প্রমাদ গোনে মৈনাক, ভবি ভোলবার নয়। এই যে এত খাতির, দামি হোটেল, গাড়ি করে নিতে আসা, সবটাই গল্পের উৎকৃষ্ট শেষের আকাঙ্ক্ষায়। মৈনাক বলে, হয়ে এসেছে। রাত্তিরে বলব।

ওকে, ফাইন। এখন চলুন, একটু রেস্ট নিয়ে নিন।

সময়টুকু পেয়ে গল্পের পরিণতির কথা ভাবতে থাকে মৈনাক। লাভ হয় না। মনের ওপর উড়ে উড়ে বসে সবুজ জামা পরা আহেলি। আর তখনই আহেলিকে বর্ণনা করার উৎকৃষ্ট উপমা পেয়ে যায় মৈনাক। মেয়েটাকে পাকাধানের খেতে বসা গঙ্গাফড়িঙের মতো দেখতে।

ভোরের বার্তা'র সংস্কৃতির পাতাটা অনীশ দেখে। বিকেলের দিকে কাজের চাপ থাকে বেশি। টেবিলে মাথা গুঁজে একমনে কাজ করে যাচ্ছে অনীশ। এমন সময় কে যেন ভীরু কণ্ঠে ডাকে সোনা! ডাকটায় অতীতের সুর। প্রথমটায় ভেবেছিল বুঝি বিভ্রম। আবার যখন একই ডাক শুনল, চোখ তুলতেই হল অনীশকে, টেবিলের সামনে কুণ্ঠিত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটিকে দেখে, যৎপরনাস্তি অবাক ও বিব্রত হল। পারমিতার বাবা! অলকেশকাকু।

প্রাথমিক বিস্ময় কাটিয়ে উঠতেই, রাগ গিয়ে পড়ল অফিসের 'হাটখোলা' সিস্টেমের ওপর। রিসেপশনে কোনও ভিজিটর এলে সোজা ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দেয়। ফোন করে একবার জেনেও নেয় না, যার কাছে এসেছে, সে রাজি কি না দেখা করতে। পরের সমস্যা হল, অনীশের টেবিলের সামনে ভিজিটরস চেয়ার কোনও সময়ই জায়গায় থাকে না।

সজলের টেবিলের দিকে তাকায় অনীশ, যা ভেবেছিল, দুটো মেয়ে সজলের টেবিলের সামনে বসে গেঁজিয়ে যাচ্ছে। অনীশের ভাগের চেয়ার ওখানেই। সজলের সামনে প্রায় সময় দুটো মেয়ে থাকে। মেয়েগুলো পালটে গেলেও সংখ্যায় বাড়ে কমে না। 'মেয়েবাজ' ছেলে হিসেবে অফিসে সজলের বেশ খ্যাতি আছে।

গল্পে মত্ত সজলের হঠাৎ চোখ পড়ে অনীশের ওপর, ইশারায় 'সরি' বলে। একটি মেয়েকে নির্দেশ দেয় চেয়ার ফেরত দিয়ে আসতে।

মেয়েটি চেয়ার বয়ে নিয়ে আসে। অনীশ পারমিতার বাবার উদ্দেশে বলে, বসুন কাকাবাবু।

খুবই সংকুচিতভাবে চেয়ারে বসেন অলকেশ। অনীশের দিকে কেমন ভাবে যেন তাকান। তারপর গলা ঝাঁকি দিয়ে শুরু করেন এদিকে একটা কাজে এসেছিলাম। তোমার সঙ্গেও একটু দরকার ছিল, ভাবলাম সেরে যাই। অসময় এসে কাজে ব্যাঘাত দিলাম বোধহয়।

অনীশ জানে এ সবই ভূমিকা মাত্র। কাকাবাবু বিশেষ কোনও দরকারেই তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। কী এমন প্রয়োজন যে, পাড়ায় না বলে অফিসে আসতে হল! জানা গেল খানিক পরেই। দু'-একটি সৌজন্যমূলক কথা সেরে কাকাবাবু আচমকাই বলে বসলেন। পারমিতার সঙ্গে দেখা হয়?

একটু যেন অপমানিত বোধ করে অনীশ। বলে, কেন, হঠাৎ ওর সঙ্গে দেখা হবে কী করে!

বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে কাকাবাবু বলেন, তুমি জানো না ও এখন কলকাতায়?

জানি। মনু বলছিল। ওর সঙ্গে না কি এক দিন দেখা হয়েছে।

আমরাও খবর পেয়েছি ও কলকাতায় ফিরেছে। তাই ভাবলাম তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করবে। হয়তো করেওছে, তুমি বলতে চাইছ না।

এ কথার কোনও উত্তর দেয় না অনীশ। সে ঠিকই করে নিয়েছে, পারমিতার কোনও ব্যাপারেই নিজেকে জড়াবে না। এই যে ওর বাবা আজকে এসেছেন, পাঠিয়েছেন ওঁর স্ত্রী। এঁরাই এক সময় উঠেপড়ে লেগেছিলেন, পারমিতা যেন অনীশকে বিয়ে করে না বসে। লাভ কী হয়েছে! মেয়ে কলকাতায় ফিরেও দেখা করছে না মা-বাবার সঙ্গে। নিরুপায় হয়ে মেয়ের খবর নিতে অনীশের কাছেই আসতে হয়েছে। সিচুয়েশনটা যেন পারমিতার পাঠানো শুশ্রূষা, অনীশের পুরনো ক্ষতে প্রলেপ দিতে এসেছে।

অনীশকে চুপ থাকতে দেখে অলকেশ বলে ওঠেন, ও কে বোলো বাবা-মা এখনও বেঁচে আছে। দৃষ্টিও পরিষ্কার। এক বার যদি আসে, চোখের দেখা দেখি। কথা বলতে হবে না। মেয়েটাকেও যেন আনে। ওর মেয়েকে শুধু বলব, সে যেন নিজের বাবা-মাকে এ ভাবে কষ্ট না দেয়।

চোখের জল সামলাতে উঠে দাঁড়ালেন কাকাবাবু। খুবই আবেগ তাড়িত হয়ে পড়েছেন। চলে যাচ্ছেন মাথা নিচু করে। হয়তো আরও কিছু বলার ছিল। পারলেন

না। যথেষ্ট হৃদয় বিদারক দৃশ্য। কিন্তু আশ্চর্য, অনীশের এতটুকু কষ্ট হচ্ছে না। অদ্ভুত এক প্রসন্নতায় ভরে যাচ্ছে মন। এও এক ধরনের মধুর প্রতিশোধ, যদিও অনীশ এখানে নিষ্ক্রিয়।

কাকাবাবু চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ সে দিকে তাকিয়ে রইল অনীশ। একবার মনে হল, কাল ফোনে পারমিতাকে অফিসের নম্বারটা দিলে ভালই হত, ফোন এলে বলতে পারত কাকাবাবু এসেছিলেন। বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করছ না কেন? সেই কবেকার রাগ আজও পুষে রেখেছ!

আপাতত একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে, বয়সের ধর্ম অনুযায়ী পারমিতার অনেক কোষ মরে গেলেও কিশোরীবেলার কিছু কোষকে আজও সযত্নে সজীব রেখেছে সে। তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল কাল সন্ধেতেই, বিল্টুকে নিয়ে রং কিনে ফেরার পর সুতপা বলল, তুমি বাবা, ফোনের কাছেই বোসো। আরও দু'বার এসেছিল। সেই এক ব্যাপার, ফোন তুলে হ্যালো বলার পরই কেটে দিচ্ছে।

কথাগুলো বলার সময় সুতপার সংসারে তৃপ্ত মুখে কালো ছায়া ঘনিয়ে আসতে দেখেছিল অনীশ। আশঙ্কা উড়িয়ে দিতে অনীশ বলে উঠেছিল, ছাড়ো তো, অত গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নেই। ফোন থাকলেই ঘোস্ট কল আসবে।

আগে তো আসত না।

অকাট্য যুক্তি তুলেছিল সুতপা। উত্তর দিতে পারেনি অনীশ। তারপর থেকেই তার মন পড়েছিল ফোনের দিকে, সত্যিই কি অনীশ ফোন ধরলে ও প্রান্ত সাড়া দেবে?

ঘটল তাই। সুতপা সংসারের কাজে নীচে, ফোন বেজে উঠতেই ঝাঁপিয়ে ধরে অনীশ। 'হ্যালো' বলার সঙ্গে সঙ্গে ও প্রান্তে অবধারিত পারমিতার গলা, বাবাঃ, বউকে কি ফোনের সামনে পাহারায় বসিয়ে রাখো না কি?

পারমিতার গলায় কুড়ি বছর পেরিয়ে আসার কোনও ক্লান্তি নেই। যেন কালই জয়পুরিয়া কলেজের সামনে দেখা হয়েছিল।

মুহূর্তে সমস্ত আতঙ্ক, কষ্টে রূপান্তরিত হয়ে অনীশের গলায় গুটলি পাকায়। কিছু একটা বলতে যাবে অনীশ, চোখের কোণ দিয়ে দেখে সুতপা দাঁড়িয়ে আছে, দৃষ্টিতে গাঢ় সন্দেহ। ফোনের আওয়াজ শুনেই ওপরে উঠে এসেছে হয়তো। ও প্রান্ত তখনও বলছে, কী হল, উত্তর দিচ্ছ না কেন? চিনতে পারছ না আমার গলা!

পারমিতার মুখ চেপে ধরার মতো রিসিভার নামিয়ে রাখে অনীশ। সুতপার সঙ্গে চোখাচোখি হতে, ইশারায় সুতপা জানতে চায়, কে ছিল? ঠোঁট ওলটায় অনীশ।

তারপর আরও খানিকক্ষণ কাজের ছুতোয় সুতপা ওপরে ছিল। ফোন আসছে না দেখে এক সময় নীচে নেমে যায়। তখনই ফোনসেটের কাছে যায় অনীশ। বিল্টু

বিছানায় বসে একা লুডো খেলছে, ছেলেকে আড়ালে রেখে রিং-এর সুইচটা লো ভলিউমে রাখে। কাজটা করতে তার মোটেই ভাল লাগছিল না, নিজেকে বড্ড ছোট মনে হচ্ছিল। কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় কী? পারমিতা আবার ফোন করবে। সুতপার অজ্ঞাতে ওর সঙ্গে কিছু কথা বলে নিতে চেয়েছিল অনীশ।

ফোনসেটের কাজ সেরে সে যায় বিল্টুর খেলায় যোগ দিতে। বিল্টুর দুষ্টুমি, মজার মজার কথা, আত্মজর শরীর থেকে ভেসে আসা সৌরভ, জানলার বাইরে জ্যোৎস্নায় ধোয়া বাড়ি ঘরের মায়ায় একটুক্ষণের জন্য অনীশ ভুলেই গিয়েছিল ফোনের কথা। ফোন কিন্তু আবার বাজে। চাপা শব্দে ডাকে অনীশকে। বিছানা থেকে নেমে গিয়ে অনীশ রিসিভার তুলেছিল। সন্তর্পণে 'হ্যালো' বলতেই, ও প্রান্তে পারমিতা বলে উঠেছিল, কেন ফোন নামিয়ে রাখছ অনীশ? এত দিন পর গলা পেলে আমার, একটু কথা বলতেও ইচ্ছে করল না!

নিজের সমস্ত আবেগ একত্রে সরিয়ে রেখে অনীশ একটু কঠোর গলায় বলেছিল, তোমার এ ভাবে ফোন করা ঠিক হচ্ছে না পারমিতা। সুতপা আমাকে ভুল বুঝতে পারে। তা ছাড়া এ ধরনের গোপন ফোনালাপ করতে আমার রুচিতে বাধে।

সুতপা তোমার বউ? জানে আমার কথা?

হয়তো জানে। আমি বলিনি।

কেন বলনি অনীশ? তুমি তো জানতেই আমি এক দিন আসবই। ও বেচারি প্রস্তুত থাকতে পারত।

পারমিতার অ্যাডামেন্সির সঙ্গে পরিচিত অনীশ। এত বছর পরও তার তেজ এতটুকু কমেনি দেখে, একটু যেন অসহায় হয়ে পড়েছিল। মনের ভাব গোপন করে অনীশ বলে, দেখো পারমিতা, আমরা দু'জনেই এখন স্টেবল, থিতু মানুষ। এ সব কথার এখন আর কোনও অর্থ হয় না।

অর্থ হয় অনীশ। আমি বিয়ে করলেও, এখনও সংসারী হতে পারিনি। আর আমার অন্যত্র বিয়ের জন্য অনেকাংশে তুমিই দায়ী। সে দায় নিশ্চয়ই অস্বীকার করবে না।

দায় তো আমি কখনও অস্বীকার করিনি। কোনও দিন তোমায় বলতে যাইনি, কেন তুমি অন্য একজনকে বিয়ে করলে? পুরনো বিষয় খুঁচিয়ে তুলে এখন কোনও লাভ আছে? দোষ-ভুল তো আর শোধরানো যাবে না।

তা হয়তো যাবে না। কিন্তু আমার সেই প্রশ্নের উত্তর এখন চাই। কেন সেদিন ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিস থেকে মাথায় একরাশ অপমান নিয়ে আমায় বেরিয়ে আসতে হয়েছিল? রেজিস্ট্রার মহিলা সেদিন যে কী সাংঘাতিক অনুকম্পার দৃষ্টিতে

তাকিয়েছিলেন, তা আজও আমি ভুলতে পারি না। ডাস্টবিনে পড়ে থাকা বাচ্চার দিকেও কেউ ও ভাবে তাকায় না। বিয়ের সাক্ষী দিতে আসা শোভনা, স্বপনদাও ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না সান্ত্বনার। আমার দুর্ভাগ্যের জন্য শোভনা কাঁদছিল। ভীষণ কাঁদছিল... বলে, চুপ করে যায় পারমিতা। এই সূত্রে আর একটা কথা মনে পড়ে যায় অনীশের, কে যেন এসে বলেছিল, শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় পারমিতা এককোঁটা কাঁদেনি। শোভনার কান্না আর পারমিতার না-কাঁদার মধ্যে কোথাও একটা সূক্ষ্ম কার্যকারণ লুকিয়ে আছে। শোভনার চোখের জলকে অপচয় প্রমাণ করতেই কি পারমিতা সে দিন কাঁদেনি? অন্যের করুণা বর্ষণে দ্রবীভূত হতে দিতে চায়নি আত্মমর্যাদাকে।

কী হল অনীশ, উত্তরটা দেবে না আমাকে? সব কিছু জানা আমার ভীষণ দরকার। সত্যি কথা বলতে কী, আমি এত দিন অপেক্ষায় ছিলাম, তুমি নিজেই একদিন এসে উত্তরটা দেবে। সত্যিই যদি কোনও দোষঘাট করে থাক, এসে ক্ষমা চাইবে। আমি ক্ষমা করার জন্য সেই যে কনফেশন বক্সের অন্ধকারে বসে আছি, তো আছিই। বাইরে বেলা বয়ে গেছে। তুমিও কখন যেন সংসার সংসার খেলায় মেতে গিয়ে ভুলেই গেছ আমার কথা। বক্সের অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হয়েছে, ইদানীং নিজেকে আমার অন্ধ হয়ে গেছি বলে মনে হয় ...

পারমিতার কথাগুলো পুরোপুরি গিঁথে ফেলেছিল অনীশকে। টের পেয়েছিল চেপে রাখা অভিমানে কখনও মরচে পড়ে না। সময় তাকে দিনে দিনে ধারালো করে। পারমিতার থেকে নিস্তার পেতে ফোনে অনীশ বলেছিল, সব দোষ আমার, পারমিতা প্লিজ তুমি আমাকে ঘেন্না করো, ক্ষমা করতে চাইলে, কোনও দিনই ভুলতে পারবে না।

অনীশের নাটকীয়তা গ্রাহ্য না করে, অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে পারমিতা বলতে শুরু করেছিল, জানো অনীশ, রেজিস্ট্রি করতে যাওয়ার দিন আমি একটা নতুন শাড়ি পরেছিলাম। তোমার যে রং পছন্দ, সেই রঙের। শিয়ালদায় এসে বাস থেকে নামলাম। প্রাচী সিনেমার সামনে শোভনা, স্বপনদার থাকার কথা। তুমি সোজা চলে আসবে রেজিস্ট্রি অফিসে। প্ল্যান সব নিখুঁত সাজানো থাকলেও, বাস থেকে নেমে মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। মনে হল কী যেন একটা বাকি থেকে যাচ্ছে। পরক্ষণেই খেয়াল হয়, যতই গোপনে বিয়ে হোক, দুটো মালা থাকবে না! লজ্জার মাথা খেয়ে ফুলের দোকান দেখে কিনে নিলাম মালা। পলিপ্যাকে মালা নিয়ে যখন শোভনা, স্বপনদার সামনে পৌঁছলাম, ওরা তো হেসে অস্থির। খুব পিছনে লাগল। সেই মালাই উপহাসের বস্তু হল পরে। তুমি এলে না। রেজিস্ট্রি অফিস থেকে

বেরিয়েই মনে হল মালার প্যাকেটটা ছুড়ে ফেলে দিই, পারলাম না। রাস্তায় বড্ড নোংরা, খোলা নর্দমা। এক বার ভাবলাম শোভনাদের দিয়ে দিই, ওরা যা পারে করুক। ভয় হল ওরা যদি আমার সামনেই ছুড়ে ফেলে দেয়। বাসে পলিপ্যাকে মালা নিয়ে বসে আছি। কোথাও ফেলতে পারিনি। পুরো কলকাতাটাই ভীষণ নোংরা লাগছে। ওই অবস্থাতেই পাড়ায় ফিরলাম। রাত প্রায় ন'টা। গলি ধরে হেঁটে আসছি। ভবতারিণী মন্দিরের সামনে এসে দেখলাম, আলো জ্বলছে, পূজারি নেই। প্রতিমা একা দাঁড়িয়ে আছেন। মন্দিরের দালানে মালার প্যাকেট রেখে পালিয়ে এলাম বাড়ি। ওই মালাটার মতো আজও তোমাকে আমি ঘেন্না করে ঝেড়ে ফেলতে পারিনি। আমার কেন জানি মনে হয়, সেদিন যে তুমি আসনি, তার পিছনে বিশেষ কোনও কারণ আছে, কারণটা আমি জানতে চাই। এতদিন পর সেটা বলতে তোমার দ্বিধা হওয়ার কথা নয়।

ও বাবা! কার সঙ্গে কথা বলছ সেই থেকে? চলো না খেলতে। বিল্টু এসে ফোন কানে দাঁড়িয়ে থাকা অনীশকে টানতে লেগেছিল। ও প্রান্তে পারমিতা বলে, কে, ছেলে বুঝি?

হ্যাঁ।

কত বয়স, কী নাম?

বিল্টু। ছয়ে পড়ল।

নিশ্চয়ই খুব মিষ্টি দেখতে হয়েছে!

অনীশ বুঝতে পেরেছিল এত দিনের জমা কথা এত সহজে শেষ হওয়ার নয়, দাঁড়ি টানতে সে বলে, পারমিতা, প্লিজ তুমি বাড়িতে ফোন কোরো না আর। বিচ্ছিরি এম্বারাসিং সিচুয়েশন তৈরি হচ্ছে।

তোমার অফিসের নাম্বার দাও। সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল পারমিতা।

এখন থাক। আমিও জানি সেদিন রেজিস্ট্রি অফিসে না যাওয়ার কৈফিয়ৎ তোমাকে এক দিন দিতেই হবে। আমার আর একটু মেন্টাল প্রিপারেশন দরকার। তারপর আমি নিজেই তোমাকে ফোন করব।

ঠিক আছে। আমার নাম্বারটা লিখে নাও ...

লিখে নিয়েছিল অনীশ। ফোন রাখার আগে পারমিতা বলে, কাল এমনিই একটা ফোন কোরো না, আমার ভাল লাগবে।

ফোন করা হয়নি। নিজে থেকে ফোন করতে ভয় পাচ্ছে অনীশ।

কী বস্, এই দেখলাম মুখ গুঁজে কাজ করছ, এখন আবার উদাস নেত্র!

সজলের কথায় মন ফেরে অফিসের টেবিলে। অনীশ ম্যানেজ হাসি দিয়ে বলে,

তেমন কিছু না।

অবভিয়াসলি কিছু। তোমার গেস্ট চলে যাওয়ার পর প্রায় আধ ঘণ্টা তুমি এ রকম ভাবে বসে আছ।

বলছি তো কিছু না। তুই কাজে যা। বলে, অনীশ। কাঁধ শ্রাগ করে, ঠোঁট উলটে নিজের সিটে ফিরে যায় সজল। কাজে ডুব দিতে গিয়ে অনীশ বোঝে, মাথা ঠিকঠাক কাজ করছে না। বার বার মনে ভেসে উঠছে পারমিতার মুখ। কুড়ি বছর আগের মুখ। এখন কেমন দেখতে হয়েছে কে জানে!

সেই মুখটাই এখন পরিচর্চিত হল সল্ট লেকের একটা বাড়ির আয়নায়। কোথাও যাওয়ার নেই পারমিতার। তবু হঠাৎ যদি ইচ্ছে করে যেতে। কলকাতায় আসার পর থেকে মনের বাঁধন আলগা হয়ে গেছে। এই মনে হচ্ছে চলে যাবে মা-বাবার কাছে। বলবে, আমি সব ভুলে গেছি মা। ছেলেমানুষের মতো এতদিন জিদ ধরে বসেছিলাম, কিছুতেই দেখা করব না তোমাদের সঙ্গে। আমার জেদ আমার কাছেই থেকে গেছে, কারওর কিছু যায় আসেনি তাতে। অনীশ বিনা দ্বিধায় বিয়ে করেছে অন্য মেয়েকে, আমার পাওনা ভালবাসা লুটেপুটে খেয়েছে মেয়েটা। ওদের একটা ছেলেও হয়েছে। ছেলেটার ডাকনাম বিল্টু। ভাল নামটা আমি আন্দাজ করতে পারি, মুখ ফুটে বলতে পারেনি অনীশ। আমাদের ছেলে হলে যে নামটা রাখব ঠিক করেছিলাম, সেই নামটাই নিশ্চয়ই দিয়ে দিয়েছে। সে ছেলে এখন 'বাবা, বাবা' করে কান ভরিয়ে রেখেছে অনীশের। আমাকে পুরো কথা বলার সুযোগই দিল না সেদিন! — অনীশই যদি আমাকে ভুলে যায় মা, খামোকা তোমাদের ওপর রাগ করে কেন আমি বসে থাকি। আমারও কি ইচ্ছে করে না, ছোটবেলার সেই ঘরটায় ফিরে যেতে? সেই উঠোন, গ্রিলঢাকা বারান্দা, ছাদ ... এত দূর পর্যন্ত ভেবে, পারমিতার চিন্তার স্রোত বিপরীত খাতে ঘুরে গেল, মায়ের উদ্দেশে মনেমনে বলল, তোমার কাছে না যাওয়াই উচিত। কেন তুমি তখন আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছিলে? রোজ বলতে, অনীশের বাবা একটা চরিত্রহীন লোক, যে মহিলার সঙ্গে পালিয়েছেন, তিনিও সুবিধের নন। কার যেন রক্ষিতা! ও বাড়িতে তোকে কী করে বিয়ে দিই। আত্মীয়-স্বজনের কাছে মুখ দেখাতে পারব না। বেরোতে পারব না পাড়ায় ...

আমার সম্বন্ধ দেখতে। কলেজ থেকে ফিরে মাঝেমধ্যেই অচেনা কিছু লোকের মুখোমুখি হতাম আমি। তুমি জানতে পাত্রপক্ষের সামনে সাজিয়েগুছিয়ে আমাকে বসাতে পারবে না, তাদেরকে বোঝাতে, মেয়েকে না জানিয়েই দেখা ভাল, যদি কোনও খুঁত থাকে সহজেই ধরতে পারবেন। এই ভাবে বড় একটা খুঁত ঢাকা দিতে

চাইতে। সেই সব ছল করে দেখতে আসা অতিথিদের সঙ্গে ভদ্রতার খাতিরে আমাকে হেসে দুটো কথা বলতেই হত। দু'দিন পর তুমি বলতে, সেদিন যে ওরা দেখে গেল, জানিস, ভীষণ পছন্দ হয়েছে তোকে। আমি একটা কথা বুঝতাম না, কলকাতায় কি আর কোনও মেয়ে নেই! সবার আমাকেই পছন্দ হয়ে যায় কেন? ভয় পাচ্ছিলাম আমি। এত লোক দেখে যাচ্ছে, তোমরা ডেকেছ তাঁদেরকে, অর্থাৎ তোমাদের সম্মতি আছে। অনিচ্ছাতে হলেও, আমি তাঁদের সামনে এসে বসেছি, এও এক ধরনের কমিটমেন্ট। কিন্তু অন্য কাউকে বিয়ে করা মানে আরও বড় প্রতারণা। ধরলাম গিয়ে অনীশকে, লুকিয়ে হলেও, আমাকে এক্ষুনি বিয়ে করো। ম্যারেজ সার্টিফিকেটটা যাতে মাকে দেখাতে পারি।

অনীশের তখন উদভ্রান্ত অবস্থা। যখন যেমন খবর পাচ্ছে, ছুটে যাচ্ছে বাবার খোঁজে। সংসারে টানাটানি। সব আত্মীয়স্বজন সরে গেছে পাশ থেকে। আমি স্বার্থপরের মতো তখন বিয়ের কথা তুললাম। বার বার একই কথা বলে কান ঝালাপালা করে দিতাম ওর। অসহায় ভয়াতুর ভাবে তাকিয়ে থাকত আমার দিকে। 'না' বলার শক্তি ছিল না, পাছে আমি চিরকালের জন্য ওকে ছেড়ে চলে যাই। মিনমিনে গলায় সময় চাইত। যেন ভিক্ষে চাইছে। ওকে ওই দৃশ্যে আমি কল্পনাও করতে পারি না। ও ছিল আমার বল্গাহীন তেজি সাদাঘোড়া। ও ছিল আমার ভোরবেলার প্রথম রোদ্দুর। ও ছিল আকাশের সবথেকে উঁচুতে ওড়া ঘুড়ি। ও ছিল ছদ্মবেশী রাজপুত্তুর। একমাত্র আমিই ওকে চিনতাম। ওর বুকে মাথা রাখলেই শুনতে পেতাম ঝাড়বাতির ঠিনঠিন শব্দ। ওর ঘামের গন্ধে মিশে থাকত রাজবাড়ির পৌরুষ। আচ্ছা, দেশের রাজপুত্তুরকে যদি তার প্রেমিকা রাস্তায় ভিক্ষে করতে দেখে, কেমন লাগবে! বিয়ের ব্যাপারে জোর করার আরও একটা কারণ ছিল, ওর এই দুঃসময়ে একজনকে তো পাবে নিভৃতে ছোটখাটো আদেশ করার। অফিস থেকে ফিরলে, জল এগিয়ে দেব। রুটি, বাঁধাকপির চচ্চড়ি করব ওর মায়ের সঙ্গে বসে। পরম তৃপ্তি করে খেয়ে, বগলে মাদুর নিয়ে আমাকে ইশারায় ডাকবে ছাদে যেতে। ছাদে তখন পূর্ণিমার নিটোল চাঁদ। চাঁদের তো বড়লোক, গরিব লোক বাছাবাছি নেই ... কিন্তু আসবে বলেও কেন যে রেজিস্ট্রির দিন এল না, কে জানে! ভেবেছিলাম সেদিনই রাত্তিরে এসে ক্ষমা চাইবে, বলবে, না আসতে পারার কারণ। এল না। দু'তিন দিন তাকে দেখাই গেল না পাড়ায়। আমিও রাগ করে ওর বাড়ি যাইনি। পাশের বাড়ির বন্ধু ডালিয়াকে বললাম, ওকে শুনিয়ে আয়, আমার বিয়ের সব ঠিকঠাক। ডালিয়া এসে বলল, সব শুনে ও না কি বলেছে, এটাই হওয়ার কথা ছিল।

এত কষ্ট পেয়েছিলাম আমি, চিন্তা ভাবনা করার শক্তিটাই চলে গিয়েছিল।

তোমাকে এসে বললাম, যার সঙ্গে পার বিয়েটা দিয়ে দাও। আমার এই হঠকারী সিদ্ধান্তে সলিল বলি হল। কোনও দিনই আমায় পেল না সেভাবে। আমার জায়গায় যদি অন্য কোনও মেয়ে আসত, কত সুখে ঘর-সংসার করত আজ। সলিলের জন্য আমার কষ্ট হয়। ও কি আমার দুঃখ বোঝে?

ডোরবেল বাজে। মায়ের সঙ্গে কাল্পনিক কথা বন্ধ করে পারমিতা। কে এল? গাড়ির আওয়াজ যখন পাওয়া যায়নি, সলিল নিশ্চয়ই নয়। তা হলে কে? একটু অপেক্ষা করার পর বুঝতে পারে সলিলই এসেছে। কারণ, পারমিতা ঘরে থাকলে সলিল দু'বার বেল বাজায় না। কিন্তু গাড়ির আওয়াজ কেন পেল না পারমিতা? এতটাই অন্যমনস্ক ছিল! দরজা খুলতে যায়।

সলিল ঘরে ঢুকে পারমিতার দিকে তাকিয়ে একটু থমকায়। বলে, কোথাও বেরোবে না কি?

না তো! বলার সঙ্গে সঙ্গে পারমিতা একটু সলজ্জ হয়, সাজটা বোধহয় সামান্য চড়া হয়ে গেছে। সন্ধের দিকে সব সময়ই হালকা প্রসাধন করে থাকে, আজ সলিলের চোখে লাগল। পারমিতাকে অবাক করে সলিল সোফায় বসতে বসতে বলল, বেশ লাগছে তোমাকে।

কথাটা যেন শুনতেই পায়নি, এমন ভাব করে পারমিতা কিচেনে যায়। ওভেনে চায়ের জল বসিয়ে স্বৈরিণীর মতো হাসে, যেন এইমাত্র পরপুরুষ তার প্রশংসা করল।

চা নিয়ে ড্রয়িং কাম ডাইনিং স্পেসে আসে পারমিতা। পোশাক বদলে, সোফায় গা এলিয়ে টিভি দেখছে সলিল। বাংলা খবর। কলকাতার রাস্তাঘাট দেখাচ্ছে। এখানে আসার পর থেকে সলিল বাংলা চ্যানেলই বেশি দেখে।

পারমিতার দেওয়া চায়ের কাপে চুমুক মেরে সলিল বলে, আহেলির ট্রেন আজ লেট ছিল।

মনে মনে জিভ কাটে পারমিতা, এই রে মেয়ের খবর নিতে ভুলেই গেছে। সেও ফোন করেনি। নিজের দোষ গিলে নিয়ে পারমিতা বলে, তুমি কী করে জানলে?

ফোন করেছিলাম তোমার জ্যাঠার বাড়িতে। আহেলির সঙ্গে কথা হয়নি। জ্যাঠামশাই বললেন, ট্রেন লেট ছিল। মেয়েবেলা করে পৌঁছেই বেরিয়ে গেছে ফাংশন দেখতে। জ্যাঠামশাইকে বলে গেছে বাড়িতে ফোন করে দিতে, তার আগেই আমি ...

সলিলের কথার মাঝে পারমিতা বলে ওঠে, তুমি খবরটা জানার পর, আমাকে ফোন করলে না কেন?

ভাবলাম জ্যাঠামশাই নিশ্চয়ই তোমাকে করবেন, আমি তো অফিস থেকে করেছিলাম। অথবা তুমি ও বাড়িতে ... এ-ঘরের ফোন বেজে ওঠে। ধরে নেওয়াই যায় আহেলির ফোন। কিন্তু আর একটা ফোন আসার সম্ভাবনা আছে, পারমিতা ঠিক করতে পারে না ফোনটা এ ঘরেই ধরবে না কি প্যারালাল লাইনে নিজের ঘরের সেটে গিয়ে? চা খেতে খেতে সলিল বলল, ধরো, মনে হচ্ছে শান্তিনিকেতনের ফোন।

দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে ফোন সেটের কাছে যায় পারমিতা। রিসিভার তুলে সন্তর্পণে 'হ্যালো' বলে। ও প্রান্তে হইচই, গানের আওয়াজ। তার মধ্যেই ভেসে ওঠে আহেলির গলা, কে, মা?

হ্যাঁ রে। কোথা থেকে করছিস?

গৌরপ্রাঙ্গণ থেকে। বন্ধুর মোবাইলে। দাদু বলেছে, ট্রেন লেট ছিল?

বলেছে।

ট্রেনে তোমার এক চেনা ...

লাইন কেটে গেল। কানে রিসিভার ঠেকিয়ে অপেক্ষা করে পারমিতা। 'তোমার এক চেনা' মানে! আবার ভেসে ওঠে কোলাহল। আহেলি বলে, লাইনটা খুব ডিসটার্ব করছে। তবু কবিতার সেট থেকে তোমাদের পাওয়া গেল, অন্য কোম্পানিগুলো তো বোগাস। রোমিং করিয়েছে বন্ধুরা, তবু কলকাতা ধরা যাচ্ছে না।

চেনা, কী বলছিলি?

হ্যাঁ, একজনের সঙ্গে দেখা হল। সে পরে বলব'খন। গান শুনতে পাচ্ছ?

পাচ্ছি।

কী গান বলো তো? বলে, সম্ভবত মোবাইল সেটটা শূন্যে তুলে ধরল আহেলি, ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে/ ডালে ডালে ফুলে ফুলে পাতায় পাতায় রে... মহিলা কণ্ঠ। গানের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের আকাশ, বাতাস, শাল-মহুয়ার যেন গন্ধ পাচ্ছে পারমিতা। ফোন নামিয়ে এনে আহেলি বলে, কেমন লাগল বলো?

দারুণ! আর কতক্ষণ থাকবি মাঠে, রাত করিস না।

ঠিক আছে। এখন ছাড়ছি, পরে ফোন করব। ফোন কেটে দিল আহেলি। মনটা বেশ ভাল হয়ে গেছে পারমিতার। মুখে একটা খুশির পাতলা সর পড়েছে। সেই কারণেই বোধহয় সলিল হেসে জিজ্ঞেস করল, কী বলল, মেয়ে?

গান শোনাল, গৌরপ্রাঙ্গণের। বলে, গরবিনির চালে নিজের ঘরের দিকে যায় পারমিতা। অনীশের উপন্যাসটা আজ থেকে পড়া শুরু করবে। হয়তো উপন্যাসের মধ্যেই গল্পের ছলে লিখে রেখেছে সেদিন ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে না যাওয়ার কারণ।

পারমিতার বাবা চলে যাওয়ার পর সেই যে কাজ থেকে মনটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, আর অফিসে মন ফিরে আসেনি অনীশের। হেডিং দেওয়ার জন্য রতন পর পর চারটে কপি দিয়ে গিয়েছিল, ম্যাটারগুলো পড়তে পর্যন্ত পারছিল না। শেষমেশ কপিগুলো সজলের টেবিলে দিয়ে অনীশ বলেছিল, ভাইটি, একটু হেডিংগুলো লিখে দে, মাথা কাজ করছে না।

নো প্রবলেম বস। কিন্তু তোমার হলটা কী? এত ডিসটার্বড তো আগে কখনও দেখিনি। ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক কি খারাপ কোনও খবর দিয়ে গেল?

কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না অনীশের. শুধু মাথা নেড়ে চলে আসে। অফিস থেকে বেরিয়ে ধর্মতলায় খানিক এলোমেলো ঘুরল। খুব দ্রুত প্রস্তুত করতে হবে মনটাকে। আজ না হয় কাল পারমিতাকে বলতেই হবে, কেন সেদিন রেজিস্ট্রি অফিসে যেতে পারেনি। আসল ঘটনা জানার জন্য পারমিতা যেভাবে উদ্যম নিয়েছে, ওকে ঠেকানো মুশকিল। বেহুলার নিশ্ছিদ্র বাসরঘরে যেমন ঢুকে এসেছিল মরণ, পারমিতাও সে ভাবে প্রবেশ করছে অনীশের আপাত নিরাপদ সংসার জীবনে। আর অনীশ যখন জানাবে রেজিস্ট্রির দিন উপস্থিত না থাকতে পারার কারণ, পারমিতা সমস্ত ভুল শোধরাতে গিয়ে লণ্ডভণ্ড করে দেবে নিজের এবং অনীশের সংসার। আচ্ছা, ওকে বানিয়ে কোনও গল্প বলা যায় না? —ধর্মতলার একটা বার-এর সামনে দাঁড়িয়ে এ সবই ভাবছিল অনীশ। এবং দেখল কোনও জুতসই অজুহাত খুঁজে বার করতে পারছে না। কোনও মেয়েকে বিয়ের কথা দিয়ে না যাওয়ার মতো অপরাধ হয়তো খুনের অপরাধের সঙ্গেই মানায়। খুনের অপরাধে আইনি শাস্তি হয়. অনীশের অপরাধের শাস্তি, ভেতর ভেতর দগ্ধ হওয়া। —রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড গরম হচ্ছিল অনীশের। বার-এ ঢুকে পড়ে। মদ পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে অনীশ। কিন্তু আজ শরীরটা ভীষণ চাইছে।

এক পেগ হুইস্কি নিয়ে অনীশ ভাবতে থাকে পরবর্তী করণীয়। পেটে হুইস্কি চালান হওয়ার পরই তার মনে খানিক প্রত্যয় জমে। ঠিক করে, পারমিতাকে ফোন করে বলে দেবে, আমি ইচ্ছে করেই সেদিন বিয়ে করতে যাইনি। আমার ভয় ছিল বড়লোকের দুলালি হয়ে তুমি আমাদের বাড়িতে মানাতে পারবে না। উত্তরে পারমিতা বলবে, আদরের দুলালিকে চুমু খেতে তোমার ভয় হয়নি? বাণেশ্বরপুরের বাড়ি গিয়ে কেন তাকে পেতে চেয়ে, পায়ে পড়েছিলে?

কী উত্তর দেবে অনীশ? বলবে, আমি ও সব জানি না যাও। যা হয়েছিল সব ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করো। আমি তো কিছু মনে রাখিনি। তুমি কেন এখনও ... এ সব শুনে হয়তো বেশ কিছুক্ষণ কাঁদবে পারমিতা। কান্না মনের পক্ষে ভাল। মন ঝরঝরে হয়ে যায়। অন্যত্র বিয়ে করার পর থেকে পারমিতা সম্ভবত একদিনও কাঁদেনি। বড্ড জেদি মেয়ে। কিন্তু তারপর? অনীশের খারাপ ব্যবহারের পর পারমিতা হয়তো আর ফোন করে জ্বালাতন করবে না। একই সঙ্গে অনীশের বুকে থেকে যাবে চেপে রাখা সেই কথা। যা আজ পর্যন্ত সে কাউকে বলতে পারেনি। কথাটা শেকলের মতো অনীশের সত্তাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে। এর থেকে মুক্তি চায় অনীশ। জানে, এর ফলে অনেকটাই বেসামাল হয়ে যাবে তার জীবন। তবু এর থেকে মুক্তি পেতে হবে। নয়তো মৃত্যু অব্দি বয়ে যেতে হবে শেকলের মতো সেই গোপন সংবাদ ... দু'পেগ সাবাড় করে ফেলেছে অনীশ। মাথায় ঝিঁঝি ধরে গেছে। বেয়ারাকে ডেকে আর এক পেগ অর্ডার দেওয়ার পরই সে স্পষ্ট দেখতে পায়, তার মনের মধ্যেই ছোট্ট একটা ফুটো, সেই ছিদ্র পথ দিয়ে বাণেশ্বরপুরের রোদ ফুঁড়ে ফেলছে অনীশের হৃদয়। পারমিতা জানে ছিদ্রটুকুর অস্তিত্ব। কিন্তু ঠিক কোথায়? খুঁজছে সে। ওই ছিদ্রটুকুই অনীশের মুক্তির জায়গা।

'বার' থেকে বেরিয়ে এসেছে অনীশ। সন্ধে চলে গেছে রাতের দখলে। ধর্মতলার আলো অন্ধকার দুটোই এখন বেশ চড়া। স্টেপিং গুলিয়ে যাচ্ছে অনীশের। পাশ থেকে কে যেন বলে ওঠে, এতটা না খেলেই পারতিস।

গলাটা ভীষণ চেনাচেনা লাগে। ঘাড় ঘোরাতে দেখে বাবা। ভীষণ চমকানো উচিত ছিল, শরীর সাড়া দেয় না। নেশায় অলস হয়ে আছে মন। বিড়বিড় করে অনীশ বলে, আপনি আবার কেন এলেন?

তোকে বাড়ি পৌঁছে দিতে।

যতটা সম্ভব চোখের পাতা খুলে বাবার দিকে তাকায় অনীশ। এখনও ওঁর জামায় রক্ত লেগে আছে। শুকনো রক্ত। বিরক্তিতে কুঁচকে যায় অনীশের মুখ। বলে, এখনও অ্যাক্সিডেন্টের জামাটা বদলাননি! —রাগের চোটে একটা স্টেপ মিস হয়। কনুই ধরে নেন বাবা। বলেন, কী করে বদলাই বল? তুই এখনও কাউকে জানাসনি আমি মরে গেছি। তাই আমি সেই দুর্ঘটনাতেই আটকে আছি।

অনীশ বুঝতেই পারে এ সব তার বিভ্রম, তবু বাবার স্পর্শ, কণ্ঠ সব সত্যি মনে হয়। তিনি পাশেই আছেন। বাবার সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে অনীশের, আচ্ছা বাবা, আপনি যেদিন বেসামাল কোনও গাড়ির ধাক্কায় মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন ফুটপাতের ধারে, সেদিন কি বাড়ি ফিরে আসছিলেন?

হ্যাঁ।

আপনি কি মণিকামাসিকে ভালবাসতেন?

জানি না।

আপনি কি আমাদের সংসারে অসুখী ছিলেন?

হ্যাঁ অথবা না।

এটা কোনও উত্তর হল না।

বুঝিয়ে বলছি, কোনও সংসারেই থাকার মতো অভ্যেস আমি কখনওই করতে পারিনি। সংসার, সমাজ, মানুষের ছোট হয়ে আসা মন, নিচু হয়ে যাওয়া রুচি, কোনও কিছুর সঙ্গেই আমি অ্যাডজাস্ট করতে পারছিলাম না। শিল্পই ছিল আমার বেঁচে থাকার অবলম্বন। আমার মিডিয়াম 'নাটক' যখন ধ্বংস হয়ে গেল, আমি পালালাম। সংসারের মতো অসাড়, প্রেমহীন নির্বাসন মেনে নিতে পারছিলাম না।

সে নয় মেনে নিলাম। কিন্তু মণিকামাসির সঙ্গেই পালালেন কেন?

ও আমার মতো খাঁচা থেকে বেরোতে চেয়েছিল। আমরা দু'জনেই পলাতক। পথের সাথি। প্রেমিক নই। প্রেম যদি সত্যিই থাকত, পালাতাম না।

তা হলে আপনি বলছেন, সত্যিকারের প্রেমের সন্ধান পেলে, আপনাকে ও ভাবে রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হত না?

উত্তর পাওয়া গেল না। ধর্মতলা মেট্রোর সিঁড়িতে এসে দাঁড়ায় অনীশ। বাবা পাশে আছেন কি নেই টের পায় না। একরাশ ভিড় স্রোতের মতো উঠে আসছে ওপরে। অনীশ নামতে থাকে।

দমদমমুখী ট্রেন এসে দাঁড়াতেই উঠে পড়ল অনীশ। বাবা ভিড় ঠেলে পাশে এসে দাঁড়ালেন, তুই কেন এখনও আমার খবরটা বাড়িতে জানাসনি?

জানাতাম বাবা। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে খবরটা এল, তালগোল পাকিয়ে গেল সব কিছু।

কী রকম?

সেদিন আমার গোপনে বিয়ে করতে যাওয়ার কথা। আগের দিনই একটা নীল রং-এর গুরু কলারের পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা কিনে দিয়েছিল পারমিতা। সংসারের এই বিপর্যয়ের মধ্যেও পারমিতার চাপে আমি বিয়েটা রেজিস্ট্রি করিয়ে রাখতে রাজি হয়েছিলাম। ওকে কোনও ভাবে হারাতে চাইনি। বিকেলবেলা ওর কিনে দেওয়া পোশাক পরে রেডি হচ্ছি, মা একটু অবাক হল। এক বার জানতেও চাইল, সেজেগুজে কোথায় বেরোচ্ছিস রে? এড়িয়ে গিয়ে কী একটা যেন বলেছিলাম। আসলে নিজেকে বড্ড স্বার্থপর, বেহায়া মনে হচ্ছিল। একটু পরে মা

এসে বলল, দেখ তো গিয়ে সোনা, নীচে তোর বাবাকে কে যেন খোঁজ করতে এসেছে।

গেলাম। খুবই ছাপোষা চেহারার এক ভদ্রলোক। বললেন, তুমি তাপস চ্যাটার্জির বড় ছেলে? বললাম, হ্যাঁ, কেন বলুন তো? উনি বললেন, একটু আগে তোমার মা এসেছিলেন না? ঘাড় হেলাই। উনি বলে যান, খবরটা ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আর বলতে পারলাম না। তুমি একবার আমার সঙ্গে আসতে পারবে? অবাক হয়ে বলেছিলাম, কোথায়? উত্তরে উনি বললেন, তোমার বাবার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। মৌলালির কাছে রাস্তায় পড়ে আছেন।

আমার আর কথা বলার শক্তি ছিল না। ভদ্রলোকের সঙ্গে তখনই বেরিয়ে পড়লাম। ঘোরের মধ্যে কখন যেন মৌলালি পৌঁছে গেছি। পুলিশ তখন চ্যাংদোলা করে আপনাকে গাড়িতে তুলছে। আপনার সেই রাজার মতো চেহারা কেমন জানি রোগা, ছোট হয়ে গেছে। জামায় রক্তের দাগ। আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না ওই মানুষটা আমার বাবা। পাশ থেকে সেই ভদ্রলোক বলছেন, যাও, পুলিশকে গিয়ে বলো, উনি তোমার বাবা। পরিচয় দাও। —একসমুদ্র কান্না উঠে আসছিল বুক ঠেলে। দাঁতে দাঁত চেপে সেই কান্না আটকে রেখে ভদ্রলোককে বললাম, উনি আমার বাবা নন। আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে। তবে অনেকটা বাবার মতো দেখতে। —উনি অদ্ভুত ভাবে হেসে বললেন, সত্যিই তাপস চ্যাটার্জিকে এই চেহারায় দেখলে কেউ আর চিনতে পারবে না। পকেটে কোনও পরিচয়পত্র পায়নি পুলিশ। ছেলে হয়ে তুমিই যখন চিনতে চাইছ না, তা হলে থাক। কোনও রিলিফ সোসাইটি ধরে আমিই না হয় সৎকারের ব্যবস্থা করি ... ভদ্রলোকের কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, আমি পিছন ফিরে ছুটতে লাগলাম। সেদিন কলকাতায় এত গরম ছিল, বার বার রাস্তার গলা পিচে আটকে যাচ্ছিল চটি। এখন আপনিই বলুন, মনের ওই অবস্থায় কেউ বিয়ে করতে যেতে পারে। সারা কলকাতা ঘুরে বেড়ালাম। একটু আড়ালে আড়ালে। গলি থেকে তস্য গলির ভেতরে ঢুকে গেলাম। যখনই কোনও মানুষের সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে, মাথা নামিয়ে নিয়েছি। হঠাৎ যদি লোকটা বলে ওঠে, তুমি এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছ, তোমার বাবা বেওয়ারিশ হয়ে পড়ে আছেন!

অন্ধকার নেমে যেতে বাড়ি ফিরলাম। মা এসে দরজা খুলল। সেই সরল সাদাসিধে সিঁদুর চর্চিত মুখ। অভিমান, উৎকণ্ঠা মিশিয়ে বলল, কোথায় যে না বলে চলে গেলি, যত বেলা বাড়ছে চিন্তা হচ্ছিল। একজন তো সমস্ত দায়দায়িত্ব ভুলে নিরুদ্দেশ হলেন। কী খাচ্ছি, কেমন আছি, এক বারও মনে পড়ে না তার ... আরও কী সব যেন বলে যাচ্ছিল মা। পিছন পিছন ঘরে ঢুকে এলাম। মায়ের কথার মাঝে

ফাঁক খুঁজছিলাম, কখন মর্মান্তিক দুঃসংবাদটা দেওয়া যায়। কিন্তু মা যে থামছিলই না, বলেই যাচ্ছে, ও হ্যাঁ, শোন, তোর জ্যাঠা এসেছিলেন। বললেন, ওঁর কে এক বন্ধু তোর বাবাকে ক'দিন আগে কাটোয়া স্টেশনে দেখেছে। তোর জ্যাঠার বন্ধু কথা বলতে গিয়েছিল। উনি পরিচয় দেননি। খুব রোগা হয়ে গেছেন। খুব কাশছিলেন না কি। আমি বলি কী, কালই তুই এক বার কাটোয়া যা। তোকে তো খুব ভালবাসতেন, দেখলে হয়তো মনটা নরম হবে। মনে পড়বে বাড়ির কথা। তুই ওঁকে বোঝাবি। বলবি, আমরা আর পুরনো কথা তুলব না, বাড়ি চলুন, আপনার নিজের বাড়ি ...

খবরটা কিছুতেই মুখ ফুটে বেরল না। সিঁধিয়ে গেল বুকের গভীর কোনও গর্তে। কথাটা পাথর হয়ে গেছে, ওজন টের পাই। ইদানীং হাঁফিয়ে উঠি। এক এক সময় মনে হয়, বলে ফেলি সব কথা। বললেই মা সিঁদুর মুছে ফেলে বোবা হয়ে যাবে। মায়ের যে অনেক কথা বলার ছিল আপনাকে, বহু ভুল শোধরানোর ছিল, তার আর উপায় থাকবে না। বাড়ি জুড়ে আলোচনা শুরু হবে, আপনাকে নিয়ে নানান গালগল্প, মণিকামাসি আপনাকে ছিবড়ে করে ফেলে দিয়ে গেছে। কী করুণ মৃত্যু হয়েছে আপনার! আড়ালে কেউ বলবে, পাপের উপযুক্ত শাস্তি। আরও কালিমালিপ্ত হয়ে আবার আপনি বেঁচে উঠবেন আমাদের পরিবারে। যার থেকে আপনার আগের ওই নিষ্ঠুর প্রস্থান অনেক মহিমাময়। চোখের সামনে আপনার ওই শীর্ণ, প্রাণহীন দেহটাকে চরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পুলিশ যখন ভ্যানে তুলছিল, তখনই আমার সমস্ত আত্মবিশ্বাস লোপ পায়। তারপর আর পারমিতার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারিনি। আজ যদি পারমিতা জানতে পারে, সেদিন ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে না যেতে পারার আসল কারণ, আমাকে ক্ষমা করে দেবে, না কি ফেরত চাইবে ওর জীবনের অপচয় হয়ে যাওয়া এত ক'টা বছর? যদি ক্ষমা করে বড় ভাল হয়। বুকে আটকে থাকা পাথরটা ক্রমশ ভারী হচ্ছে... এতক্ষণ কথা বলে যাওয়ার পর অনীশের হঠাৎ মনে পড়ে অনেক পুরনো একটা জিজ্ঞাসার কথা। সেটা এই সুযোগে জেনে নেওয়া যায় বাবার কাছে, আচ্ছা বাবা, সেদিন যে ছাপোষা ভদ্রলোক আপনার অ্যাক্সিডেন্টের খবর আমায় দিয়েছিলেন, যিনি হয়তো পরে আপনার সৎকারের ব্যবস্থা করেন, তিনি কে? আপনার বন্ধু?

উত্তর পায় না অনীশ। তার বদলে অন্য একটি কণ্ঠ তাকে বলে, ও দাদা, আপনি তো শোভাবাজার নামবেন। এসে গেছে প্ল্যাটফর্ম।

চোখ খোলে অনীশ। হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে কখন যেন চোখ বুজে ফেলেছে। পাশের লোকটি নিশ্চয়ই নিত্য যাত্রী। লক্ষ করেছেন অনীশ রোজ শোভাবাজারে নামে।

প্ল্যাটফর্মে নেমে শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগে অনীশের। এক সঙ্গে এত কথা বলতে পেরে বুকটা একটু হালকা হয়েছে। বিচার, বুদ্ধি, সাহস ফিরে পাচ্ছে ক্রমশ। এখন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ধীরে সুস্থে নেওয়া যায়। তার আগে একটা ছোট্ট কাজ বাকি আছে, আজ বটতলা গলি দিয়ে বাড়ি ফিরবে সে। ওই গলির মধ্যেই পড়ে আছে তার কুড়ি বছর আগেকার থেঁতলানো অহংকার। প্রচণ্ড মার খাওয়ার পর অনীশের ব্যক্তিত্বটাই বদলে গিয়েছিল। আগের অনীশকে তুলে আনতে হবে ওখান থেকে।

সারা বাড়ি তোলপাড় করেও পারমিতা বইটা পেল না। অথচ ভাল করেই মনে আছে, কলেজ স্ট্রিট থেকে অনীশের বইয়ের সঙ্গে তিনটে বই কিনে নিজের ঘরের বুক শেলফে রেখেছিল। বাকি তিনটে বই আছে, অনীশেরটাই নেই। কে নিতে পারে? সলিল না বলে পারমিতার কোনও জিনিসে হাত দেবে না। তারা দু'জন বলতে বাড়িতে আর কেউ নেই। কাজের মেয়েটা নিশ্চয়ই নেবে না। বিশেষ করে অনীশের বইটাই বা হারাবে কেন? খুঁজতে খুঁজতে ভীষণ পাজল্ড পারমিতা। সলিল কি পারমিতার চোখের সামনে থেকে বইটা সরিয়ে ফেলার মতো ছেলেমানুষি করবে? বোধহয় না। তা ছাড়া অনীশকে আদৌ সলিল চেনে কি না, এ ব্যাপারেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বিয়ের আগে পারমিতার যে একটা সম্পর্ক ছিল, সলিল হাড়েহাড়ে তা জানে, কিন্তু তার নাম যে অনীশ, সেটা সম্ভবত জানে না। আবার জানতেও পারে, মুখ ফুটে কোনও দিন বলেনি। কিন্তু সলিল বইটা নিয়ে কী করবে! পায়ে পায়ে ডাইনিং স্পেসে যায় পারমিতা।

টিভি বন্ধ করে।

কম্পিউটারে কাজ করছে সলিল।

তুমি কোনও বই নিয়েছ আমার ঘর থেকে? সরাসরি জানতে চায় পারমিতা?

চোখ থেকে রিডিং গ্লাস নামিয়ে সলিল ঘুরে তাকায়। বলে, কী বই?

অনীশ চট্টোপাধ্যায়েব একটা উপন্যাস।

না তো। তোমার কোনও বই আমি নিইনি।

সলিলের এক্সপ্রেশন ভাল করে পড়ার চেষ্টা করে পারমিতা। সলিল কি অভিনয় করছে? তারপর বলে, বইটা সেদিনই কিনলাম. পাচ্ছি না কেন বলো তো?

আবার কম্পিউটারের দিকে ঘুরে যায় সলিল। বলে, দেখো, তুমিই হয়তো যত্ন করে কোথাও রেখেছ, এখন খুঁজে পাচ্ছ না।

'যত্ন করে' কথাটায় খটকা লাগে পারমিতার। খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলে, তুমি কি অনীশ চট্টোপাধ্যায়কে চেন?

কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে সলিল। বলে, এখনকার দু'-চার জন বড় রাইটার ছাড়া, বাংলার লেখকদের আমি তেমন চিনি না।

অধৈর্য কণ্ঠে পারমিতা বলে ওঠে, বইটা তা হলে কে নেবে? আমি, তুমি ছাড়া বাড়িতে কেউ নেই।

ছিল। বইটা কিনে নিয়ে আসার পর আহেলি শান্তিনিকেতনে গেছে। ওকে ফোন করে জিজ্ঞেস করতে পার।

বুক ফাঁকা হয়ে যায় পারমিতার। ভীষণ নার্ভাস লাগতে শুরু করে। আহেলি তার মানে কিছু টের পেয়েছে, বেছে বেছে নিয়ে গেছে অনীশের বইটাই। কে আহেলিকে অনীশের খবরটা দিল? গভীর ষড়যন্ত্রের গন্ধ পায় পারমিতা। বিয়ের পর থেকে সলিলকে সে বুঝিয়ে এসেছে, পারমিতা তার নয়। অন্য কারওর। মিথ্যের এই মোড়কটা এ বার ছিঁড়ে ফেলবে আহেলি। একবার যদি কোনও ভাবে অনীশের কাছে আহেলি পৌঁছে যায়, সব সত্য প্রকাশ হয়ে যাবে। এই ষড়যন্ত্রের পিছনে সলিলের মাথাই কাজ করছে। ও অনেক দিন আগেই চিহ্নিত করেছে অনীশকে, এখন মেয়েকে উসকে দিয়েছে সত্য প্রকাশের জন্য। এ ভাবেই সমস্ত অপমানের শোধ তুলবে সলিল। এই সব নোংরামির মধ্যে কিছুতেই ঢুকতে চাইবে না অনীশ। যদি বা একটু সাড়া দিয়েছিল, আবার সরে যাবে দূরে। প্রবল নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে পারমিতা। এত দিনের সংরক্ষিত ভালবাসা কি নষ্ট হয়ে যাবে। পারমিতার কানে বাজতে থাকে মিটার গেজ লাইনের ইঞ্জিনের সিটি। ট্রেনটা টাল খাচ্ছে, উঁচু-নিচু রেল লাইন। যে কোনও মুহূর্তে ট্রেন লাইনচ্যুত হতে পারে।

টলতে টলতে নিজের ঘরে আসে পারমিতা। এক্ষুনি একটা ফোন করতে ইচ্ছে করে অনীশকে। ওকে বলবে, প্লিজ অনীশ, তোমাকে যদি আহেলি ফোন করে, কিছু কথা যদি যাচাই করে নিতে চায়, সব কথায় হ্যাঁ করবে। জানবে, ও যা কিছু তোমার কাছে জানতে চাইছে, সব কিছু আমার তৈরি করা মিথ্যে। আমি চিরকাল তোমার হয়ে থাকার জন্যই মিথ্যেগুলো বানিয়েছি। সলিল আর আমার মাঝে আহেলিকেই আমি দেওয়াল হিসেবে ব্যবহার করে এসেছি এত দিন, যে কোনও ভাবে হোক মেয়ে সেটা টের পেয়েছে। এ বার ও বঞ্চনার হিসেব চাইবে। এসব কথা শুনে অনীশ যদি বলে, আমি তোমাদের ফ্যামেলি ম্যাটারে নেই। আমাদের দু'জনের আলাদা দুটো জীবন। যে যার জীবন নিয়ে থাকাই ভাল। তখন অনীশকে কী করে বোঝাবে পারমিতা, বিরহ বা মিলন যাই হোক, তার জীবন অনীশের সঙ্গেই জোড়া। এসব কথা ফোনে বোঝানো যায় না। খুব তাড়াতাড়ি অনীশের সঙ্গে

দেখা হওয়া দরকার। আহেলি ওর কাছে পৌঁছনোর আগেই। —এত দূর ভাবার পর পারমিতার মনে হয়, সে হয়তো অযথাই চিন্তা করছে, আহেলি বইটা নিয়ে যায়নি। শান্তিনিকেতনে ফোন করে এক্ষুনি জেনে নেওয়া যায় বইটা সত্যিই সে নিয়ে গেছে কি না?

বেডসাইড টেবিল থেকে ফোনসেটটা বিছানায় নিয়ে আসে পারমিতা। ডায়াল করে। ও প্রান্তে জেঠিমার 'হ্যালো'টা অন্য রকম লাগে। তবে অচেনা নয়। পারমিতা বলে, আহেলি ফিরেছে ফাংশন থেকে?

আহেলি কে? ও প্রান্তের কণ্ঠে বিস্ময়।

অন্য কেউ ধরেছে হয়তো, আমি পারমিতা বলছি, জেঠিমা আছেন?

আপনি কত নাম্বার খুঁজছেন?

একটু থমকায় পারমিতা। সে কি ভুল নাম্বার ডায়াল করল? তা কী করে হবে! পারমিতা উলটে জানতে চায়, এটা কি গুরুপল্লীর সোমনাথ দাশগুপ্তের বাড়ি?

না। রং নাম্বার। এটা শোভাবাজার।

ঝট করে রিসিভার নামিয়ে দেয় পারমিতা। ও প্রান্তের গলাটা সে চিনতে পেরেছে, অনীশের বউয়ের গলা। এ রকম একটা ভুল করে ফেলল! নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাচ্ছে। সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ? হাঁটুতে মুখ গুঁজে গুঙিয়ে ওঠে পারমিতা।

কম্পিউটারের সামনে বসে পারমিতার কান্না শুনতে পায় সলিল। চাপা কান্না। প্রকাশ্যে কখনও কাঁদে না পারমিতা। বইটা তার মানে খুঁজে পায়নি। সলিল নিশ্চিত, বইটা মেয়েই নিয়ে গেছে। মেয়ে খুঁজে পেয়েছে পারমিতার দুর্বলতম জায়গাটা। এ ব্যাপারে সলিল কিন্তু আহেলিকে কোনও হেল্প করেনি। জানত, এটা অবশ্যম্ভাবী, ঘটবেই একদিন। মেয়েই জবাব চাইবে মায়ের কাছে, কেন তুমি আমাদের সংসারের হয়েও, আমাদের নও?

সলিলের একটা বিস্ময় কিছুতেই কাটতে চায় না, আধুনিকতায় লাঞ্ছিত পৃথিবীতে এখনও এ রকম হয়! বিয়ের এত ক'টা বছর পরও পারমিতা মনটা দিয়ে রেখেছে অন্যজনকে। পারমিতার মধ্যে কি কোনও ইন্স্যানিটি আছে? নির্ঘাত আছে, শরীর আর মনটাকে আলাদা করতে পেরেছে পারমিতা। এ বিষয়ে কোনও সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে আলোচনার কথাও ভেবেছিল সলিল। কিন্তু কী লাভ হত তাতে, পারমিতাকে তো নিজের করে পাওয়া যেত না। অনীশই পারমিতার ধ্যান, জ্ঞান, অবসেশন। ছেলেটার কথা মনে পড়লেই, আজও হাতের তালুটা জ্বালা জ্বালা

করে ওঠে সলিলের। জীবনে সে একজনকেই সত্যিকারের ঠেঙিয়েছে, হয়তো মেরেও ফেলত, যদি না সরিয়ে নিত ছোটবেলার বন্ধু বীরেন।

দিল্লিতে সংসার পাতার পরই সলিলের কেমন জানি খটকা লাগতে শুরু করে, পারমিতার আচরণে অদ্ভুত এক নির্বিকার যান্ত্রিকতা। সব কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে থেকেও যেন নেই। প্রথম দিকে মনে হয়েছিল, নতুন নতুন তো, একটু টাইম লাগবে সংসারে মন বসাতে। কিন্তু শারীরিক সম্পর্কেও ওকে উদাসীন দেখে, সবার মতো সেই সন্দেহটাই প্রথমে মনে আসে, নিশ্চয়ই ওর কোনও প্রেমিক ছিল, ভুলতে পারছে না। গোপনে পারমিতার গতিবিধির ওপর নজর রেখেছিল সলিল. না, কাউকে ফোন করে না, চিঠিও না। কোনও লুকোনো ডায়রিও ছিল না পারমিতার। তা হলে কি ও কামশীতল, ফ্রিজিড? যখনই শরীরী খেলায় মেতেছে সলিল, চোখ বুজে নিয়েছে পারমিতা। ওর ওই অপার নগ্ন সৌন্দর্যের সামনে মোহিত হয়ে থাকা সলিলের বার বার মনে হয়েছে, এ তো আমার নয়, অন্য কারওর। —এ সব দ্বিধা সংশয়ের মধ্যেই খুব তাড়াতাড়ি আহেলি ওর পেটে এল। তখনই বোমাটা ফাটাল পারমিতা। নাম-ঠিকানা না বলে, জানিয়ে দিল অনীশের অস্তিত্ব। এ কথাও বলে দিল, সে কোনও দিনও সলিলের হতে পারবে না। তাতে যদি সলিল মনে করে ডিভোর্স করবে, করতে পারে।

এ ভাবে হেরে যাওয়াটা সলিল মেনে নিতে পারেনি। গুম মেরে যায়। দু'-চার দিন পরেই ট্যুরের নাম করে কলকাতায় চলে আসে। সল্ট লেকে না গিয়ে, বীরেনের বাড়িতে ওঠে। বাল্যবন্ধুকে একটা কথা বাদ দিয়ে, বাকি সব খুলে বলে। বীরেন চিরকালই ডানপিটে। বড় হতে ডাকসাইটে হয়েছে। বলেছিল, প্রথমে ছেলেটার নাম-ঠিকানা বার করতে হবে। তোর বউয়ের কোনও বান্ধবীকে ধরলেই সেটা পেতে অসুবিধে হবে না। তারপর ছেলেটাকে প্রচণ্ড প্যাঁদালে, দেখবি কোনও দিন তোর বউয়ের ত্রিসীমানায় ভিড়বে না।

সলিল বলেছিল, ছেলেটা তো ভিড়ছে না, পারমিতাই...

কথা কেড়ে নিয়ে বীরেন বলেছিল, আজ ভিড়ছে না, কাল ভিড়বে। তখন তো তোর অপমানের এক শেষ। তার থেকে চল, আমার হাতে কিছু গাড়ল গুন্ডা আছে, তাদের নিয়ে যাই, ছেলেটাকে এমন শিক্ষা দিই, যাতে সে নিজেই তোর বউকে বলে, আমার নাম এনো না মুখে।

প্রস্তাবটা কতটা যুক্তিযুক্ত ভেবে দেখার মতো মনের পরিস্থিতি ছিল না সলিলের। মাথায় তখন অন্ধ আক্রোশ। বিনা দোষে কেন আমাকে এই অপমান মেনে নিতে হবে?

সহজেই অনীশকে শনাক্ত করা গেল। প্ল্যান মাফিক দুই গুন্ডা, বীরেন আর সলিল দাঁড়িয়ে রইল শোভাবাজারের এক গলিতে। ওই গলি ধরেই অফিস থেকে ফেরে অনীশ। সলিল তখনও অনীশকে চাক্ষুষ করেনি, বীরেন সব চিনে রেখেছিল। নির্দিষ্ট সময় গলি ধরে যে ছেলেটি এগিয়ে আসছিল, অত্যন্ত সুপুরুষ, হাঁটায় কী রকম যেন নিস্তেজ অসহায় ভাব। একটু যেন অন্যমনস্ক। সব মিলিয়ে ছেলেটি যে ভীষণ আকর্ষণীয় এতে কোনও সন্দেহ নেই। —হাঁটতে হাঁটতে গলির মাঝখানে পৌঁছে গিয়েছিল অনীশ। বীরেন ইশারা করতেই দুই শাগরেদ ঝাঁপিয়ে পড়ল অনীশের ওপর। সামান্য দুটো পাঞ্চ আর কয়েকটা এলোপাথাড়ি লাথিতেই জমি নিল অনীশ। আত্মরক্ষার কোনও চেষ্টাই করল না। দুই গুন্ডা হাত ঝেড়ে ফিরে আসছে, বীরেন বলল, যা, বলে আয়, কেন মার খেল।

ঘটনাটার মধ্যে ভায়োলেন্স এত কম ছিল যে, সলিলের ঠিক পোষাচ্ছিল না। ল্যাম্পপোস্টের নীচে পড়ে থাকা অনীশের দিকে ছুটে যায়। কলার ধরে মুখটা নিজের দিকে ঘোরাতেই দেখতে পায়, ভায়োলেন্সের নিঃশব্দ প্রমাণ, অনীশের ভ্রূ কেটে গিয়ে রক্ত নেমে আসছে। ওই অবস্থাতেই চোখ খুলে সলিলকে দেখছিল সে, দৃষ্টিতে কোনও ভয় ছিল না, চরম বিষাদ মাখা এক উদাসীনতা ছিল। যেন এই পৃথিবী, এখানকার মানুষদের সে ঘেন্না করছে। যতই তাকে কাদায় টেনে আনা হোক, ক্লেদ তাকে স্পর্শ করছে না। এই গড ইমেজটা আরও খেপিয়ে তুলল সলিলকে, শালা সলিলের জীবনটাকে নষ্ট করে, এখানে ভগবান সেজে মার খাচ্ছে! প্রবল আক্রোশে চড় মারে সলিল। একবার নয়, বার বার। পাগলের মতো বলতে থাকে, কোনও দিন আর ছায়া মাড়াবি না পারমিতার... মারতে মারতে হুঁশ ছিল না। বীরেন এসে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। বলে, চল, অনেক হয়েছে। লোকজন জমা হয়ে যাবে। ...হাতের তালু তখন জ্বালা জ্বালা করছে সলিলের, প্রতি বারই চড় মারার সময় তার মনে হচ্ছিল, আঘাতটা পৌঁছে যাচ্ছে সরাসরি অনীশের হার্টে। যেখানে মান, অভিমান, অপমান থাকে। গালটা ভীষণ নরম ছিল অনীশের, আজও মনে পড়লে সলিলের হাতটা ভীষণ জ্বালা জ্বালা করে। জীবনে ওই এক বারই সে কাউকে মেরেছিল।

এখনও পারমিতার গোঁঙানির শব্দ ভেসে আসছে। সলিলের কিছু করার নেই! নিজের বউ কাঁদছে, দুটো সান্ত্বনার কথাও বলা যাবে না। তা হলেই পারমিতা বুঝতে পারবে, সলিল সব জানে। শামুকের মতো যে খোলসটা পারমিতা পিঠে বয়ে বেড়াচ্ছে, যদি জানে, তার অন্ধকার অনেকটা ভেদ করে ফেলেছে সলিল, কোথায় আশ্রয় নেবে পারমিতা? কোনও ভাবেই পারমিতাকে খোয়াতে চায় না

সলিল। তা হলেই সলিলের হার। একটা ভুল আঁকড়ে থাকলেও, পারমিতা তো তার কাছেই আছে। সলিলের স্থির বিশ্বাস, ঘোর এক দিন ভাঙবেই পারমিতার। দেখবে, অনীশ দিব্যি সব ভুলে গিয়ে সংসারধর্ম করছে আর পারমিতা অপচয় করল এত ক'টা বছর! এই উপলব্ধিতে পারমিতা যাতে তাড়াতাড়ি পৌঁছয়, সেই কারণেই কলকাতা ফেরা সলিলের। এই সময় অনেক ঘাত প্রতিঘাত আসবে। এটাই নাটকের ক্লাইম্যাক্স। যে পারমিতা কখনও ভেঙে পড়ে না, সেই কাঁদবে। ফিরে আসতে হবে অনীশের দোরগোড়া থেকে। তখনই পারমিতার চোখে পড়বে সলিলের তপশ্চরণ। বুঝতে পারবে প্রেমিক হিসেবে সলিল অনেক বেশি উপযুক্ত। দেরি করে হলেও সলিলকে স্বামীর মর্যাদা দেবে। সেই সময় ছোট্ট একটা কাজ সেরে নেবে সলিল, যাবে অনীশের কাছে ক্ষমা চাইতে। বলবে, ওই এক বারই আমি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তোমাকে মেরেছিলাম। সেই জ্বালা আজও আমার হাতে রয়ে গেছে। আমার নিরলস তপস্যার একমাত্র পদস্খলন। আমায় মার্জনা করো। —অনীশ হেসে বলবে, সে সব আমি কবেই ভুলে গেছি। রাগ পুষে রেখে স্বাভাবিক জীবন থেকে বঞ্চিত হওয়ার কোনও মানেই হয় না। —অর্থাৎ তিন চরিত্রের শান্তি সহাবস্থান। কাল্পনিক প্রেমে বিভোর পারমিতা বুঝতে পারবে এত দিন কী ভুলটাই না করেছিল! এ পৃথিবীতে 'প্রেম' বলে কিছু হয় না। যা হয়, সেটা ছোট ছোট ভালবাসা। বন্ধুত্বের পরতে পরতে, সংসার যাপনের অদৃশ্য বাঁকে চকিতে দেখা যায় ভালবাসার মনোহর রূপ। বয়ঃসন্ধির মোহ-ঘোরের যে প্রেম, তা অবাস্তব, অচল। এই উপলব্ধিতে পারমিতাকে নিয়ে যাবে সলিল, এটাই তার চ্যালেঞ্জ। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, তিন চরিত্রের এই টানা-পোড়েনের মাঝে কখন যেন বড় হয়ে গেছে আহেলি। বাবা-মায়ের অস্বাভাবিক সম্পর্কের ছায়া পড়েছে ওর ওপর। আর পাঁচটা মেয়ের তুলনায় আহেলির আচার-আচরণ একটু অন্য রকম। নিজের অবস্থান নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভোগে। কার পক্ষ নেবে, কে বেশি ভাল, বাবা না মা? সলিলের ইদানীং এই একটা আশঙ্কাই হচ্ছে, আহেলি জোর করে হয়তো ঘুম ভাঙাতে চাইবে পারমিতার। বিশেষ করে যখন সলিলের কোনও সাহায্য ছাড়াই সে অনীশকে শনাক্ত করেছে। মা-কে না জানিয়ে বইটা নিয়ে চলে গেছে শান্তিনিকেতনে। বিপদ আসন্ন। পারমিতার মনের বন্ধ দরজায় কড়া নাড়ছে আহেলি। বিপন্ন পারমিতা তাই কাঁদছে, কতক্ষণ আর নিজের মেয়েকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা যায়...কখন যেন পায়ে পায়ে পারমিতার ঘরে চলে এসেছে সলিল। বিছানায় বসে, হাঁটুতে মুখ গুঁজে এখনও ফুলে ফুলে কেঁদে যাচ্ছে পারমিতা। সলিল ওর মাথায় নিজের হাতটা রাখে। ভাষাহীন সান্ত্বনা। এ ছাড়া আর কিই বা করার

আছে সলিলের! আর আশ্চর্য, এই সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যায়, পারমিতাও যেন অপেক্ষা করছিল সলিলের এই আশ্বাস স্পর্শের, সলিলের করতল টেনে নিয়ে নিজের ভেজা গালে রাখে। যেন টের পেয়েছে সলিলের হাতের জ্বালা। সলিল মনে মনে বলে, জ্বলন্ত ট্রয় কি তোমার ওই সামান্য অশ্রুপাতে নিভবে রানি!

ঈষৎ টালমাটাল পায়ে বটতলা গলিতে আজ নির্দ্বিধায় ঢুকে পড়ে অনীশ। সেদিনের মতো আজকেও গলিতে পথচারী নেই। কুড়ি বছর আগের সেই সব আততায়ীদের থাকার কথা নয়। তবে আজ সন্ধের গলি তুলনায় আলোকিত। ল্যাম্পপোস্টের আলো জ্বলছে। দূর থেকেই অনীশ দেখতে পায়, এখনও সেখানে পড়ে আছে বাইশ বছরের অনীশ। বিয়াল্লিশের অনীশ ধীর পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ায় লাইটপোস্টের নীচে। মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা ছেলেটাকে ডাকে, উঠে এসো আমার বাইশ বছর।

ভ্রূ-কাটা রক্তাক্ত চোখে বাইশের অনীশ মুখ তুলে তাকায়। বিয়াল্লিশের অনীশ বলে, তোমাকে নিতে এসেছি, আর কত দিন পড়ে থাকবে এখানে! এত অপমান সহ্য করে তুমি আমায় এ কী জীবন দিলে! সেই তো কর্তব্যপরায়ণ স্বামী, মাতৃবৎসল পুত্র, সন্তানবৎসল পিতা ছাড়া আর কিছুই হতে দিতে পারোনি। তার থেকে কি আগের জীবন ভাল ছিল না? বেপাড়ার ছেলেরা তোমাকে ফুটবল টিমে খেপ খেলতে নিয়ে যেত, ভাল খেলার জন্য নয়, বিনা ফাউলে অপন্যান্ট প্লেয়ারকে ধরাশায়ী করার জন্য। কোনও দল ছিল না তোমার। অথচ সবাই সমীহ করত। নেশার ট্যাবলেট বিক্রি করত প্রমোদ মেডিক্যাল শপ, তাদের টোটাল স্টক রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছিলে তুমি। ইভটিজার প্যাঁদানো তোমার প্রিয় শখ ছিল। ডাকাবুকো বলেই তোমাকে জানত সবাই। মস্তান বা দাদা নামের তকমা তোমার গায়ে সেঁটে দেয়নি পাড়ার লোক। এতটাই তাদের আপনার জন ছিলে। সেই তুমি বাবার মৃত্যু আর পারমিতার সঙ্গে বিচ্ছেদে একদম গুটিয়ে গেলে, সেদিন যে দু'জন গুন্ডা তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, অন্য সময়ে অনায়াসে মোকাবিলা করতে পারতে। আবার একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে, এই আশঙ্কায় মার খেয়ে গেলে। দুই বীরপুঙ্গব চলে যাওয়ার পর আর একজন এসে তোমার গলা টিপে ধরেছিল, সেই মানুষটাই সম্ভবত পারমিতার স্বামী। কী ভীষণ নিরুপায় আক্রোশ ফুটে উঠেছিল লোকটার মুখে। আনতাবড়ি হাত চালাচ্ছিল। বোঝাই যাচ্ছিল, মারপিট করার অভ্যেস তার নেই। চেহারায় মেধাবী ছাত্রের ছাপ। স্বাচ্ছন্দ্য, সফলতায় লালিত পুরুষটি অজান্তে পারমিতাকে বিয়ে করে বিচ্ছিরি ভাবে পর্যুদস্ত হয়েছে।

সমস্ত রাগ গিয়ে পড়েছিল তোমার ওপর। তোমার প্রেয়সীকে বিয়ে করে, সে তোমাকেই পিটিয়ে গেল। হজম করে গেলে তুমি। আসলে সুইসাইডে ফেল হয়ে যাওয়ার পর থেকেই তুমি লগ্নভ্রষ্টার মতো কুণ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলে। এক সময় নিজের জীবনকে হাতের তালুতে রেখে চালনা করতে, সেই তুমি যখন আমিতে রূপান্তরিত হলাম, এখন জীবনই আমাকে চালনা করে।। আমার এখন আর কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। আর পাঁচটা গৃহপালিত মানুষের মতোই অপূর্ণ অনেক স্বাদ নিয়ে আমি এক দিন মারা যাব। আর কোনও দিন পারব না পকেটে মাত্র দশ টাকা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে দিঘায় বেরিয়ে যেতে। এখনও মনে পড়ে সেই সব মৎস্যজীবীদের কথা, যারা সাত সাতটা দিন সাগরপারে তাদের তাঁবুতে আশ্রয় দিয়েছিল। খাইয়েছিল সাত দিন ধরে দু'বেলা। এক রাতে মেনু ছিল শুধুই মিল্কমেডের পায়েস। জেলেদের কোনও একজনের জন্মদিন ছিল সেদিন। কালো সমুদ্রের মাথায় টলটলে চাঁদ। ছোট ছোট ঢেউগুলো যেন সমুদ্রবালিকা, চাঁদের আলোর মুকুট পরে মানুষের জন্মের আগে থেকে ধেয়ে আসছে। বাতাসে নোনা স্বাদ। জেলেদের তাঁবুতে বসে টেমির আলোয় তোমরা হাপুস হুপুস করে পায়েস খাচ্ছ, সে এক বিরল অভিজ্ঞতা। প্রকৃতির পবিত্রতায় বসে মানুষের সঙ্গে গভীর এক আত্মীয়তা তৈরি হচ্ছিল। ব্যাপ্ত হয়েছিল জীবন-অঙ্গন। মনে আছে, এক দিন হঠাৎ পারমিতাকে নিয়ে চলে গেলে তোমাদের দেশের বাড়ি বাণেশ্বরপুরে। ব্যাপারটা খুব ঝুঁকির ছিল, রাত্তিরে স্টে করা চলবে না। দিনের দিন ফিরতে হবে। সেই মতো বাড়িতে বলে বেরিয়েছিল পারমিতা। বাণেশ্বরপুরের নিসর্গ ওই একটা বেলায় নানা সাজে, বিভঙ্গে দেখা দিয়েছিল তোমাদের সামনে। বিকেলের দিকে হঠাৎ খুব মেঘ করে এল। মাটির দোতলার ঘরের জানলা দিয়ে তোমরা দেখলে, মেঘটা শুধু তোমাদের গ্রামের মাথাতেই জড়ো হয়েছে, দূরের আকাশ মোটামুটি পরিষ্কার। সূর্যদেব পাটে বসছেন সেখানে। বৃষ্টি শুরু হল ছোট্ট একটু অঞ্চল জুড়ে। টিনের চালে ফুটল তবলার বোল, ত্রিতাল, ঝাঁপতাল। দিগন্ত থেকে ছিটকে আসা গোধূলির আলো তোমাদের গ্রামের বৃষ্টিকে রামধনু রঙে রাঙালো। ওই মোহময় রূপে আচ্ছন্ন হয়ে পারমিতা অবশেষে রাজি হয়, তোমাদের ওপরতলার ঘরে সে গাছের মতো সরল ভঙ্গিতে নিরাবরণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেন বৃষ্টির ছাট বাঁচাতে ঘরে ঢুকে পড়েছে। ওর শরীরে তখন অজস্র রুদ্রপলাশ। তুমি মন্ত্রমুগ্ধ, স্থবির। জানলা দিয়ে পারমিতার রূপ দেখে সূর্যদেবও ম্লান হয়ে গেলেন। নিভে গেল সব রামধনু। পারমিতা আবৃত করল নিজেকে। এর থেকে বেশি নয়। কেন না শর্ত ছিল এইটুকুই। তুমি তোমার প্রেমিকাকে এক মুহূর্তের জন্য আবরণহীন দেখতে চেয়েছিলে।

জীবনের প্রতিটি ঝুঁকির বদলে তুমি পেয়েছ বিশালতার ছোঁয়া, গভীর এক বিস্ময় বোধের আস্বাদ। জীবনের থেকে পাওয়া সামান্য কিছু আঘাতে তুমি পড়ে রইলে এখানে, আমাকে পাঠালে নিরাপত্তার বলয় তৈরি করতে। মূল্যবান অনেক বছর অপচয় হয়ে গেল সেখানে। মরে গেল বিস্ময় বোধ। আর কোনও কিছুতেই অবাক হই না আমি। বিস্ময় বোধ নষ্ট হয়ে গেলে মানুষ কী নিয়ে বাঁচবে বলো? তুমি উঠে এসো বাইশের অনীশ। আমরা আবার নতুন করে জীবন শুরু করি। খুঁজে নিই মুক্তির স্বাদ। ধরা যাক প্রতিশোধ নিয়েই শুরু করব নতুন জীবন। যারা সেদিন তোমাকে মেরেছিল, তারা নিশ্চয়ই এখন ঘোর সংসারী, দুই, তিন সন্তানের বাবা। হঠাৎ একজনের সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে গেল বাসে। তুমি বাস থেকে নামিয়ে, তাকে বেধড়ক পেটালে। সে তোমায় চিনতেই পারল না। তারপর কোনও একদিন দেখলে, পারমিতার স্বামী গাড়ি চালিয়ে আসছে, আচমকা ইট ছুড়ে তুমি ভেঙে দিলে উইন্ড স্ক্রিন। ঘটনার আকস্মিকতায় মানুষটি তখন দিশেহারা। কিন্তু এটুকু বুঝতে পারে। কোনও এক অজ্ঞাত অপরাধের শাস্তি পেল। এই সব প্রতিশোধের মধ্যেই তুমি মুক্তির স্বাদ পাবে। ফিরে আসবে আত্মবিশ্বাস। ... বিয়াল্লিশের অনীশ অনেকটাই কনভিন্স করে ফেলেছে বাইশের অনীশকে। উঠে বসেছে যুবক অনীশ। অস্ফুটে কী যেন বলছে। কথাগুলো শুনতে না পেলেও, মর্মার্থে পৌঁছে যায় বিয়াল্লিশের অনীশ। যুবক অনীশ বলছে, তুমি যে জীবনের ক্ষুদ্রতা থেকে বেরিয়ে আসতে লেখা শুরু করলে, তার কী হল। সেখান থেকেও তো মুক্তির স্বাদ পেতে পারতে। লোকজন তো ভালই বলছে তোমার লেখা।

সঙ্গে সঙ্গে কথাটার বিরুদ্ধাচরণ করে এখনকার অনীশ। বলে, বাজে কথা। ভুল চেষ্টা। সংসারের লক্ষ্মণরেখা ডিঙোতে আমি লেখালিখিতে গিয়েছি ঠিকই, কিন্তু সেখানে দেখি আর এক জাঁতাকল। সমাজের গ্রাহ্য মূল্যবোধ নিয়েই আমাকে লিখতে হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণি ব্যাপারটা ভাল খায়। আত্মসমীক্ষা, নিজের অপরাধ স্বীকার করা বাঙালির প্রিয় বিনোদন। সিরিয়াস মুখে সেখানটায় সুড়সুড়ি দিই আমি। প্রশংসা পাই। আবার বানাতে বসি পাঠক, দর্শকদের মনোমতো নাটক, গল্প, উপন্যাস, আটকে পড়ি আর একটু বড় গণ্ডিতে।

বাইশের অনীশ উঠে দাঁড়িয়েছে। কাঁধ বাড়িয়ে দেয় বিয়াল্লিশ। ওরা এক সঙ্গে কিছু দূর হেঁটে যেতেই, এক হয়ে যায়। এই অলীক মিলনের সাক্ষী থাকে প্রাচীন ল্যাম্পপোস্ট।

নিজেদের পোর্সানের সদরে পৌঁছয় অনীশ। এখানটায় বেশ অন্ধকার। স্ট্রিটলাইট না জ্বললে পূর্ণিমার দিনেও সরু গলিটা অন্ধকার থাকে। দরজায় হাত

দিতে, খুলে যায়। অনীশ ফিরবে বলে এই সময়টা ছিটকিনি তোলা থাকে না। চৌকাঠ ডিঙোতে কেমন যেন ভয় ভয় লাগে অনীশের, সদরের পরেই যেন সংসারের গভীর গর্ত।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তারস্বরে চেঁচাতে থাকে অনীশ, সুতপা! সুতপা! বিল্টুকে এক বার পাঠিয়ে দাও। আমি বাড়ি ফিরেছি, কিন্তু এই গর্তটা কিছুতেই ডিঙোতে পারছি না। ডায়লগটা নিজের কানেই খুব চেনা চেনা ঠেকে। ওরা কেউ আসছে না কেন! শুনতে পাচ্ছে না! না কি শুনেও আসছে না। সেদিন যেমন মায়ের চোখ রাঙানির জন্য বাবার ডাকে সাড়া দিতে পারেনি অনীশ, অনু।

বাবার বাকি ডায়লগগুলো মনে করার চেষ্টা করে অনীশ। খাপছাড়া ভাবে মনে পড়ে, সেই সব কথাগুলো চেঁচিয়ে বলতে থাকে, আরে বাবা, আমাকে নিতে আসতে যদি লজ্জা করে, তা হলে অন্তত আলো-ফালো দেখাও, এখানটা যে বড্ড অন্ধকার।

কেউ আসে না। এমনকী কাকা, জ্যাঠার পোর্সানের আলোগুলোও চোখ পিটপিট করছে না কৌতূহলে। কেমন জানি সন্দেহ হয় অনীশের, কোথাও একটা গন্ডগোল হচ্ছে। নিজের চিৎকারে কান পাতে এবং বুঝতে পারে, সে আসলে মোটেই চিৎকার করছে না। বিড়বিড় করছে মাত্র। বাবার সেই দাপট তার মধ্যে নেই।

বিভ্রম কাটিয়ে চৌকাঠ পার হয় অনীশ। চিলতে বাগানে নয়নতারা ফুটেছে। এদিক ওদিক ছড়ানো ছিট কাপড়ের মতো জ্যোৎস্নার আলো। ভেতর বাড়ি থেকে ভেসে আসছে বিল্টুর গলা। সুতপার প্রশ্রয় মেশানো ধমকানি। কলিং বেলে হাত রাখে অনীশ। সংসারের যন্ত্র-পাখিটা জানায় বাড়ির কর্তা ফিরেছে।

মিনিট দশেক সাংসারিক আবহের মধ্যে থাকতে থাকতে অনীশের ভেতরে উথলে ওঠা বিদ্রোহ ক্রমে বিলীন হতে থাকে। রেশ হিসেবে একটু যেন স্মার্ট আর সংশয়হীন সে এখন। দোতলার ঘরে উঠে পকেট থেকে পেন, কাগজপত্তর টেবিলে রাখতে রাখতে সুতপাকে জিজ্ঞেস করে, সেই ফোনটা আর এসেছিল?

বিছানার চাদর টান করছিল সুতপা। না একটা মিস কল এসেছিল।

তবু যেন নিশ্চিন্ত হয় না অনীশ। বলে, কে, কাকে চাইছিল? পারমিতা না, কী যেন নাম। আহেলি ফিরেছে কিনা জিজ্ঞেস করল।

মুহূর্তে শিরদাঁড়া বেয়ে খেলে গেল ভয়। চোখ কুঁচকে অনীশ তাকায় সুতপার দিকে। নিজের কাজেই ব্যস্ত সুতপা। অনীশ না বললেও পারমিতার প্রসঙ্গ কি সুতপা

শোনেনি? নিশ্চয়ই শুনেছে। চ্যাটার্জিবাড়ির কেউ না কেউ গল্পের ছলে বলেছে ওকে। সেই পারমিতাই যে এই ফোনের মেয়েটা, এটা আন্দাজ করতে পারছে না।

ভয়ে ভয়ে ফোনসেটটার দিকে তাকায় অনীশ। গুটলি পাকানো সাপ মনে হয়। বেহুলার বাসর অবশেষে ভেদ করে ফেলেছে। এখন আর ফোনের ওপারে নীরব থাকছে না সুতপার কাছে। ছলনা করে হলেও, নিজের নাম বলে দিয়েছে পারমিতা। এ এক ধরনের অনীশের দিকে ছুড়ে দেওয়া প্রচ্ছন্ন হুমকি।

কী দেখছ তখন থেকে ফোনের দিকে?

সুতপার কথায় সম্বিত ফেরে অনীশের। একটু সময় নিয়ে বলে, ফোন সেটটা বদলাতে হবে। কী রকম কালো, সাপের মতো।

অ্যাই মৈনাক, আস্তে হাঁট না!

ইলাদির ডাকে ঘাড় ফেরায় মৈনাক, সত্যিই বেখেয়ালে অনেকটাই এগিয়ে এসেছে। দাঁড়িয়ে পড়ে দেখে, শাড়িটা একটু উঁচু করে ধরে ডিঙি মেরে সাবধানে পা ফেলছে ইলাদি। গৌরপ্রাঙ্গণের রাতের অনুষ্ঠানের গান এখানে ভেসে এলেও, আলো আসেনি। ইলাদি কাছে এসে বলে, বাবাঃ, তোর যেন খুব তাড়া! দেখছিস না, রাস্তাটা কীরকম অন্ধকার। সাপ-খোপও তো থাকতে পারে।

বাজে কথা বোলো না। পয়েন্টেড হিল পরে এই রাস্তায় ঠিক কায়দা করতে পারছ না, স্বীকার করো।

বেশ হয়েছে যা। বলে, মৈনাকের হাত ধরে নেয় ইলা। তক্ষুনি হাত ছাড়িয়ে নেওয়া যায় না। কষ্ট পাবে ইলাদি। পর্দার অ্যাকট্রেসদের হাত বাঁধা দিয়ে হাঁটতে ভাল লাগে না মৈনাকের, জনগণ অন্য মানে করে।

সাতটা বেজে গেছে। অনুষ্ঠান প্রায় শেষের দিকে। মৈনাকদের মতো আরও দু'-চারজন তড়িঘড়ি পায়ে হেঁটে যাচ্ছে গৌরপ্রাঙ্গণের দিকে। এরা হয়তো বেলার ট্রেনে পৌঁছেছে। মৈনাকের ট্রেন লেট থাকলেও, বিকেল বিকেল পৌঁছেছিল। তখনই সোজা চলে এলে অনুষ্ঠানের আগের বৈতালিক দেখতে পারত, কিন্তু সেই যে রাহুলবাবু স্টেশন থেকে হাইজ্যাক করলেন, সোজা এনে তুললেন হোটেল রোজিয়েটে। গাড়িতে আসার সময় ভুবনডাঙা পার হতে মৈনাক এক বার ট্রাই নিয়েছিল নেমে যাওয়ার। বলেছিল, আপনি হোটেলে যান। আমি ফাংশনটা একটু দেখে নিয়ে যাচ্ছি।

রাহুলবাবু ঝুঁকি নিতে চাননি। বলেছিলেন, আপনার রানাদা আমায় থ্রু আউট টেনশনে রেখেছেন, বার বার একই কথা, ওই পাগলার ওপর আপনি ডিপেন্ড করছেন, দেখুন বোলপুর আসবে বলে, সে হয়তো বৈঁচিগ্রামে নেমে গেছে। যাক, তা যখন হয়নি, আপনাদের দু'জনকে মুখোমুখি বসিয়ে দিতে পারলে আমার কাজ খানিকটা এগিয়ে যায়।

হোটেলের রুমে ঢুকে মৈনাক দেখে, রানাদা, ইলাদি এরই মধ্যে ড্রিঙ্ক-এর আয়োজন সেরে রেখেছে। টেবিলের ওপর বোতল, গ্লাস, বরফ, স্ন্যাকস সব রেডি। মৈনাক এলেই ছিপি খোলা হবে।

মৈনাক তাতে রাজি নয়। বলেছিল, আমি এখন অনুষ্ঠান দেখতে যাব। আড্ডা রাত্তিরে।

একটু যেন হতাশ হয়েছিলেন রাখলবাবু। ওঁর দুশ্চিন্তাটা বোঝে মৈনাক, গল্পের শেষটা নিয়েঁ চণ্ড উৎকণ্ঠায় আছেন। টেনশন গ্রাস না করলেও মৈনাকের অবস্থা আরও খারাপ। চেক নিয়ে ফেলেছে, অথচ ভেবে উঠতে পারেনি কিছুই। ইনফ্যাক্ট টোটাল ট্রেন জার্নিতে এক বারও সে গল্পটা মনে মনে আওড়ায়নি। হোটেলে মৈনাকের মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা সম্যক অনুভব করেছিলেন রানাদা। বললেন, তুই একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়ে আমাদের সঙ্গে আধ ঘণ্টাটাক বস। গল্পটা আবার প্রথম থেকে বল। দেখবি, অটোমেটিক্যালি শেষটা চলে আসছে। এমনও হতে পারে আমরাই হয়তো শেষটা বলে দিলাম।

সেই শুনে ইলাদি তক্ষুনি লাফিয়ে উঠল, হ্যাঁরে, মৈনাক, তুই বল, আমার তো শোনাই হয়নি গল্পটা।

অগত্যা মৈনাককে বাথরুম ঘুরে, ট্রেনের পোশাক বদলে আড্ডায় বসতেই হয়। এবং বেশ গুছিয়ে, ইনডিটেল গল্পটা বলতে শুরু করে। মনোযোগে তার কোনও ফাঁকি ছিল না। তবু সেই একই জায়গায় এসে গল্পটা থেমে যায়। অসহায় চোখে মৈনাক তখন তিন শ্রোতার দিকে তাকিয়ে ছিল, ইলাদি ছাড়া বাকি দু'জন গল্প শোনাকালীন পেগ তিনেক সাবাড় করেছে। তাই খানিকটা রিল্যাক্স। আধ বোজা চোখে বাদাম চিবোতে চিবোতে রানাদা বললেন, ভাল এগোচ্ছে, বলে যা। স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনে যা আসছে তাই বল।

আর তো কিছুই মাথায় আসছে না রানাদা। বলে হাত তুলে নিয়েছিল মৈনাক। রানাদা তখন বলেন, তুই না হয় একটু ঘুরেই আয়। বাইরে গেলে যদি মাথাটা একটু খোলে। আমরাও ততক্ষণ শেষটা নিয়ে আলোচনা করি।

অনুমতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল মৈনাক। সে এক

পেগও পুরো খায়নি। স্বাভাবিক থাকতে হবে। আহেলির সঙ্গে দেখা হওয়ার চান্স আছে। মেয়েটা এক বার মৈনাককে মাতাল অবস্থায় দেখেছিল, বার বার দেখলে ইমেজের বারোটা বাজবে। রাহুলবাবুকে বিরস মুখে বসে থাকতে দেখে, রানাদা বলেছিলেন, আপনার কাছে কাগজ, পেন আছে?

হ্যাঁ, আছে।

নিয়ে আসুন। এন্ডিং-এর বেশ ক'টা অপশান তৈরি করি। তারপর ঠিক করা যাবে কোনটা হবে শেষ।

রানাদার কাগজ, পেন চাওয়া মানেই সব জড়িয়ে মড়িয়ে একাক্কার করবে। এ অভিজ্ঞতা ইউনিটের অনেকেরই আছে। সব থেকে মজার ব্যাপারটা দেখিয়েছিল মিতা বউদি, একবার না কি ওঁদের সংসারে খুব টানাটানি। রানাদা বললেন, কাগজ পেন নিয়ে এস, হিসেব করি মাসে আমাদের কত খরচ, কতটাই বা কমানো যায়। সেই হিসেবের কাগজটা মিতা বউদি দেখিয়েছিল মৈনাককে অদ্ভুত সব সাংকেতিক ভাষা, যেন গুপ্তধনের নকশা। তার ওপর আবার শট ডিভিশনের দাগ মারা আছে। যেমন ক্লোজ আপে যাবে মুড়ি-চা। অর্থাৎ প্রায়ই খাওয়া হবে। মদ ওভার দ্য সোলডার শট। মানে একা মদ্যপান চলবে না, কেউ থাকলে তবেই...এ রকম আরও অজস্র শট, ক্রেন শটও আছে।

মৈনাককে কেটে যেতে দেখে ইলাদি পিছন ধরল, আমিও যাব তোর সঙ্গে। আমার তো কোনও কাজ নেই এখানে।

রানাদা বললেন, হ্যাঁ ওকে নিয়েই যা। নয়তো নিজের পার্ট বড় করার জন্য গল্প অন্য দিকে নিয়ে যেতে চাইবে। কুইক ইনফ্লুয়েন্স করে দেয়।

আম্রকুঞ্জ ছাড়িয়ে ঘণ্টাতলার কাছাকাছি চলে এসেছে মৈনাকরা। ইলাদি এখনও হাত ছাড়েনি। গৌরপ্রাঙ্গণের মঞ্চে কোনও এক মহিলা কণ্ঠ গাইছেন, আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে।/ আমার সকল ব্যথা... অসম্ভব ভাল গাইছেন! মৈনাক জানতে চায় ইলার কাছে, চেনো, যিনি গাইছেন?

ঠোঁট উলটে ইলা বলে, ঠিক বুঝতে পারছি না। এদের এখানে এই মুশকিল, আর্টিস্টের নাম বলে না।

একদিক দিয়ে ভাল। রবীন্দ্রনাথের গান গাইছে সেটাই আসল, কে গাইছে সেটা নয়। কলকাতার কিছু আর্টিস্ট আছে, স্টেজে উঠে গান শুরু না করেই যারা বলে, কী হল হাততালি দিন, নইলে গানের উৎসাহ পাব কোত্থেকে। তাদের তো এই মঞ্চে গলা দিয়ে আওয়াজই বেরোবে না।

কথা বলতে বলতে মৈনাকরা পৌঁছে গেছে মঞ্চের কাছে। স্টুডেন্টস গার্জেনদের

ব্লকের ফেনশিং ধরে ইতিউতি তাকায় মৈনাক। ইলা বলে, তুই কি কাউকে খুঁজছিস?

মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলে মৈনাক। ইলা বলে, নিশ্চয়ই কোনও মেয়ে?

কী করে বুঝলে।

তোর মরিয়া হয়ে খোঁজা দেখে।

মৈনাক লাজুক হাসে। বলে, খুঁজে পাওয়া তো খুব মুশকিল গো, সব তো টুপি নয়তো ঘোমটা দিয়ে বসে আছে।

নিজের দুই কনুই দু' হাতে জড়িয়ে ইলাদি বলে, দেবে না, বেশ শীত আছে রে! চল না, কোনও ঢাকা জায়গায় বসি। একটু চা-ও খেতে হবে।

মৈনাকরা পাঠভবনের বারান্দায় গিয়ে বসে। পিছু পিছু চা-ওলাও চলে আসে। চা খাওয়ার পর ইলাদি বলে, তোর কাছে সিগারেট আছে?

আছে, বলে, প্যাকেট বার করতে যাবে মৈনাক, ইলাদি মত পালটায়, ছেড়ে দে, দারুণ একটা গন্ধ ভাসছে, সেটা নষ্ট হবে।

ইলাদির মধ্যে এখনও এতটা রোমান্টিক ব্যাপার অবশিষ্ট আছে দেখে অবাক হয় মৈনাক। কাজের জায়গায় ইলাদি হার্ডকোর প্রফেশনাল। শুটিঙে লাঞ্চ, ডিনার খারাপ দিলে, না খেয়ে সরাসরি ক্যাশ চেয়ে নেয়। আজকের এই রোমান্টিক মুড হয়তো প্রকৃতিরই উসকে দেওয়া।

মিষ্টি গন্ধ অনেক আগেই পেয়েছে মৈনাক। শাল, মহুয়া, ছাতিম মেলানো মোশানো ঘন আচ্ছন্ন সুবাস। আগেও বসন্তোৎসবে এসে এই গন্ধটা পেয়েছে মৈনাক, কিন্তু আজকের গন্ধের মধ্যে আর একটা কিছুর উপস্থিতি টের পাচ্ছে। আহেলির সঙ্গে দেখা হবেই এ রকম একটা ইঙ্গিত।

হ্যাঁ রে মৈনাক, গল্পের শেষটা নিয়ে কিছু করতে পারবি বলে মনে হয়?

ইলাদির প্রশ্নটা আবার সেই কঠিন অবস্থার কথা মনে করিয়ে দেয়। মৈনাক পরাজিত গলায় বলে, মনে হচ্ছে না। ওয়ে আউট পাচ্ছি না কোনও।

কেন পারবি না বল তো! আমি লক্ষ করছি তুই একটু আনমাইন্ডফুল আছিস। কনসেন্ট্রেট করছিস না বিষয়টার ওপর।

নারে বাবা, আমার ক্যালমা শেষ। আমি তো আর লেখক নই, যতটুকু পেরেছি, এই ঢের।

ভীষণ অবাক হয়ে ইলা বলে, সে কী রে, হোটেলে তুই যে বললি, গল্পটা তোর কোন এক বন্ধুর। শেষটুকু বদলে নিচ্ছিস।

মৈনাক অপ্রস্তুত হয়, অসাবধানে মুখ থেকে সত্যিটা বেরিয়ে গেছে। ম্যানেজ

দেওয়ার চেষ্টায় না গিয়ে বলে, যা জানলে চেপে যাও। প্রোডিউসার ফাঁসানোর জন্য ওটুকু আমায় বানাতে হয়েছে। বাকিটা কিছুতেই সামলাতে পারছি না।

মৈনাকের অসহায়তা বুঝে চিন্তিত মুখে বসে থাকে ইলা। মঞ্চের গান পালটে গেছে। অস্ফুটে ইলা এক বার বলে, গল্পটা ভেবেছিস কিন্তু দারুণ। তারপর আবার চুপ করে যায়। মিষ্টি গন্ধটা ভীষণ অন্যমনস্ক করে দিচ্ছে মৈনাককে, বার বার চোখ চলে আহেলির হাইটের পথচলতি মেয়েদের দিকে, তারা কেউ আহেলি নয়।

বেশ খানিকক্ষণ চিন্তা করে ইলা বলে, আচ্ছা, কোনও লেখকের হেল্প নেওয়া যায় না? আমার দু'-একজন চেনা আছে।

একটু যেন বিরক্ত হয় মৈনাক। বলে, লেখক কি ডাক্তার, প্লাস্টিক সার্জারি করে গল্পটাকে সুন্দর করবে! লেখক দেবে মৌলিক গল্প।

হতোদ্যম হয়ে চুপ করে যায় ইলা। একটু সময় নিয়ে মৈনাক বলে, তুমি হলে কী করতে?

মানে!

ধরো, তুমি যদি শহুরে মেয়েটা হতে, কী ডিসিশন নিতে?

কী আর করতাম, বাড়িটার দখল নিয়ে, ছেলেটাকে ছেড়ে দিতাম তার বাল্যপ্রেমিকার হাতে। তেমন বুঝলে কিছু ক্যাশও প্রোভাইড করতাম, যাতে ওরা অন্য কোথাও গিয়ে ঘর বাঁধতে পারে। তোর শহুরে মেয়েটার তো মেন ক্রাইটেরিয়া ছোটবেলার বাড়িটাকে ফিরে পাওয়া।

মাথা নাড়ে মৈনাক। বলে, না। এত সারফেস লেভেলে ব্যাপারটাকে দেখলে চলবে না। পুরনো বাড়িতে ফিরতে চাওয়াটা প্রতীক মাত্র। মেয়েটি আসলে ফিরতে চাইছে তার কিশোরীবেলায়। জার্নি টু দ্য অ্যাডোলেসেন্স।

সেটা তো আবসার্ড চাওয়া।

আর একটু খতিয়ে দেখো, ব্যাপারটা অবাস্তব হতে পারে, অসম্ভব নয়।

চোখ পাকিয়ে ইলা বলে, তুই কিন্তু ফাউল প্লে করছিস মৈনাক। আমার মতো সরল সাদা সিধে মেয়ে পেয়ে আঁতলামি করছিস।

মৈনাক অমলিন হাসে। তারপর বলে, এই যে বললে 'সরল সাদা সিধে' যা তুমি কখনওই নয়, অথচ হতে চাও। আমার সেই শহুরে নায়িকা তাই চেয়েছিল। কিশোরীবেলার সারল্যে যেতে চেয়েছিল সে। স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে একজন খেলার সঙ্গী চাই। সেই সঙ্গী নির্বাচন করেছিল তারই অধঃস্তন ইয়াং ছেলেটিকে। এখন শহুরে মেয়েটি কী করবে? আর অল্পবয়সি বনদেবী কেন ছেড়ে দেবে তার অধিকার?

সে তো বিশ্বাস করত, তার প্রেমিক খুঁজে খুঁজে এক দিন ঠিক তার কাছে আসবে।

গালে হাত রেখে ভ্রূ কুঁচকে মৈনাকের সব কথা শুনল ইলা। মৈনাক থামতেই বলে, তুই তো ইচ্ছে করলে সুস্থ মানুষকে পাগল করে দিতে পারিস। তোর এত ক্ষমতা জানা ছিল না তো! ভাগ্যিস এ রকম অ্যানালিটিক্যালি গল্পটা প্রোডিউসারকে শোনাসনি, নইলে সিনেমা করার ভূত অনেক আগেই তার মাথা থেকে নেমে যেত।

লম্বা শ্বাস ফেলে মৈনাক বলে, শেষমেশ বোধহয় তাই হবে। রানাদা এত আশা নিয়ে বসে আছে, প্রোডিউসার কেটে গেলে ব্যাপক গালাগালি দেবে আমায়। আমিও বুঝতে পারছি না, কেন এ রকম একটা আধখেচড়া মার্কা গল্প ভেবে বসলাম! ...একটু থামে মৈনাক। আবার বলে, আমার কী মনে হয় জানো ইলাদি, আমি আসলে ফিল্মেরও লোক নই। আমি একজন ইনকমপ্লিট লেখক। অসম্পূর্ণ কল্পকদের যে কী দুঃখ, তুমি বুঝবে না। এ এক ধরনের...

মঞ্চের আশপাশে ভিড় জমা হতে দেখে, থেমে যায় মৈনাক। সম্ভবত স্টেজের অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। গান শোনা যাচ্ছে না। এ বার শুরু হবে রাতের বৈতালিক। পাঠভবনের বারান্দা থেকে উঠে দাঁড়ায় মৈনাক। ইলাকে বলে, চলো, ওদের সঙ্গে হাঁটি।

ইলা বসেই থাকে। বলে, আমি যাচ্ছি না। গতবার এসেছিলাম, ভীষণ হুড়োহুড়ি হয়। আগের সেই বৈতালিক নেই। কলেজ লাইফে যখন আসতাম, দিব্যি এখানকার স্টুডেন্টদের সঙ্গে মিশে গিয়ে, গান গাইতে গাইতে ঘুরতাম গোটা আশ্রম।

মৈনাকেরও যে ওদের সঙ্গে ঘোরার খুব ইচ্ছে আছে, তা নয়। আহেলির খোঁজেই হাঁটা। সেও নিশ্চয়ই মৈনাককে খুঁজছে, কী যেন একটা কথা আছে!

ইলা উঠে দাঁড়ায়। মৈনাকের পিঠে হাত রেখে বলে, কী হল, খুব যেতে ইচ্ছে করছে? চল, তা হলে। তবে একটু ডিসট্যান্স রেখে হাঁটব।

দূরে জমায়েতের মধ্যে থেকে ভেসে ওঠে বৈতালিকের গান। ও আমার চাঁদের আলো / আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে / ধরা দিয়েছ...

স্টেজ থেকে গান নেমে এসেছে মাটিতে। মাইকের আনুষ্ঠানিকতা ঝেড়ে ফেলে গান এখন সবার। সুরের টানে মৈনাক, ইলা এগিয়ে যাচ্ছিল, পথ আগলে দাঁড়াল চার পাঁচটি মেয়ে। একজন ছাড়া বাকি সবাই ঘিরে ধরল ইলাকে। যে পড়ে রইল, সে আহেলি। পরনে এখন শাড়ি। সাদার ওপর লাল নকশা পাড়, কপালে লালচে বড় টিপ, কাঁধে ফেব্রিক করা কাপড়ের ঝোলা। গলায়, কানে, হাতে ডোকরা, পুঁতির

গয়না। দুপুরের গঙ্গাফড়িং সন্ধে উতরে যেতে প্রজাপতি হয়ে গেছে।

হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ার প্রাথমিক উত্তেজনা সামলে আহেলি বলল, সেই তখন থেকে আপনাকে খুঁজছি, এই বার ভাবছিলাম গেস্টহাউস যাব। আমার দু'জন বন্ধুর গার্জিয়ানরা ওখানে উঠেছেন, আপনার দেখা পেতেই ওঁদের সঙ্গে আলাপ করতে যেতাম।

মৈনাক মনে মনে বলে, ভাগ্যিস যাওনি। মুখে বলে, আমাদের মিট করার একটা জায়গা ঠিক করে রাখা উচিত ছিল। বোলপুরে নেমে তোমায় দেখতেই পেলাম না।

মৈনাকের আক্ষেপ শূন্যে ভাসতে দিয়ে আহেলি বলে, একটু আগে বন্ধুর মোবাইল সেট থেকে মা-কে ফোন করেছিলাম। আপনার নাম না করে বললাম, তোমার একজন চেনা মানুষের সঙ্গে ট্রেনে দেখা হয়েছে।

নাম বললে না কেন? অবাক হয়ে জানতে চায় মৈনাক। আহেলি বলে, চলুন, হাঁটতে হাঁটতে বলি।

ইলাদির দিকে চোখ যায় মৈনাকের, আহেলির বন্ধুদের সঙ্গে চেষ্টাকৃত হেসে গল্প করছে। মেয়েগুলো নিশ্চয়ই বলেছে, আমরা আপনার দারুণ ফ্যান। এই সব মেয়েরা যে কোনও শিল্পীর সামনে একই ডায়লগ মারে। শিল্পীরাও সেটা জানেন। তবু তাদের হাসি হাসি মুখ করে কথা বলতে হয়, নইলে যে বক্স নষ্ট হয়ে যাবে। মৈনাক আহেলিকে বলে, চলো, তোমার সঙ্গে ইলাদির আলাপ করিয়ে দিই আগে, আমরাও বৈতালিকের সঙ্গে হাঁটব ভাবছিলাম।

আপনি যে বলছিলেন বন্ধুদের সঙ্গে গেস্টহাউসে মিট করবেন, ইনি কি আপনার বন্ধু? ওই একজনই!

একটুও অপ্রতিভ না হয়ে মৈনাক বলে, তা বলতে পারো, ইলাদি আমার দিদিবন্ধু। আরও দুই সঙ্গী এসেছেন, তাঁরা জেন্টস। জার্নি করে টায়ার্ড, তাই অনুষ্ঠানে এলেন না।

আহেলি বলে, আমার ব্যাচমেটদের যখন দূর থেকে আপনাকে দেখালাম, ওরা পাশের মহিলাকে দেখে লাফিয়ে উঠল। ওদের কাছেই জানলাম, ইলা সরকার টিভির টপ র‍্যাঙ্কের অ্যাকট্রেস। দু'-একটা আর্ট ফিল্মেও অ্যাক্টিং করেছেন। ওরা আমায় ধরল আলাপ করিয়ে দিতে। যাক, নিজেরাই আলাপ করে নিয়েছে। একটু থামে আহেলি। বাতাসে ভেসে বেড়ানো গন্ধটা এখন যেন ক্রমশ ঘন হয়ে মৈনাকের বড্ড কাছে, দূরে চলে যাচ্ছে আশ্রম পরিক্রমার দল। আহেলি ফের বলে, আপনার তো দেখছি, সেলিব্রিটিদের সঙ্গে ওঠাবসা। বেশ ইমপর্টেন্ট লোক আপনি—

এটা নিন্দে না প্রশংসা বুঝতে পারে না মৈনাক। বোঝার দরকারও নেই।

আহেলির সঙ্গে দেখা হওয়ার পরই তার মনটা বেশ উদার হয়ে গেছে। ছোটখাটো বিদ্রুপ দিয়ে তাকে বিব্রত করা যাবে না। আহেলিকে নিয়ে ইলার কাছে যায়।

গানের দল থেকে একটু দূরত্ব রেখেই হাঁটছে মৈনাকরা। মেয়েগুলো এখনও ইলাকে ছাড়েনি। ইলারও সম্ভবত এই মুক্ত পরিবেশে ওদের সঙ্গে আড্ডা মারতে ভাল লাগছে। মৈনাক, আহেলি ওদের থেকে আরও একটু পিছনে। মৈনাক ইতিমধ্যে আহেলিকে একবার জিজ্ঞেস করেছে, তুমি তো এখানকার স্টুডেন্ট, বৈতালিকে জয়েন করোনি কেন? উত্তরে আহেলি বলেছে, সামনের বছর আসরেন গাইব। আমার এটাই তো প্রথম বছর, একটু শেকি লাগছিল।

কারণ শুনে মৈনাক অবাক। যতটুকু সময় আলাপ হয়েছে আহেলির সঙ্গে, সংকোচের কোনও বালাই দেখছে না। প্রবাসে বড় হয়েছে বলেই হয়তো টিপিক্যাল বাঙালি দ্বিধাগুলো ওর মধ্যে বাসা বাঁধেনি। তবে এখন আহেলির হাঁটা-চলা, কথা বলা, পোশাক দেখলে মনে হবে ছোট থেকেই শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করছে।

এ কথা সে কথার পর কৌতূহল নির্বাপণের প্রসঙ্গে ফিরে আসে মৈনাক। বলে, পারমিতাদিকে বললে না কেন আমার নাম?

বলব, আর একটা দিন দেখে নিই।

মানে?

আহেলির নীচের ঠোঁট শুধু হাসছে। মৈনাক জানে এক ঠোঁটে হাসতে পারা মেয়েরা মিচকে শয়তান হয়। হাসি লুকিয়ে নিয়ে আহেলি বলে, দেখুন, আপনাকে আমার মোটেই সুবিধের ঠেকছে না।

কী রকম?

আমাকে দেখার পরই ফিল্মে অ্যাক্টিং-এর অফার দিলেন। যেই শুনলেন শান্তিনিকেতনে আসছি, চলে এলেন এখানেও! আবার একই ট্রেনে। ট্রেনে আসার সময় বললেন বন্ধুদের সঙ্গে থাকবেন গেস্টহাউসে, খবর নিয়ে দেখলাম আপনার বয়সি কোনও গ্রুপ সেখানে ওঠেনি। এখন দেখছি সঙ্গে সুন্দরী মহিলা নিয়ে ঘুরছেন। ভেরি সাসপিসিয়াস ক্যারেক্টার আপনার। আরও একটু অবজারভ করে নিয়ে, ইওর নেম উইথ কমপ্লেন করব মা-কে। মজার ভঙ্গিতে হলেও, মৈনাককে বেশ খানিকটা কোণঠাসা করে ফেলেছে আহেলি। ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় মৈনাক একটু সিরিয়াস ঢঙে বলে, দেখো আহেলি, তুমি যদি ধরে থাকো, তোমার জন্যই আমি বসন্তোৎসবে এসেছি, সেটা একটু আবদারের কল্পনা হয়ে যাবে। যে ফিল্মটায় তোমাকে কাস্টিং করার কথা ভাবছিলাম, তার লোকেশন দেখতেই এখানে আসা।

সঙ্গে ডিরেক্টর, প্রোডিউসার আছেন। একটা মেজর রোল করবে ইলাদি, দোলের ছুটি পেয়ে সে-ও আমাদের সঙ্গে চলে এসেছে।

আমাকে কোন রোলটার জন্য সিলেক্ট করেছিলেন? জানতে চায় আহেলি। বিষণ্ণ মুখে বলে, সে কথা তুলে এখন আর কোনও লাভ নেই। স্ক্রিপটিং-এর একটা টার্নিং-এ এসে আমরা আটকে গেছি। ফিল্মটা আদৌ হবে কি না, সেটা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

মুখে কপট আপশোশের শব্দ করে আহেলি বলে, স্টোরি কোন সাবজেক্টের ওপর ছিল? গরিবি?

নাঃ, প্রেম। মডার্ন প্রেম। বলে, উদাস হয়ে আকাশের দিকে তাকায় মৈনাক। চাঁদটা আড়াল করেছে হলুদ ফুলে ভরা একটা লম্বা গাছ। কী গাছ কে জানে! চোখ নামিয়ে আনতে মৈনাককে দেখে, একটু দূরে ইলাদি দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে আছে। চোখাচোখি হতে ইলাদি বলে, কী রে, এ বার ফিরবি তো না কি? ইলাদির ফ্যানেরা বলে ওঠে, এত তাড়াতাড়ি ফিরে যাবেন কেন, আরও খানিকক্ষণ থাকুন না। ইলাদি ওদের সঙ্গে এগোয়। গানের দলকে আর দেখা যাচ্ছে না। তবে ভেসে আসছে গান, একই কলি ঘুরে ফিরে। অদ্ভুত আবেশ তৈরি হয়েছে।

দেখুন তো, এই নভেলটা আপনাদের সাবজেক্টে ম্যাচ করবে কি না?

আহেলির ডাকে মুখ ফেরায় মৈনাক। দেখে, ওর হাতে একটা বাঁধানো বই। সম্ভবত ওর কাঁধের ঝোলা থেকে এইমাত্র বার করল। দূর থেকে আসা নিয়ন আলোয় বইয়ের টাইটেল এবং লেখকের নামটা দেখে রীতিমতো চমকে ওঠে মৈনাক। বইটা তার ভীষণ চেনা। বলে, সোনাদার বই তুমি কোথায় পেলে?

মায়ের কাছে। এই লেখক আপনার কে হন? খুবই সিরিয়াস ভঙ্গিতে জানতে চায় আহেলি। মৈনাক সহজ ভাবে বলে, আমার জ্যাঠতুতো দাদা। মেজজ্যাঠার বড় ছেলে। আমরা এক বাড়িতেই থাকি। আরও গম্ভীর হয়ে আহেলি বলে, মায়ের সঙ্গে আপনার দাদার কী ধরনের রিলেশন ছিল?

মনের ভেতর থেকে সতর্ক হওয়ার আদেশ উঠে আসে। মৈনাক বলে, কেমন আবার রিলেশন। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে যেমন থাকে। তেমন স্পেশ্যাল কিছু নয়।

ডোন্ট ট্রাই টু কনসিল। ব্যাপারটা আমি অনেকটাই আঁচ করতে পেরেছিলাম। বেশ কিছুটা ক্লিয়ার হয়েছে এই নভেলটা পড়ে। ট্রেনে আসার সময় পড়ে নিয়েছি। মাকে নিয়েই লেখা। কিন্তু আরও কিছু কথা আমার জানা বাকি। সেগুলো বলবেন আপনি। বইটা কি আপনার পড়া।

মুখ দিয়ে কথা সরে না মৈনাকের, শুধু মাথা নাড়ে। আহেলি বলে, স্কিপ করে

হলেও, আজ রাতে নভেলটা পড়ে নিন। আপনার দাদা যতটুকু লিখেছেন, সেটা রিপিট করার দরকার নেই। যেটা লেখেননি সেটাই আপনি বলবেন আমাকে।

আহেলির কথার পিঠে মৈনাক বলে ওঠে, আবার পুরনো বিষয় টেনে এনে কী লাভ আহেলি, সব তো চুকেবুকে গেছে। সোনাদা, পারমিতাদি ভুলে গেছে একে অপরকে।

আপনার দাদা ভুললেও, আমার মা ভোলেনি। কেন ভুলতে পারেনি, সেটাই আমি বুঝতে চাই। কোনও একটা সলিড রিজন্ অর কমিটমেন্ট তো আছেই। বলেই দু'পা এগিয়ে যায় আহেলি। বলে, আপনার দিদির সঙ্গে ভাল করে আলাপই হল না, যাই একটু কথা বলি। কাল সকালে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে ঘণ্টাতলায়, ফাংশনের শেষে। বাই—

প্রায় ছুটতে ছুটতে ফ্যান পরিবৃত্ত ইলার দিকে এগিয়ে গেল আহেলি। একা বই হাতে দাঁড়িয়ে থাকে মৈনাক। ভেবেছিল, সহজ সরল একটা সম্পর্ক তৈরি হতে যাচ্ছে আহেলির সঙ্গে, কিন্তু কোথায় কী, এখানেও জটিলতার আভাস। মনটা হঠাৎই ভীষণ খারাপ হয়ে যায় মৈনাকের। খেয়াল করে, এতক্ষণ ঘিরে থাকা মিষ্টি গন্ধটা সে আর পাচ্ছে না।

দোলের দিন সকাল। ঘুম ভেঙে গেলেও, চোখ খোলেনি অনীশ। সারা রাত উলটোপালটা স্বপ্ন দেখেছে, চোখ বুজে এলোমেলো স্বপ্নগুলোকে একটু সাজিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে সে। স্বপ্নটা দেখতে তার মন্দ লাগছিল না। অনেক অসঙ্গতি থাকলেও, মনটা আনন্দে ভরে যাচ্ছিল। গোটা স্বপ্নটাই বাবাকে নিয়ে, সদরে এসে উনি ডাকছেন, সোনা, অনু এক বার নেমে আয়, জিনিসগুলো নিয়ে যা।

অনেকদিন পর স্বপ্নে ভাইকে পাশে পেল অনীশ। দু'জনেরই বয়স কমে গেছে। বাবার ডাক শুনে চমকে উঠল অনীশ। ভাই পড়ছিল রান্নাঘরের মেঝেতে, অনীশ প্রেসে যাওয়ার আগে ভাত খেতে বসেছিল। দুই ভাই ভয়ে ভয়ে মায়ের দিকে তাকাল, অবাক ব্যাপার, মা হাসছে। বলল, যা তোদের ডাকছে। যদি দেখিস সঙ্গে রাক্ষুসিটাও আছে, বাধা দিবি না। ওকে-ও নিয়ে আসবি ঘরে। ওর সব বিষ নষ্ট হয়ে গেছে।

আর ওকে ভয় পাই না আমি।

মায়ের পারমিশন পেয়ে দুই ভাই ছুটল সদরের দিকে। বাইরের দরজায় গিয়ে

থমকে দাঁড়ায়, মণিকামাসি আর বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। মা তার মানে ঠিকই আন্দাজ করেছিল! বাবার চেহারা আগের মতোই রাজসিক বরং মণিকামাসির চেহারায় ঢিলেঢালা মা মা ভাব। প্রচুর গয়না পরেছে।

বাবাদের পিছনে হাতে-টানা রিকশা। ওটা চেপেই এসেছেন। রিকশাওলা একটার পর একটা থলে, ধামা নামিয়ে দিচ্ছে দোরগোড়ায়, ওর মধ্যে সবজি, ফল-মূল আরও কী সব যেন! মণিকামাসি বলল, এ সব তোদের জন্যই ফলানো, আরও অনেক আছে বাগানে। এবার থেকে তোরাই নিয়ে আসবি, আমি আর বাড়ি ছেড়ে যেতে পারব না।

স্বপ্ন দেখার সময় মাথা এমনিতেই ভোঁতা হয়ে থাকে, তার ওপর মণিকামাসির অদ্ভুত কথাগুলো যেন জটিল কোনও ধাঁধা মনে হচ্ছিল। বাবা বললেন, নে, জিনিসগুলো এক এক করে ভেতরে নিয়ে চল।

দুটো থলে বাবা নিজেই তুলতে গেলেন, এই সময় একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড করল অনু, বিনা কোনও ভূমিকায় মণিকামাসির হাতে সজোরে কামড়ে দিল।

প্রচণ্ড রেগে বাবা বললেন, এটা কী করলি তুই!

অনু নির্বিকার ভাবে বলল, টক না মিষ্টি দেখলাম। দৃশ্যটা মনে পড়তে এখন হাসি পাচ্ছে অনীশের, স্বপ্নে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। যদি রেগে গিয়ে বাবা আবার নিরুদ্দেশ হয়ে যান। অনু যে ঘটনা ঘটিয়েছিল স্বপ্নে, ছোটবেলায় এটাই ওর বদভ্যাস ছিল। সুযোগ পেলেই একে তাকে কামড়ে দিত। বিয়ে বা অন্য উৎসব অনুষ্ঠানে ত্রাস ছিল অনু।

স্বপ্নে এর পরের অংশটা আরও অদ্ভুত, মণিকামাসি নিঃসংকোচে ঘরে ঢুকে এসেছে। মায়ের মুখে রাগ বা আনন্দ কোনওটাই নেই। দু'জনে মুখোমুখি হতে, মণিকামাসি 'অপরাধ নিয়ো না' টাইপের হেসে জড়িয়ে ধরল মাকে। তারপর যা করল, সেটা স্বপ্নেই সম্ভব, নিজের রাঙা সিঁথি থেকে বুড়ো আঙুলে সিঁদুর তুলে মায়ের সাদা সিঁথিতে লাগিয়ে দিল ...

স্বপ্নে মা বিধবার বেশে ছিল, এমনিতে থাকে না। এই অদ্ভুত স্বপ্নের মানে কী? অবচেতন থেকে কোনও নির্দেশ আসছে মনে হয়, ধরতে পারছে না অনীশ। এ রকম উলটোপালটা স্বপ্ন দেখলেও, মনটা কেমন যেন ভারহীন লাগছে। এবার কি তা হলে সময় হয়ে এল, মাকে বলে দেওয়ার, বাবা আর নেই। কোনও দিন ফিরবেন না। মা নিশ্চয়ই এখন আর আছাড়ি-পিছাড়ি কাঁদবে না, সিঁদুর মুছে সাদা থানে মুড়ে নেবে নিজেকে। মাংস খাওয়া অনেক দিন ছেড়েছে, মাছটাই শুধু ছাড়তে হবে। সেটা এমন কিছু না। ভেবেই অনীশের খেয়াল হল, কষ্টের সংসার হলেও, মা

অনীশদের জন্য কত কিছুই রেঁধে বেড়ে দিয়েছে, সেই ছেলে অবলীলায় মায়ের পাত থেকে বাতিল করছে মাছ! --বুকের কাছে কষ্ট পাকিয়ে উঠল, পরক্ষণেই আবেগ সামলে অনীশ ঠিক করে, মাকে সত্যিটা বলে দেওয়ার পর, যে করে হোক নিরামিষ খাওয়াটা আটকাবে, সুতপাকে বলবে ব্যবস্থা নিতে।

কী হল, আর কতক্ষণ ঘুমের ভান করে পড়ে থাকবে! এবার ওঠো।

সুতপার ডাকে চোখ খোলে অনীশ। মশারি তুলে দিয়েছে সুতপা। মাথার কাছে খোলা জানলা। ঝকঝকে নীল আকাশ। উঠে বসে অনীশ। সুতপা টেবিল ঝাড়ছে। অনীশ বলে, কী করে বুঝলে, ঘুমের ভান করে পড়ে আছি?

ঘুরে দাঁড়িয়ে সুতপা বলে, ওপরে এসে তোমাকে ডাকতে গিয়ে দেখি, মিটিমিটি হাসছ, কখনও বা ভাঁজ পড়ছে কপালে, কোনও প্লট ভাবছিলে না কি?

অনীশের ঠোঁটে উদাসীন হাসি ফুটে ওঠে। তাই দেখে সুতপা অবাক হয়ে বলে, আবার হাসছ! কী ব্যাপার বলো তো, কালকের নেশা এখনও কাটেনি মনে হচ্ছে!

এ কথারও কোনও উত্তর দেয় না অনীশ। সুতপা বলতে থাকে, হঠাৎ কাল নেশা করতে গেলে কেন? বিচ্ছিরি অবস্থা হয়ে গিয়েছিল, উৎকট গন্ধ পা টলছে। আমি তো ভয়ে কাঁটা। খালি ভাবছি, মা যেন টের না পান।

অনীশের দিক থেকে কোনও সাড়া আসছে না দেখে, সুতপা এগিয়ে এসে ওর চুল ঘেঁটে দিয়ে বলে, বলি, মাথায় হঠাৎ এসব কী ঢুকছে। ছেলে বড় হচ্ছে, এ সময় বাবারা কোথায় সংযত হয়, উনি নতুন করে শুরু করলেন!

সুতপা ছেলের কথা তুলতে 'থম' ভাবটা একটু কাটে অনীশের। বলে, বিল্টু কোথায়?

দাদু-দিদার পায়ে আবির দিতে গেছে। এ বছর একা একাই গেল। দাদুরা সহজে ছাড়বে বলে মনে হয় না। শুনলাম, দুই দাদুই নাতির জন্য পিচকারি, রং কিনেছে। বাড়ির মধ্যে ওর বয়সি কেউ নেই তো, সব আদর গিয়ে পড়েছে বিল্টুর ওপর।

এই সামান্য কথাটাও অনেকটা ভারহীন করে অনীশকে, যাক, বিল্টুকে ভালবাসার অনেকে আছে। খামোকা স্ত্রী-সন্তানের প্রতি অতিরিক্ত কর্তব্য করে মানুষ। এ এক ধরনের অধিকার ফলানোর বিনম্র প্রচেষ্টা। পরিবার, সমাজ স্বভাব-নিয়মে একে অপরকে দেখাশোনা করে।

সুতপা দরজার দিকে যেতে যেতে বলে, দুম করে বাথরুমে ঢুকে যেয়ো না, আমি চা নিয়ে আসছি।

বিছানা থেকে নেমে আসে অনীশ। পায়ে পায়ে জানলায় গিয়ে দাঁড়ায়। এখান থেকে গলির অনেকটা দূর অব্দি দেখা যায়। স্বপ্নে এই গলি ধরেই এসেছিলেন

বাবা, মণিকামাসি। বাবার পরিণতি জানলেও, মণিকামাসির আর কোনও খবর পায়নি অনীশ। আসলে খোঁজই করেনি, তার কী হাল হল। নিজেকে এই মুহূর্তে ভীষণ স্বার্থপর লাগে। মণিকামাসি এখন কোথায়, কে জানে! তারও তো নিজের বলতে কেউ ছিল না।

বড় রাস্তার ওপর গলির মুখে একটা প্রাইভেট কার এসে দাঁড়াল। আগের মতো গাড়ি দেখে আর চমকাল না অনীশ। পারমিতা যদি আসে, আসুক। না, পারমিতা নয়। গাড়ির ড্রাইভার দরজা খুলে নেমে এল। হাতে একটা খাম। গলি ধরে এগিয়ে আসছে। কাদের বাড়ি যাবে? ছুটির দিনে কাকে ব্যস্ত করতে যাচ্ছে?

জানলা থেকে সরে আসে অনীশ। বাইরে এলোমেলো হাওয়া, মাঝে মাঝে ঘরেও ঢুকে আসছে। এই নির্মল আলো-বাতাসে নিজেকে কেমন জানি বাসি বাসি লাগে। কাল ল্যাম্পপোস্টের তলা থেকে সেই যে বাইশের অনীশকে তুলে এনেছিল, এখনও ধুলো ময়লা ভাল করে ধোয়া হয়নি। বাথরুমে ঢোকে অনীশ।

খানিক পর আবার সুতপার গলা, চা নিয়ে এসেছি। তাড়াতাড়ি বেরোও, ঠান্ডা হয়ে যাবে।

প্রায় জল গায়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে অনীশ। সুতপার এক হাতে চায়ের কাপ, অন্য হাতে ম্যাগাজিন সাইজ খাম। চেনা চেনা লাগে খামটা। সুতপা বিস্ফারিত চোখে বলে, এ কী, এখনই চান করে নিলে যে! গা-টা ভাল করে মোছোওনি।

চা, খাম টেবিলে রেখে সম্ভবত তোয়ালে আনতে গেল সুতপা। চায়ের কাপ ঠোঁটে তুলে, খামটা উলটেপালটে দেখে অনীশ, বড় বড় অক্ষরে তারই নাম-ঠিকানা লেখা। পিঠে তোয়ালের ছোঁয়া পেয়ে অনীশ জিজ্ঞেস করে, খামটা কখন এল?

এই তো একটু আগে। একটা ছেলে দিয়ে গেল।

কুরিয়র?

না মনে হয়, সই-টই তো কিছু করাল না। দেখ, কোনও লিটল ম্যাগাজিন হয়তো। বলে, অনীশকে মোছানো সাঙ্গ করল সুতপা। তারপর বলল, চানটা করে ভালই করেছ, গা দিয়ে বড্ড মদের গন্ধ বেরোচ্ছিল।

তোয়ালে রেখে সুতপা নীচের তলায় যায়। খামটা নিয়ে কোনও কৌতূহল দেখায়নি। ধরেই নিয়েছে কোনও ম্যাগাজিন। অনীশ নিশ্চিত এটা তা নয়। জানলা থেকে দেখেছিল, এই সাইজের একটা খাম নিয়ে ড্রাইভার আসছে। লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকের পক্ষে এ ভাবে পত্রিকা পাঠানো বেশ বিরল ঘটনা।

খামটা ছিঁড়তেই বেরিয়ে এল একটা চিঠি আর হোমিওপ্যাথি ওষুধের পুরিয়ার

মতো বড় ভাঁজ করা কাগজ। পুরিয়া খুলতেই, গোলাপি আবির। চিঠিতে লেখা, কত দিন পর আবির পাঠালাম। নিশ্চয়ই এখনও কেউ তোমায় মাখায়নি। এটা পাওয়ার ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যে সুবিধে মতো জায়গা থেকে ফোন কোরো। ভীষণ জরুরি কিছু কথা আছে। যদি না করো, আমাকেই তোমার বাড়িতে ফোন করতে হবে। তোমার বউ বিরক্ত হতে পারে।

চিঠিটা পড়ে একটুও বিচলিত হয় না অনীশ। যেন এ রকমটা হওয়ারই কথা ছিল। আজকের সকালটাই অদ্ভুত, কোনও ঘটনাই মনটাকে চাপের মধ্যে ফেলতে পারছে না।

আবিরের প্যাকেটটা নাকের কাছে এনে গন্ধ নেয় অনীশ, সত্যিই এখনও কত সজীব আছে পারমিতা!

চিঠি, আবির ড্রয়ারের ভেতর ঢুকিয়ে রেখে, কী মনে হতে চাবি মারে অনীশ। তারপর পাজামা, পাঞ্জাবি বার করতে আলমারির কাছে যায়। ফোনটা সে বাড়ির বাইরে থেকেই করবে।

ফোন বেজে ওঠার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ ধরে ফোনের সামনে বসে আছে পারমিতা। ড্রাইভার মন্টু ফিরে এসেছে আধ ঘণ্টা হয়ে গেল। এখনও ফোন এল না অনীশের। গত কাল দিল্লির এক প্রতিবেশী ফোন করেছিলেন। কুশল বিনিময়ের পর বিচ্ছিরি একটা খবর দিলেন পারমিতাকে। তারপর থেকেই ভীষণ অস্থির অস্থির লাগছে। ইতিমধ্যেই দু'চার বার রিসিভার তুলে কানে দিয়েছে পারমিতা, না, লাইন ডেড হয়ে যায়নি। অন্য আর একটা আশঙ্কা হচ্ছে, খামটা মন্টু তুলে দিয়েছে অনীশের বউয়ের হাতে। ওর দোষ নেই, পারমিতা বলে দেয়নি, খামে যার নাম লেখা আছে শুধু তার হাতেই দিতে হবে। অনীশের বউ যদি খামটা খুলে ফেলে! আশঙ্কাটা মাথা চাড়া দিতে, ফোন সেটের ওপর ঝুঁকে পড়ে পারমিতা। অনীশের নাম্বার ডায়াল করবে ভেবেও, করে না। আর একটু অপেক্ষা করা যাক। ও বাড়িতে ফোন করলে ভাল করে কথা বলা যায় না। ইচ্ছে থাকলেও, অনীশও বোধহয় পারে না প্রাণ খুলে বলতে। যে কথাগুলো বলবে পারমিতা, তার মাঝে কোনও বাধা আসুক, চায় না সে । এখনই সব কথা অনীশকে বুঝিয়ে না বললে, পরে হয়তো আর সুযোগই পাবে না।

কাল রাতে আহেলি নিজে থেকেই ফোন করেছিল। বলল, বইটা নিয়ে গেছে। ভুলে গিয়েছিল জানাতে। উপন্যাসটা না কি তার পড়াও হয়ে গেছে। আশ্চর্য কিছু না, খুব তাড়াতাড়ি পড়ে। এর পরের খবরটা দিল মারাত্মক। যে কারণেই অনীশের

সঙ্গে এক্ষুনি কথা বলা দরকার। বোলপুর যাওয়ার সময় ট্রেনে মনুর সঙ্গে দেখা হয়েছে আহেলির। খুব প্রশংসা করছিল মনুর। কাল সারা সন্ধে ওরা একসঙ্গে ছিল। ফোনে আহেলির লাজুক উচ্ছ্বাস শুনে মনে হচ্ছিল, মনুর সঙ্গে ইমোশনাল কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে। এখনই সতর্ক হওয়া দরকার। যদি সত্যিই ওদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়, পারমিতার এত দিনকার প্রতিরোধ ভেঙে পড়বে।

ফোন বেজে ওঠে। ঝট করে রিসিভার তোলে পারমিতা। উৎকণ্ঠায় গলা এমনিই বুজে এসেছে, 'হ্যালো' শব্দটা ক্ষীণ হয়ে বেরোয়। অপর প্রান্তে অনীশ বলে, বলো, কী বলবে?

বলছি। বলে, একটু সময় নেয় পারমিতা। মাথায় একরাশ কথা ভিড় করে আসছে, কোনটা আগে বলবে ঠিক করে উঠতে পারছে না। হঠাৎই শুরু করে দেয় বলতে, অনীশ, আমার মেয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই তোমার কাছে যেতে পারে।

কেন?

মাঝখানে কথা বোলো না অনীশ, আমাকে এখন অনেক কথা বলতে হবে, শুধু শুনে যাও। দম নিয়ে পারমিতা ফের শুরু করে, মেয়ে অনেক কিছু জানতে চাইবে তোমার কাছে। তুমি প্রশ্নগুলো শুনে আশ্চর্য হবে না, জানবে ওই সব প্রশ্নের মুখে আমিই ওকে ফেলেছি। ওর কোনও কথাতেই না করবে না। বলবে, আমার অ্যাটিটিউড দেখে, ও যে ধারণায় পৌঁছেছে, সব সত্যি।

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না পারমিতা! ও প্রান্তে অসহায় শোনায় অনীশের গলা। পারমিতা বলে, সব বুঝিয়ে বলব, তুমি অন্তত একটা গোটা দিন-রাত আমায় বাইরে কোথাও সময় দাও। অনেক কিছু বলার আছে আমার।

তা হয় না পারমিতা। এটা অন্যায়। আমরা দু'জনেই এখন সংসারী। আর একজনের কাছে কমিটেড।

কীসের অন্যায় অনীশ? আমি যে অ্যাপ্রোচ তোমার কাছে করছি, আমার দিক থেকে তা কখনওই অন্যায় নয়। তোমার মনে আছে অনীশ, আমরা যখন বাণেশ্বরপুর পৌঁছলাম, উঠোনে এক আঁজলা কী নরম রোদ! উঠোনের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সাদা হাঁস, যেন রোদ থেকেই হচ্ছে ওদের জন্ম। হাঁসগুলো নেমে যাচ্ছে পুকুরে, আমিও হাঁটুজলে নেমে গিয়েছিলাম। তোমাদের কাজের লোক কংসারিদা এসে কনুই টেনে ধরে, জানতে চেয়েছিল সাঁতার জানি কি না? এমনই আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম তোমাদের বাণেশ্বরপুরে গিয়ে, খেয়ালই ছিল না, সাঁতার জানি না। দুপুরে কংসারিদা রান্না করে খাইয়ে চলে যেতে, তুমি সেই অদ্ভুত বায়না

করলে, আমাকে যখন এত ভালবাসো, পুরো শরীরটা একবার দেখতে দাও। কিছুক্ষণ না না করার পর আমিও ভাবলাম এতে অন্যায়ের কিছু নেই। তবে শুধু দেখা, বাকি সব বিয়ের পর। শর্তে রাজি হলে তুমি। সেই প্রথম ও শেষ বার আমি স্বেচ্ছায় সমস্ত পোশাক ছেড়ে তোমার চোখে চোখ রেখে দাঁড়ালাম। সেই দৃষ্টি বিনিময়ে আমাদের মধ্যে এক অলিখিত চুক্তি হয়ে গেল, আমরা মৃত্যু অব্দি এক সঙ্গে থাকব।

সেই চুক্তি তো তুমিই ভেঙেছ পারমিতা। অনেকক্ষণ পর বলে ওঠে অনীশ। ও প্রান্তে পারমিতা বলে, না, ভাঙিনি। মেয়েরা এক বারই পারে চোখে চোখ রেখে কারওর সামনে নিজেকে উন্মুক্ত করতে। বলে, একটু থামে পারমিতা। ও প্রান্তে অনীশ চুপ। একটা কথা মুখে এলেও, বলতে পারছে না। বলা শোভন নয়। অনীশের নিঃশ্বাসের শব্দ থেকে কথাটা শুনে নিয়ে পারমিতা বলে, জানি, তুমি ভাবছ, আমি তো বিবাহিতা। একটা মেয়েও আছে আমার, তা হলে কীসের এত সতীত্ব? এ ব্যাপারে বলি, আমি নিজেকে এখনও বিবাহিতা বলে মনে করি না। আমি একজন পুরুষের দ্বারা ইউজড, ব্যবহৃত। বাণেশ্বরপুরে দোতলার ঘরে আমি যখন নিরাবরণ হয়ে দাঁড়ালাম, শর্ত করিয়ে নেওয়ার জন্য আপশোশ হল। ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল তোমার ওপর। এই ক্ষণিক মুহূর্তে আমার শরীরে জ্বলে উঠেছিল পবিত্র কামনার উত্তাপ। সেই উত্তাপ আজও আমি বয়ে বেড়াচ্ছি।

পারমিতার প্রান্তের ফোন একদমই চুপ হয়ে গেল। হয়তো সময় নিচ্ছে সামলে নেওয়ার। অনীশের চোখে ভাসছে বাণেশ্বরপুরের দিনটা। পারমিতার উষ্ণতা নেভানোর জন্যই কি সেদিন দুপুরে বৃষ্টি নেমে এসেছিল তাদের গ্রামে। বৃষ্টির জলে রামধনু ... হারিয়ে যাওয়া মনটার নাগাল ধরে অনীশ, কানের মধ্যে বিপদ সংকেত বাজে। যতটা সম্ভব নিজের গলা স্বাভাবিক রেখে পারমিতাকে বলে, এত দিন পর হঠাৎ তোমার এ সব মনে পড়ছে কেন?

মনে আমার সর্বক্ষণই থাকে অনীশ। ভেবেছিলাম, তুমি নিশ্চয়ই একদিন এসে ক্ষমা চাইবে, বলবে, কেন রেজিস্ট্রির দিন আসতে পারনি। তারপর আমরা আবার আগের রিলেশনে ফিরে যাব। ধরে নেব, মাঝের এত ক'টা বছর দু'জনে ভিন্ন জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। আগের ফোনে তুমি কথা দিলে, ফোন করবে, জানাবে, কেন সেদিন আসতে পারনি। কই, আর তো যোগাযোগ করলে না।

করতাম পারমিতা। আজকালের মধ্যেই করতাম। আমি এখন মানসিকভাবে প্রস্তুত। আমি জানি সেদিনের অপমান তুমি ভুলতে পারনি। পারা সম্ভব নয়। আশা

করি সমস্ত ঘটনা জানলে, তুমি অবশ্যই আমায় ক্ষমা করবে। তখন আর আমাকে ভুলতে কষ্ট হবে না।

ও প্রান্তে বেশ চিৎকার করে পারমিতা বলে ওঠে, ভুল ধারণা। তুমি যদি এখন সেদিনের ঘটনা আমাকে না-ও বল আমার কিছু যায় আসে না। কী হবে সে সব জেনে, আর তো দিনটা ফেরত পাব না। কিন্তু এখনও পেতে পারি তোমাকে। যদিও সময় বড় কম। ইতিমধ্যে আমার মেয়ে টের পেয়েছে আমাদের সম্পর্কটা রি-বিল্ড হতে যাচ্ছে। একে একে সবাই জানবে, বাধা হয়ে দাঁড়াবে আমাদের মাঝে।

পারমিতার কথাগুলোর মধ্যে বিক্ষুব্ধ, আকস্মিক আবেগ থাকলেও, কোনও অসংলগ্নতা নেই। প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ওর কথার সামনে নিজেকে বালিঝড়ে পড়ে যাওয়া মানুষ মনে হচ্ছে অনীশের। আপাতত বাকহারা অনীশ। হঠাৎই ভীষণ শান্ত গলায় ও প্রান্তের পারমিতা বলে ওঠে, জান অনীশ, আমাদের দিল্লির বাড়ির সামনে না একটা শিমুল গাছ ছিল। দোতলা সমান উঁচু, বেশ পরিপূর্ণ নিটোল চেহারা। ভারী সুন্দর লাগত বাড়ির সামনেটা। শীতের ক'টা মাস একটু ঝিমিয়ে পড়ত গাছটা, ফুল নেই পাতা নেই। কী রকম দুঃখী, বিষণ্ণ...গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফের তাজা হয়ে উঠত। গাছটা ছিল আমার সংসারের একঘেয়েমির মাঝে রিলিফের মতো। বসন্তকাল এলেই গাছ ভরে উঠত লাল ফুলে। তখন গাছটার কী অহংকার! প্রত্যেক বছর নতুন করে যৌবনপ্রাপ্ত হত গাছটা। শুধু গত শীতের একটু আগেই গাছের সব পাতা ঝরে গেল। ভীষণ খারাপ লাগল আমার। নিঃস্ব, রূপহীন গাছটার দিকে তাকালেই বুক ফাঁকা হয়ে যেত। গাছে নতুন পাতা আসার আগেই তো দিল্লি থেকে চলে এলাম। ক'দিন আগে দিল্লির এক নেবার ফোন করেছিল, এমনি। আমাদের কুশল নিল। একই সঙ্গে জানাল গাছটা মরে গেছে...

ও প্রান্তে স্পষ্ট ডুকরে ওঠার শব্দ পেল অনীশ। কিন্তু তার কী করার আছে, পারমিতার গাছটাকে সে কোনও দিন দেখেনি, কত গভীর সখ্য গড়ে উঠেছিল তাও জানে না। কী ভাষায় সান্ত্বনা দেবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। এর মাঝেই ভেজা গলায় পারমিতা বলে ওঠে, অনীশ, ওই গাছটার মতো আমিও খুব তাড়াতাড়ি নিঃস্ব হয়ে যাব। সময় চলে গেছে অনেকটা। আমি জানি আগের মতো রূপ আমার আর নেই। তবু আমি চাই বাণেশ্বরপুরের সেই দুপুরের মতো তুমি আবার আমার দিকে মোহমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাও, ভান করে হলেও চলবে। তবেই আমি পূর্ণ হই, অবসান হয় আমার প্রতীক্ষার। আমি এখনও বিশ্বাস করি প্রতিটি মেয়ে একটি নির্দিষ্ট পুরুষের জন্যেই জন্মায়। তুমিই আমার সেই পুরুষ...

ফোনের ও প্রান্তে অঝোরে বৃষ্টি নামল। কথা-বার্তার পালা শেষ। ধীরে রিসিভার নামিয়ে রাখে অনীশ। টেলিফোন বুথের কাচের দরজা ঠেলে বাইরে এসে দেখে, একটা কলেজ-বয়সি মেয়ে ফোন করার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। রং মেখে ভূত হয়ে আছে মেয়েটা। শোভাবাজারের রাস্তায়, বাড়িতে, গলির মধ্যে জোর রং খেলা শুরু হয়েছে। মেয়েটা হেসে বলে, ভাল আছেন অনীশদা?

রঙে লুকিয়ে থাকা মেয়েটাকে না চিনেই ম্লান হাসে অনীশ। আসলে হাসে বাইরে চলতে থাকা রং, উৎসবের দিকে তাকিয়ে।

ও রকমই একটা উৎসব প্রাঙ্গণের শেষ প্রান্তে গোমড়া মুখে বসে আছে মৈনাক, ঘণ্টাতলার বট গাছটার বেদিতে। এখানেই থাকতে বলেছিল আহেলি। মাঠে গিজগিজ করছে ভিড়। সিংহসদনের মাথায়, বাঁশের মাচায় ক্যামেরা। রোদের তাপ বাড়ছে। মঞ্চের নাচ-গান প্রায় শেষের দিকে। এই জায়গাটা যেহেতু ভিড়ের পিছন দিক, কিছু অত্যুৎসাহী মানুষ অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার আগেই আবির খেলা শুরু করে দিয়েছে, এদের মুখে নির্বোধ আমোদ। মাইকে বার বার ঘোষণা হচ্ছে, অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া অব্দি রং খেলবেন না। নষ্ট করবেন না শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্য। কে শোনে কার কথা! এখানে বসে থাকতে একটুও ভাল লাগছে না মৈনাকের। উপায় নেই, আহেলি ফিরে যাবে। যদিও আহেলির ব্যাপারে আর কোনও আগ্রহ নেই মৈনাকের, সোনাদার বইটা ফেরত দেওয়ার জন্যই বসে থাকা। হোটেল থেকে তার ছোট্ট লাগেজ নিয়ে বেরিয়েছে মৈনাক। আহেলিকে বইটা দিয়ে স্টেশনে যাবে। আজই ফিরবে কলকাতায়। খুব বাজে কাটল এই ট্রিপটা। মহিলাদের ওপর গভীর বিরাগ তৈরি হল। যেমন আজ সকালে এখানে আসার সময় দেখল, ভীষণ আগ্রহে মেয়েরা কিনছে পলাশ ফুলের মালা, গলায়, চুলে পরবে। খেয়ালই নেই, যে গাছের ফুল এগুলো, সেই গাছটা কোনও রুক্ষ মাঠে আরও নিঃস্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেজাজ খারাপ হয়েছিল গত কাল সন্ধে থেকেই, আহেলি যে এমন আনরোমান্টিক মেয়ে চেহারা দেখে আন্দাজই করা যায়নি। বেশ একটা মধুর প্রেমের ভূমিকা তৈরি করতে যাচ্ছিল মৈনাক, সমস্তটাই ভেঙেচুরে দিল আহেলি। প্রেম গ্রহণ করার মতো আধারই নেই মেয়েটার মধ্যে। এ সবের মধ্যে উনি আবার টেনে আনলেন মায়ের পুরনো প্রেম। বোঝো ঠ্যালা! ভাবনার মাঝে মৈনাকের সামনে কে যেন এসে দাঁড়ায়। বেদিতে বসা মৈনাক চোখ তুলে দেখে,

দাড়ি-গোঁফওলা নিখাদ এক মধ্য চল্লিশের আঁতেল। বলেন, উঠে এসো ভাই, রঙিন করি তোমাকে।

মাইকে কী বলছে শুনছেন?

মাইকরা চিরকালই একটু সিরিয়াস প্রকৃতির, ও রকম কথা বলেই থাকে। সব সময় মাইন্ড করলে চলে না।

আঁতেলের মুখ থেকে মদের গন্ধ ভেসে আসছে। ভোরবেলা নেশা করে ফেলা মানুষদের পছন্দ করে না মৈনাক। মনে হয় এরা যেন সমস্ত দিনটাকে অপমান করার জন্যই ঘুম থেকে উঠেছে।

কী হল ভাইটি, অনুমতি পাব না? লোকটির গলায় কাতর অনুরোধ। 'নেশাতল্‌লামি' যে কী বিরক্তিকর ব্যাপার সে অভিজ্ঞতা আছে মৈনাকের। ফলে তাকে বলতেই হয়, আচ্ছা, অমুকদা বউদি কোথায়, দেখছি না!

একটু যেন ঘোর কাটে লোকটির। কপালে ভাঁজ পড়েছে। 'অমুকদা' সম্বোধন জীবনে প্রথম শুনলেন। উত্তর দেওয়ার বদলে মানে মানে কেটে পড়লেন সামনে থেকে। যদি না যেতেন, মৈনাকের পরের বাক্য সাজানো ছিল, বউদি কি কলকাতায় অন্য কারওর সঙ্গে রং খেলছে? ভাগ্যিস বলতে হল না, মারপিট হয়ে যেতে পারত। সত্যিই মেজাজ বড় তিরিক্ষি হয়ে আছে মৈনাকের। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শান্তিনিকেতন ছেড়ে তার চলে যাওয়া উচিত।

কাল হোটেলে ফেরার সময় ইলাদি বলছিল ভিন্ন কথা। বুঝলি মৈনাক, মেয়েটার সঙ্গে তোর দারুণ জমে যাবে। অসম্ভব ভাল প্রেম হবে তোদের। জীবনে খুব সুখী হবি।

এতই বিরক্ত ছিল মৈনাক, কথা না বাড়িয়ে শুধু জানতে চেয়েছিল, কী করে বুঝলে?

বোঝা যায় বস্‌। 'আসলি জোড়ি' পাশাপাশি দাঁড়ালেই একটা গ্লো বের হয়। ধরা যায় সেটা দেখেই। তোরা যখন এক সঙ্গে হাঁটছিলি ও রকমই একটা আভা তৈরি হয়েছিল।

মৈনাক বলেছিল, ভাট বোকো না, ও সব ফালতু থিয়োরি তোমার আপন মস্তিষ্কপ্রসূত। অথবা বিকেলের নেশাটা একটু দেরি করে কিক মেরেছে।

বিলিভ মি মৈনাক, আই ফিল ইট। যেমন ধর, এই যে বিকেল থেকে আমি তোর হাত ধরে ঘুরছি, তোর শরীর ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাচ্ছিল আমার শরীর। আমি চাইছিলাম এই স্পর্শ থেকেই উঠে আসুক ইচ্ছে, সারা বিকেল এই ভাবে ঘুরে তোর সঙ্গে রাতে চুটিয়ে সেক্স করব কোথায়, মাঝে এসে গেল মেয়েটা! তোরা দু'জনে পাশাপাশি

দাঁড়ালি, অদ্ভুত এক নরম পবিত্র আলোর বলয় তৈরি হল। নিভে গেলাম আমি।

তক্ষুনি মৈনাক বলে উঠেছিল, কাব্যি কোরো না তো। তুমি হচ্ছো মহা সেয়ানা। যাকে বলে ধর্মেও আছি, জিরাফেও। এ সব তোমার দুঃখবিলাস। মনে করলেই তুমি সুন্দর দাম্পত্য, সুখী জীবন কাটাতে পার। রজতদাকে আমি যতটুকু দেখেছি, যথেষ্ট ভাল এবং উদার মানুষ। তোমারই ভীষণ উচ্চাশা। তুমি পারবেই না আর পাঁচটা মেয়ের মতো সুখে ঘর-সংসার করতে। খালি দৌড়বে টাকা আর নামের পেছনে।

বেশ কয়েক পা গম্ভীর ভাবে হেঁটে গিয়ে ইলাদি বলেছিল, তোর রজতদার হয়ে এত কথা বললি তো, একটা মজা দেখবি? —মোবাইল ফোন বার করে ডায়াল করতে শুরু করেছিল ইলাদি। ফোন কানে দিয়ে বলে, রিং হচ্ছে। রজত ধরলে শুধু বলবি, ইলা সরকার আছেন? কোথায় গেছেন---ধর। ফোন কানে নিয়ে মৈনাক শুনেছিল রজতদার নেশা জড়ানো গলা, কাকে চাই? ইলাদি যা বলতে বলেছিল, তাই বলে মৈনাক। উত্তর শুনে মৈনাক প্রায় কালা হয়ে যায় আর কী। ফোন সেট কেড়ে নিতে ইলাদি রজতদার উদ্দেশে বলে, প্রাণ ঠান্ডা হয়েছে তো, বউকে গালাগাল দিয়ে!

ফোনের সুইচ অফ করে, ফের গম্ভীর ভাবে হাঁটতে থাকে ইলাদি। মৈনাকের কানে তখন বাজছিল রজতদার ঘেন্না মেশানো গলা, না। ইলা সরকার নেই। উনি গেছেন একটু। প্রায়ই যান।

মুডের বারোটা পাঁচ করে হোটেলে ফিরেছিল মৈনাক। রুমে ঢুকে দেখে, দুটো কাটা কলা গাছ দুই বিছানায় উপুড় হয়ে আছে। নাক ডাকারও শব্দ হচ্ছে মিহি করে। ঘরের এদিক ওদিক উড়ছে আঁক কাটা, দু'-চার লাইন লেখা কাগজ। রানাদা, রাহুলবাবুর গল্পটা শেষ করার করুণ প্রচেষ্টা। মেঝেতে গড়াচ্ছে নিঃশেষ মদের বোতল, টেবিলে শূন্য গ্লাস, প্লেটে খাবারের অবশিষ্টাংশ। ইলাদি বলেছিল, তুই এক কাজ কর, আমার রুমে চলে আয়। সারা রাত গল্প করে কাটিয়ে দেব।

প্রস্তাবটা না শোনার ভান করে, বেয়ারা ডেকে ঘর পরিষ্কার করায় মৈনাক। ইলাদির সঙ্গে ডাইনিং-এ বসে নামমাত্র ডিনার করে, তারপর তিন বিছানার রুমে ঢুকে সোনাদার বইটা পড়তে শুরু করে। রাতে ইলাদি এসে ডিসটার্ব করেনি। সোনাদার উপন্যাসের মধ্যে একদম ডুবে গিয়েছিল মৈনাক, আহেলির পরামর্শ মতো স্কিপ করেনি। খুবই সিরিয়াস লেখা। স্থান, পাত্র-পাত্রী সবই চেনা মৈনাকের, খুব সহজেই ধরতে পারছিল কোন অংশটা সত্যি, কোনটা তৈরি করা। পারমিতাদিকে নিয়েই লিখেছে সোনাদা। পরিণতি পুরোটাই বানানো।

নায়ক-নায়িকার মিল হয়ে যাচ্ছে। লেখাটা পড়ে বোঝা গেল পারমিতাদির মায়ের ওপর সোনাদার ভীষণ রাগ। উপন্যাস লিখে পুরোটাই উশুল করে নিয়েছে। লেখাটা পড়তে পড়তে মৈনাক বুঝতে পারছিল অচিরেই সোনাদা বিখ্যাত হয়ে যাবে। দূরে চলে যাবে অনেক। তাই খারাপও লাগছিল। ভোর রাতে হয়তো ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়েছে, পাশের রুমে অ্যালার্ম ঘড়ি বেজে উঠেছিল। ভোর থাকতে বসন্তোৎসবে যোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে পাশের বোর্ডার। ঘুম ভাঙার পর মৈনাক বাথরুম সেরে ব্যাগ থেকে রাহুলবাবু চেকটা বার করে। ইচ্ছে করেই ভাঙায়নি, যদি না পারে গল্পটা শেষ করতে। চেকটা রাহুলবাবুর মাথার কাছে টেবিলে রেখে মনে হয়েছিল, দু' কলম লিখে যাওয়া উচিত। সেই মতো পেন কাগজ বার করে মৈনাক সবে লিখেছে, ডিয়ার রাহুলবাবু, আই অ্যাম সরি টু সে...

পিছন থেকে ভেসে এল রানাদার গলা, কী রে, ময়দান ছেড়ে পালাচ্ছিস।

ঘাড় ফিরিয়ে মৈনাক দেখেছিল, রানাদা বিছানায় শুয়ে আড়মোড়া ভাঙছেন। গলায় ঝাঁঝ মিশিয়ে মৈনাক বলে, হ্যাঁ, পালাচ্ছি। আমার আর এ সব ভাল লাগছে না। কোথা থেকে এক আজব প্রোডিউসার জোগাড় করলেন, উদ্ভট তার বায়না! আমিও বোকার মতো আপনাদের কথায় নাচছি। নাউ আই অ্যাম ফেড আপ। এই রইল অ্যাডভান্সের চেক। ঘুম ভাঙলে ওঁকে দিয়ে দেবেন।

এত সহজে হার মানলে চলবে চাঁদু। আমাদের ট্রেডটাই এ রকম অনিশ্চয়তায় ভরা। তুমি যে সেটা জান না, তা নয়। বিখ্যাতও হবে, কোনও ঝুঁকি নেবে না, সৌভাগ্য থালায় সাজিয়ে দেবেন বিধাতা, সেটি হচ্ছে না। নানান হাফ চান্স কোয়ার্টার চান্সের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে তোমাকে।

এ ধরনের বার খাওয়ানো কথা এর আগেও অনেক বলেছেন আমাকে, আমি মোটামুটি সিজনও হয়ে গেছি, স্পষ্ট করে একটা কথা আমায় বলবেন, ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে প্র্যাক্টিক্যাল জোক করছেন না তো?

মৈনাকের কথার পর উঠে বসেছিলেন রানাদা। চোখ কচলে বলেন, না রে, কাল নেশার ঘোরে অনেক কিছু বলে ফেলল, লোকটা বড় ব্যবসায়ীর এক সন্তান। প্রাচুর্যে মানুষ হয়েছে। পড়াশোনাতেও বেশ ভালই, বাবার বিজনেসটা সফল ভাবে চালাচ্ছে। ক্রাইসিস হচ্ছে ওর বউকে নিয়ে। বউ ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যশিল্পী, ছ' মাস বিদেশে শেখাতে যায়, বাকি ছ' মাস এদেশের বিভিন্ন শহরে। প্রেম করে বিয়ে হয়েছিল ওদের। এখন সেই প্রেম আব নেই, তার মানে এই নয় যে বউ অন্য কাউকে ভালবাসে। নানান ব্যস্ততায় প্রেম কেমন যেন জুড়িয়ে গেছে। বউ আর মদ-সিগারেট খেতে বারণ করে না স্বামীকে। ক্রমশই দুঃখী হয়ে পড়ে রাহুল বোস।

প্রেম ব্যাপারটাকে অনেক উঁচুতে স্থান...

এত ফ্ল্যাট করে বললে চলবে না, ক্রাইসিসটা টাচ করবে না মৈনাককে। বলে, উঠে বসলেন রাহুলবাবু। মৈনাক, রানাদা দু'জনেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, হয়তো গোড়া থেকেই ওদের কথা শুনেছেন। রাহুলবাবুর মুখে কোনও বিকার ছিল না। বলে যাচ্ছিলেন, আসলে হয়েছে কী, আগে যখন ড্রিঙ্ক করে ওকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে যেতাম, খুব রাগ করত। বলত, ছ'মাস পর ফিরছি, একদিন ড্রিঙ্ক না করে থাকতে পার না। ইদানীং মদ খেয়ে র‍্যাশ ড্রাইভ করলে, গাড়ি থামাতে বলে, ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি চলে যায়। কয়েক বছর আগেও রাত করে পার্টি সেরে বেলা অব্দি ঘুমোচ্ছি, স্ট্রেট মগে করে জল এনে মুখে ঢেলে দিত। ধড়মড় করে উঠে বসে ওর রাগী, অভিমানী মুখটা দেখতে, কী যে ভাল লাগত, আই কান্ট এক্সপ্রেস। আই রিয়েলি অ্যাডমেয়ার হার। অ্যাকচুয়ালি স্বদেশ, বিদেশ, টিচিং, প্লেন জার্নি, এসবের ট্রেসে আমার স্ত্রী প্রেম কী জিনিস সেটাই ভুলে গেছে। অথচ বিয়ের আগে আমরা কথায় কথায় লং ড্রাইভে বেরিয়ে যেতাম। কত সাধারণ ধাবা, হোটেলে-মোটেলে রাত কাটিয়েছি।

কিন্তু এসবের সঙ্গে আমাদের ফিল্মের কী রিলেশন? বলতে বাধ্য হয়েছিল মৈনাক। রাহুলবাবু বলেন, কথাটা শুনতে ডেপথলেস লাগবে বলে, লজ্জায় এত দিন বলিনি। এখন মনে হচ্ছে আপনাদের কাছে বলাই যায়। দেখুন, আমি তো কবিতা, নভেল এ সব লিখতে পারি না, ফিল্ম ডিরেকশনও না। এমনকী বউয়ের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে যে গুছিয়ে এক্সপ্রেস করব, সে স্মার্টনেসটুকু ওর মুখোমুখি হলে হারিয়ে যায়। তাই ভাবছিলাম আমার কাছে যখন একসেস মানি আছে, প্রোডিউস করি না একটা রিয়েল লাভস্টোরি। ফিল্মটা রিলিজ করার পর, একদিন টোটাল হল বুক করে, আমি আর আমার স্ত্রী ফাঁকা হলে বসে সিনেমাটা দেখব। সিনেমাটা এমন ভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে আমার স্ত্রী আগের ফিলিংগুলো ফিরে পায়।

রাহুলবাবুর কথার পিঠে রানাদা বলে উঠেছিলেন, না না, এতে লজ্জা পাওয়ার কী আছে, স্বয়ং শাহজাহান যখন...

রানাদা কথা শেষ করতে পারেননি, তার আগেই বুকের সব বাতাস উজাড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল মৈনাক। রানাদা চমকে ওর দিকে তাকিয়েছিলেন। রাহুলবাবু আশ্বাস দেওয়ার মতো বলেন, আপনি চিন্তা করবেন না মৈনাক, আমি কোনও টাইম বার রাখছি না। আপনি ভাবুন। আগের চেকটা পকেটে তুলে নিন। ইফ ইউ নিড মোর, আই উইল পে।

কথা আর বাড়ায়নি মৈনাক। চেকটা পকেটে পুরে বেরিয়ে এসেছিল। ইলাদির রুম বন্ধ। বিদায় জানাতে ইচ্ছে হয়নি।

স্টেজে শেষ গান চলছে, রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও গো এবার যাবার আগে আকাশে বাতাসে উড়ছে ফাগ, মানুষ মেতে উঠেছে উৎসবে। এরই মাঝে পুলিশ রেখেছে কড়া নজর। আচমকাই কয়েক জন এসে মৈনাককে আবির মাখিয়ে গেল যাদের মধ্যে এক দু'জন মহিলাও ছিলেন। মৈনাকের এ সবের দিকে মন নেই উৎসবের মাঝে বড় বেশি একা বোকা লাগে নিজেকে। চার দিকে যা ভিড়, হইচই সব কিছু ডিঙিয়ে এখানে পৌঁছতে পারবে তো আহেলি? মৈনাক ঠিক করে আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেই সে চলে যাবে। ভাবতে না ভাবতেই বাসন্তী রঙের শাড়ি পরা আহেলি এসে হাজির, ও মাই গড, এর মধ্যেই এত আবির মাখিয়ে দিয়েছে আপনাকে। বলে, আহেলিও এক আঁজলা ফাগ মাখিয়ে দিল মৈনাককে। আহেলি নিজেও কিছু কম আবির রঞ্জিত হয়নি, মৈনাক ব্যাগ থেকে বইটা বার করতে যাবে আহেলি মৈনাকের হাতটা ধরে নিয়ে বলে, চলুন, আমাদের বাড়ি যাই।

তোমাদের বাড়ি?

হ্যাঁ, আমার দাদুর বাড়ি। আপনার সঙ্গে কেউ নেই তো?

মাথা নাড়ে মৈনাক। আহেলি বলে, তা হলে চলুন। বাড়িতে বসেই কথা বলা যাবে।

মৈনাক যেন রাজি হবেই ধরে নিয়ে আহেলি হাঁটতে শুরু করেছে, অনুসরণ করতে বাধ্য হয় মৈনাক।

সিংহসদন, বিদ্যাভবনের পিছন দিয়ে শর্টকাট রাস্তা ধরে আহেলি। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর রাস্তা একদম নির্জন হয়ে যায়। দু' পাশে বড় বড় গাছ আর বাতাসের ফিসফিসানি। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে আহেলি। মৈনাকের দিকে ঘুরে বলে, আচ্ছা আমি যে আপনাকে আবির দিলাম, কই আপনি তো আমায়...বলে, একটু থামে আহেলি। তারপর বলে, সঙ্গে আবির নেই, চাইতে লজ্জা পাচ্ছিলেন। এই তো আমার আবির, নিন। মুঠোয় ধরা আবিরের প্যাকেট বাড়িয়ে ধরেছে আহেলি। মৈনাক বলে, অন্যের দেওয়া রঙের ওপর আমি রং দিই না।

বুঝেছি। ঠিক আছে, আপনি প্যাকেটটা ধরুন। আমি চোখ বুজছি, এবার আপনি যেখানে আবির দেওয়া নেই, সেখানে দিন। বলে, কোমরের গোঁজা আঁচল খুলে চোখ বন্ধ করে দাঁড়ায়।

মৈনাকের অবস্থা রীতিমতো কাহিল। ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছে, আহেলির কোমর আর পেটটুকুই রং দেওয়া বাকি, আঁচল খুলে দাঁড়ানোর মানে কি ওখানেই

আবির দিতে ইঙ্গিত করছে। তা কিছুতেই পারবে না মৈনাক, ওর ওই অংশটুকু ভাল বাংলায় যাকে বলে তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ। তার মাঝে কাঁঠালি চাঁপার মধ্যবর্তী কুহকের মতো নাভি। ওখানে স্পর্শ করলেই পুড়ে যাবে হাত।

একটু পরে চোখ খোলে আহেলি। বলে, পারলেন না। ইটস প্রুভড, আপনি আমার প্রেমে পড়েছেন। কতটা তা এখনই বলা যাচ্ছে না। তবে পড়েছেন। তাই অসভ্যতা করতে পারলেন না, ভেরি গুড। আমি এটাই চাইছিলাম।

এ যেন প্রেমে পড়ার আগে ইন্টারভিউ চলছে, ভীষণ অবাক হয়ে মৈনাক বলে, তুমি যে কী বলছ, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

হাঁটতে থাকে আহেলি। বলে, কাল রাতে বাড়ি ফিরে এসে মাকে ফোন করেছিলাম। মা তো জানে না আপনার দাদাব বইটা আমি লুকিয়ে নিয়ে এসেছি। প্রথমেই সেটা বলে নিলাম। তারপর বললাম আপনার কথা। আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে, খুব ঘুরেছি আমরা। এমন ভাব করলাম, যেন আমি আপনার প্রেমে পড়ে গেছি।

কেন এ রকম করলে? একটু যেন কঠোর গলায় প্রশ্ন করে মৈনাক।

বাঃ রে, আপনিই তো বলেছেন ফিল্মে চান্স দেবেন, তাই অ্যাক্টিং প্রাকটিস করছিলাম।

ডোন্ট মেক ইট এ জোক আহেলি। প্লিজ ক্লিয়ার আউট।

ও কে বাবা। বলছি, আসলে মায়ের কাছে এই অ্যাক্টিংটা চালিয়ে গেলে, একটা ভীষণ জরুরি কথা জানতে পারব আমি। জানাটা আমার খুব প্রয়োজন।

কী কথা?

সেটা আর কিছুক্ষণের মধ্যে আপনিও জানতে পারবেন। এখন বাড়ি গিয়ে মাকে একটা ফোন করব, দু'-একটা কথা বলে, দেব আপনাকে। আপনি যতটা না আমার প্রেমে পড়েছেন, তার থেকে ওভার অ্যাক্টিং করে মায়ের সঙ্গে কথা বলবেন, তা হলেই রিয়েল ইনফর্মেশনটা বেরিয়ে আসবে।

আমি যদি তোমার কথা না শুনি। বেশ গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলে মৈনাক। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ে আহেলি। বলে, অ্যাজ ইউ উইশ। আমি আপনাকে জোর করতে পারি না। আই হ্যাভ নো রাইট। কান্ট ইউ টেক দিস অ্যাজ এ গেম?

আহেলি যদি রাজনীতি করে অনেক দূর অব্দি যাবে, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে মৈনাক আজ্ঞাবহর মতো হাঁটতে শুরু করে। প্রেমের গল্প খুঁজতে গিয়ে একটা উপকার হয়েছে, মৈনাক বুঝেছে, 'প্রেম' একটা ইউটোপিয়া। ইলাদি, রানাদা, রাহুল বোস, সোনাদা, এমনকী আহেলিও প্রেমহীন নিজস্ব জগতে বাস করছে। খুব যে

কষ্টে আছে, তাও তো নয়। তা হলে মিছিমিছি কেন ভালবাসা, প্রেম বলে নাকে কাঁদা!

একটা কাঠবিড়ালি অনেকক্ষণ ধরে মৈনাকদের সঙ্গী হয়েছে, রাস্তার ধুলো ধরে হাঁটছে। আহেলি হঠাৎ হাত তুলে বলে, ওই যে সাদা দোতলা বাড়ি, ওটাই আমার জ্যাঠাদাদুর বাড়ি। ওখানে থেকেই আমি বিশ্বভারতীতে পড়াশোনা করছি। মায়ের খুব ইচ্ছে ছিল, এই বাড়িতে থেকে বিশ্বভারতীতে পড়বে। আপনার দাদাকে ছেড়ে হয়তো আসতে পারেনি।

পারমিতার জ্যাঠামশাই, জেঠিমার সঙ্গে আলাপ হল মৈনাকের। ওঁদের পায়ে আবির দিতে, প্লেটে ফুটকড়াই, মঠ দিলেন। সৌম শুভ্র দুই প্রৌঢ়ের আতিথেয়তায় মৈনাকের মনটা একটু শান্ত হল। ওঁদের দেখে ভরসাও জাগল, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ইচ্ছে করলেই আজীবন মধুর রাখা যায়।

আলাপ পর্ব সারা হলে, আহেলি গেল ফোনের কাছে। মৈনাককে সামনে রেখে ডায়াল করল সল্ট লেকের বাড়িতে, হ্যালো, মা? আমি বলছি।

ও প্রান্তের কথা মৈনাক শুনতে পায় না। আহেলি আবার বলে, দারুণ হয়েছে ফাংশন। ভীষণ মিস করলে। আসলে পারতে। কত করে বললাম।

হ্যাঁ ঠিক আছে। আর শোনো, তোমাদের পাড়ার মনু মানে মৈনাকদা এখন এ বাড়িতে। কথা বলবে?

পারমিতাদি নিশ্চয়ই 'হ্যাঁ' বলল, রিসিভার এগিয়ে দিয়ে আহেলি চোখের ইশারায় বলে, যা বলেছিলাম মনে আছে তো?

রিসিভার কানে দিয়ে মৈনাক বলে, পারমিতাদি, বল।

ও প্রান্তে পারমিতাদি চাপা গলায় বলে ওঠে, হ্যাঁরে মনু, তুই হঠাৎ ওখানে পৌঁছলি কী করে? আহেলিই তোকে কলকাতা থেকে ডেকে নিয়ে গেছে বোধহয়।

না না, আমি এসেছি একটা কাজে। দেখা হয়ে গেল। কথাটা বলে, মৈনাক আড়চোখে তাকায় আহেলির দিকে। আহেলি চোখ পাকিয়ে আছে। পারমিতাদি আবার বলে, মেয়ে তো ফোনে তোর খুব প্রশংসা করছে। আমার মনে হচ্ছে ও বোধহয় ইমোশনালি ইনভলভ হয়ে পড়ছে তোর সঙ্গে। একটু কেয়ারফুল থাকিস।

মৈনাকের কপালে ভাঁজ পড়ে। বলে, কেন বলছ এ কথা?

কারণ আছে। প্র্যাকটিক্যাল কজ। এখন তোকে যে কথাটা বলব, আহেলির বাবা ছাড়া আর কেউ জানে না। তুইও কাউকে বলবি না।

কথাটা কী?

আহেলি তোর সোনাদার মেয়ে। হিসেব মতো তোর ভাইঝি। এ বার বুঝলি ব্যাপারটা!

কী অবলীলায়, স্বাভাবিক ভাবে কথাগুলো বলেছিল পারমিতাদি। যেন কোনও প্রবীণ, অভিজ্ঞ জজ আসামীকে ফাঁসির হুকুম শোনালো। রিসিভার নামিয়ে রাখার আগে মৈনাক শুনল, পারমিতাদি বলছে, ওখান থেকে ফিরেই একবার আমার বাড়িতে আসবি। আরও অনেক কথা আছে।

ভাষাহীন দৃষ্টি নিয়ে মৈনাক আহেলির দিকে তাকায়। আহেলির চোখ দিয়ে রাগ ঠিকরে বেরোচ্ছে। বলে, কী বলল মা?

তেমন কিছু না। বলে, এড়িয়ে যেতে চায় মৈনাক। আহেলি বলে ওঠে, আমি জানি কী বলেছে।

তিক্ততায় ভরা মৈনাকের চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে ওঠে। আহেলি বলে, মা বলছে, আমি আপনার সোনাদার মেয়ে। তাই না?

মৈনাক কোনও উত্তর দেয় না। আহেলি বলে চলে, এটা মায়ের একটা চাল। আমাকে মাঝে রেখে বাবার সঙ্গে ডিসট্যান্স ক্রিয়েট করে রেখেছে। আমি ছোট থেকেই দেখছি বাবা, মা এক বেডে কখনও শোয় না। আমার ছোটবেলায় বাবা যখনই আদর করতে এসেছে, সরিয়ে নিয়ে গেছে মা। আড়াল থেকে শুনেছি মা ধমকাচ্ছে বাবাকে, কত বার বলেছি, বেশি মেয়ে মেয়ে কোরো না। ও তোমার নয়।

তা হলে আমি কার মেয়ে? এই কোয়েশ্চেনটা বার বার হন্ট করত আমায়। একটু বড় হয়ে বাবার কাছে জানতে চেয়েছি। কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বাবা বলছে, ওটা তোর মায়ের পাগলামি। একটু আধটু ম্যাডনেস সবার মধ্যেই থাকে। ও নিয়ে অত মাথা ঘামালে চলে না। বুঝতে পারতাম বাবা আমাকে কিছু একটা লুকিয়ে যাচ্ছে। যদি ধরে নিই, মায়ের এটা সাইকিক প্রবলেম, তার তো একটা রুট আছে। সেই রুটেই আমি পৌঁছতে চাই। আমার অবাক লাগে, অন্য সব ব্যাপারে মা ন্যাচরল বিহেভ করে। অথচ আমার আইডেন্টিটি নিয়ে এ রকম ডার্কনেস ক্রিয়েট করে রেখেছে কেন? আজও এই ট্রমা থেকে মা বেরোতে পারছে না। হোয়াই? কখনও সখনও মায়ের কিছু অ্যাটিটিউড দেখে মনে হয়, মা পড়ে আছে বিয়ের আগের বয়সে। ভীষণ ছেলেমানুষ হয়ে যায়। তখনই আমার মনে হয় আমি সত্যিই হয়তো অন্য কারুর সন্তান। কলকাতায় আসার পর আন্দাজ করছি, হয়তো আপনার সোনাদারই মেয়ে আমি। আমার প্রেজেন্সকে মা মেমেন্টো হিসেবে দেখে, তাই আর বড় হতে পারেনি। ভুলতে পারেনি অনীশ চ্যাটার্জিকে— একটু দম নেয় আহেলি। কথা বলতে বলতে ওর গাল এতটাই লাল হয়ে গেছে, ম্লান লাগছে সকালের আবির।

আবার বলতে শুরু করে আহেলি, আমার কোয়েশ্চেনের অ্যানসার দিতে পারে আপনার সোনাদা। তবে আমি তাঁর কাছে এখনই যাব না। মাকে বলব, আমার, বাবার তোমার গ্রুপ ব্লাড টেস্ট করাও। রাজি না হলে, আমি অনীশবাবুর কাছে যেতে বাধ্য হব।

এতক্ষণে একদম থেমে গেল আহেলি। ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে। আবার যদি কিছু বলে ওঠে, মৈনাক শুনতে পাবে না। টোটাল সিচুয়েশন থেকে মৈনাক নিজেকে উইথড্র করে নিয়েছে। এত দমবন্ধ জটিলতার সঙ্গে সে নিজেকে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারে না। বাগান থেকে ভেসে আসছে পাখির চিক চিক ডাক। কোন পাখির ডাক, কে জানে! শব্দটা নির্জনতা বাড়িয়ে দিচ্ছে আরও। পায়ে পায়ে দরজার দিকে এগোয় মৈনাক। আহেলির থেকে বিদায়ের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজনই বোধ করে না।

মৈনাকের কনুই ধরে নেয় আহেলি। বলে, আই অ্যাম সরি মৈনাক। আপনাকে এ রকম একটা অকওয়ার্ড পজিশনে ফেললাম বলে। জানি, আপনার খুব বাজে লাগছে, কিন্তু আমার কথাটা ভাবুন, সেই কবে থেকে আমার বাবাকে খুঁজছি, আজও পাইনি। আমি কে, তাই ভাল করে এখনও জানলাম না। আপনাকে ভালবাসার ইচ্ছেটাকে গোড়াতেই মেরে ফেলতে হল। কেন না সন্দেহ হচ্ছে আপনি আমার ব্লাড রিলেশন।

আহেলির চোখের কোণে জল, না কি আবিরের অভ্র ঠিক বুঝতে পারে না মৈনাক। কনুই অনেকক্ষণ ছেড়ে দিয়েছে আহেলি, মৈনাক বলে, চলি।

দাঁড়ান, আর একটা কথা।

আপনি কবে ফিরছেন কলকাতায়?

আজই।

না, আজ ফিরবেন না। কাল আমরা এক সঙ্গে ফিরব।

একটু পরে মাকে ফোন করে বলব, আপনি আমাকে সব বলে দিয়েছেন। তারপর ডি এন এ টেস্টের কথায় যাব। জানি মায়ের ভীষণ রি-অ্যাকশন হবে। সেটা সামলাতেই কাল আমার কলকাতায় ফেরা উচিত। আপনি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন। আমি একা মাকে ফেস করতে পারব না। —একটু থেমে আহেলি বলে, আপনারা কোন হোটেলে উঠেছেন যেন?

হোটেলের নাম বলে মৈনাক। আহেলি বলে, অবশ্য হোটেলে যাওয়ার আমার দরকার নেই। আমি প্রান্তিক স্টেশনে সকালের বিশ্বভারতীর জন্য ওয়েট করব। আপনি চলে আসবেন। প্রান্তিক থেকে আপনার হোটেল কাছেই।

ঘাড় নেড়ে মৈনাক গেটের দিকে এগোয়। দুই প্রৌঢ়র কাছে বিদায় নেওয়া হল না বলে খারাপ লাগে। তারা যে কোথায় গেলেন!

রাস্তায় এসে পড়তেই কাঠবিড়ালিটা সঙ্গ নেয়। কাঠবিড়ালি নিয়ে গিয়েছিল অরূপকথার দেশে, সেখান থেকে ফেরত নিয়ে আসছে। খুব তাড়াতাড়ি ওই দেশটার কথা ভুলতে চায় মৈনাক। সামনে গাছ ঢাকা রাস্তা বড্ড দীর্ঘ মনে হয়।

পরের দিন ভোর। বেড-টি বাথরুম সারা হয়ে গেছে মৈনাকের। এখন জামা-প্যান্ট পরে রেডি হচ্ছে। রানাদা, রাহুলবাবু নিজেদের বিছানায় ঘুমে কাতর।

আহেলির কথা মতো শান্তিনিকেতনে একটা দিন থেকেই গেল মৈনাক। চলে যেতে পারত, কিন্তু তারও কেমন যেন আশঙ্কা হচ্ছে, আহেলি যে সব কথা বলতে যাচ্ছে মাকে। ফল মারাত্মক হতে পারে। সিচুয়েশন একা ট্যাকল করতে পারবে না আহেলি, এ সময় ওর পাশে না থাকাটা স্বার্থপরতা হয়ে যাবে।

আহেলির দাদু-দিদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে মৈনাক হোটেলে এসে রানাদাদের সঙ্গে লাঞ্চ করে। একটু রেস্ট নিয়ে সবাই একসঙ্গে ঘুরতে বেরোয়। মৈনাক ফিরে আসাতে বাকি তিনজন খুব খুশি। খোয়াই, কোপাই ঘুরে মৈনাকরা গিয়েছিল গৌরপ্রাঙ্গণে 'মায়ার খেলা' নৃত্যনাট্য দেখতে। 'মায়ার খেলা' আসলে গীতি-নাট্য রূপে লিখিত, এ বারই সেটা প্রথম নৃত্যনাট্য হিসেবে মঞ্চস্থ হচ্ছে। ইলাদির খুব উৎসাহ, 'মায়ার খেলা' গল্পটা বোঝাচ্ছিল মৈনাককে। কিছুই ঢুকছিল না মাথায়। সে এখন সব কিছু থেকেই নিজেকে অ্যালুফ করে নিয়েছে। আহেলির সঙ্গে দেখা হল না মাঠে। চাপা টেনশন হচ্ছিল। এক বার মনে হয়েছিল চলে যায় আহেলির দাদুর বাড়ি, যায়নি। পাছে আহেলি তার এই আন্তরিক উৎকণ্ঠাকে 'প্রেম করতে আসা' বলে কটাক্ষ করে।

মৈনাকের সিরিয়াস মুড দেখে, রাহুলবাবু বোধহয় আশ্বস্ত হয়েছিলেন, খুব একটা ঘাঁটাননি। ধরেই নিয়েছেন মৈনাক গল্পের মধ্যে ডুবে আছে। কিন্তু ঘটনা তো তা নয়, মৈনাক ঢুকে গেছে অন্য এক রিয়াল গল্পে।

ব্যাগ পিঠে তুলে নেয় মৈনাক। এমন সময় রুমের ইন্টারকম সেট বেজে ওঠে। ফোনটা ধরতে যাবে মৈনাক, রানাদা জেগে উঠে রিসিভার তুলে নেন। ও প্রান্তের সঙ্গে দু'-একটা কথা সেরে নিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখেন। মৈনাককে বলেন, রিসেপশনে তোর খোঁজে একটা মেয়ে এসেছে।

খুব অবাক হয় মৈনাক, হোটেলে তার খোঁজে কে আসবে? আহেলি নিশ্চয়ই নয়, ওর সঙ্গে কথা হয়ে আছে প্রান্তিক স্টেশনে দেখা হবে।

কী হল, স্টাইল মেরে দাঁড়িয়ে রইলি যে! যা তাড়াতাড়ি। ওই মেয়েটার জন্যই তো তুই আমাদের সঙ্গে ফিরতে চাইলি না। বলে, পাশ ফিরে শুলেন রানাদা। মৈনাক কথা না বাড়িয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দেখে, সত্যিই রিসেপশন কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আহেলি। কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে ওর। প্রবল ঝড় ঝাপটার গাঢ় ছাপ লেগে আছে নরম শরীরে। মৈনাক সামনে যেতেই আর্ত, অসহায় চোখ তুলে আহেলি বলে, মা পালিয়ে গেছে।

মানে? প্রচণ্ড বিস্ময়ে জানতে চায় মৈনাক।

কাল আপনি চলে যাওয়ার পর মায়ের সঙ্গে অনেক ঝগড়া করলাম তো, ব্লাড টেস্ট, অনীশবাবুর কাছে যাব, কেন এতদিন চেপে গেছ অনীশবাবু আমার বাবা... শুধু শুনে গেল। কোনও উত্তর দিল না। আজ সকালে বাবা ফোন করে জানাল, তোর মা চলে গেছে।

মুহূর্তে মৈনাকের মনে পড়ে শোভাবাজার রাজবাড়ির বিজয়ার দিন নীলকণ্ঠ পাখি ছাড়াব কথা। লোক বিশ্বাস, পাখি কৈলাসে গিয়ে শিবকে খবর দেবে, মা ফিরছেন। মৈনাকের পাখি-পালক বন্ধু শৈবাল দু'বার নীলকণ্ঠ পাখিটাকে হাওড়ার ঘাট থেকে ফেরত নিয়ে আসে চুপিচুপি। পারমিতাদিও তো শোভাবাজারের মেয়ে, নিশ্চয়ই বেশি দূর যেতে পারেনি।

মন ফিরিয়ে এনে মৈনাক আহেলির কাছে জানতে চায়, কোনও নোট-ফোট লিখে গেছে পারমিতাদি?

হ্যাঁ, লিখেছে, চললাম। খোঁজ কোরো না। আহেলিই তোমার মেয়ে। ওকে দেখো। বলেই, ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ওঠে আহেলি। বলে, আমি তো মায়েরও মেয়ে, কী করে আমাকে ভুলে চলে গেল!

আহেলির পিঠে হাত রেখে মৈনাক বলে, কন্ট্রোল ইওরসেল্ফ। মাথা ঠান্ডা রাখো। দেখতে হবে কোথায় গেল। আচ্ছা তোমার বাবা কি ইতিমধ্যে পুলিশকে কিছু জানিয়েছে?

মাথা নাড়ে আহেলি। বলে, বাবা বলেছে, তুই তাড়াতাড়ি ফিরে আয়, তারপর ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। আসলে মা-কে ভীষণ ভয় পায় বাবা, ওই যে লিখে গেছে 'খোঁজ কোরো না' ব্যস, আমি না যাওয়া অব্দি কিছুই করবে না।

এ রকম বাধ্য অনুগত মানুষের কথা জীবনে প্রথম শুনল মৈনাক। স্ত্রী যদি বিষ হাতে নিয়ে বলে, আমি খাচ্ছি বাধা দিয়ো না। এই ধরনের স্বামী বসে বসে দেখবেন? মৈনাক বলে, তা হলে চলো, ট্রেনের টাইম হয়ে যাচ্ছে।

আহেলি দাঁড়িয়েই থাকে। একটু পরে বলে, একবার তোমার সোনাদার বাড়িতে ফোন করবে? আমার মনে হচ্ছে মায়ের খবর উনিই ভাল জানবেন।

আহেলির আপনি থেকে তুমিতে চলে আসাটা কান এড়ায় না মৈনাকের। কিন্তু এসব নিয়ে আদিখ্যেতার সময় নয় এখন। যুক্তিটা আহেলি খারাপ দেয়নি। রিসেপশনের ফোন থেকে সোনাদার নাম্বারে ডায়াল করে মৈনাক। ও প্রান্তে ফোন ধরে সুতপা বউদি। গলা স্বাভাবিক রেখে মৈনাক বলে, বউদি আমি মনু, সোনাদাকে একবার দাও তো।

ও পারে খানিক নীরবতা। থমথমে গলায় বউদি বলে, মনু, তোমার সোনাদা কাল রাত থেকে এখন পর্যন্ত বাড়ি ফেরেনি।

কেন? কিছু বলে গেছে? হঠাৎই কান্নায় ভেঙে পড়ে সুতপা বউদি, কিছুই বলে যায়নি। কোনও ঝগড়াঝাঁটিও হয়নি।

সে কী, তা হলে গেল কোথায়?

কাঁদতে কাঁদতেই বউদি বলে, জানি না। মা-কে বলছি পুলিশে জানাতে, রাজি হচ্ছেন না। গুম মেরে আছেন। মাঝে মধ্যে একটা কথাই বলছেন, সোনা বোধহয় ওর বাবার কোনও খোঁজ পেয়েছে, সেখানেই গেছে। নিজের চোখে না দেখে এসে, আমাদের বলবে না।

একটু থেমে সুতপা বউদি বলে, জান, আমার মনে হচ্ছে মা পাগল হয়ে গেছেন। আমি যে কী অবস্থার মধ্যে আছি মনু...

মৈনাক আশ্বাস দিয়ে বলে, অত ভেঙে পোড়ো না তো। আমি এক্ষুনি কলকাতার ট্রেন ধরছি।

মৈনাক ফোন রাখতে যাবে, সুতপা বউদি মোক্ষম প্রশ্ন করে বসে, তুমি হঠাৎ সোনাদাকে ফোন করলে কেন? তুমি কি কিছু জান মনু?

না জানি না, বাড়ি ফিরি, কথা হবে। ফোন নামিয়ে আহেলির দিকে তাকায় মৈনাক, ফোনের সব কথাই আন্দাজ করতে পেরেছে আহেলি। তাই শুধু বলে, কোথায় যেতে পারে দু'জনে?

কলকাতায় ফেরেনি মৈনাক, আহেলি। ওরা এখন মাঠ, ঘাট, চাষজমি পেরিয়ে চলেছে মৈনাকদের দেশের বাড়ি বাণেশ্বরপুরে। সূর্য হেলে পড়েছেন পশ্চিমে। পেঁজা মেঘের গায়ে গত দিনের হোলির রং।

প্রান্তিক থেকে বিশ্বভারতী ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ধরেছিল দু'জনে। ট্রেনে বসে নানা সম্ভাব্য জায়গার কথা আলোচনা করছিল, যেখানে গেলেও যেতে পারে পারমিতা,

অনীশ। সেই সময় একবার আহেলি বলেছিল, মা প্রায়ই একটা জায়গার কথ বলত, মিটার গেজ লাইনের ট্রেনে যেতে হয়। গ্রামের ভেতর দিয়ে, পাড়া, পুকুরের পাশ দিয়ে চলে যায় ট্রেন। খুব ছোটবেলায় দাদু-দিদার সঙ্গে গিয়েছিল মা জায়গাটার নাম এখন আর মনে করতে পারে না। বলেছিল, মায়েরা ওঠে উঁ মাঠের ওপর মাটির দোতলা বাড়িতে। উঠোনের পাশে ধানের গোলা, মাঝে তুলসী মঞ্চ। কত গাছপালা বাড়ি ঘিরে। একটা টইটুম্বুর পুকুরও আছে। মা বলত রাতেরবেলায় পুকুরটাকেই আকাশ মনে হত। চাঁদ, তারা সব ফুটে উঠত সেখানে..

আর কিছু বলতে হয়নি, মৈনাক বুঝে গিয়েছিল কিছু অংশ গোপন করে পারমিতাদি কোন জায়গার কথা বলেছে মেয়েকে। সোনাদার সঙ্গে কোনও এব সময় এসেছিল হয়তো। এখন আর গোপন করার কোনও মানে হয় না। মৈনাব বলেই দেয় জায়গার নাম। আহেলি যখন জানল, বাণেশ্বরপুর মৈনাকদের দেশের বাড়ি। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেনি। বলেছে, চলো, আমার মনে হচ্ছে মা ওখানেই গেছে। কত বার যে ওখানকার গল্প করেছে আমায়...

বর্ধমান স্টেশনে নেমে, ট্রেন বদলায় মৈনাকরা। ছোট লাইনের ট্রেন যত এগিয়েছে, আহেলি ততই অবাক হয়েছে, মা যেমন যেমন বলেছিল, মিলে যাচ্ছে সব

ভাতার স্টেশনে নেমে, গরুর গাড়ি, ভ্যানরিকশা কিছুই পায়নি মৈনাকরা, হেঁটে যাওয়াই স্থির করেছিল। কিছু দূর হাঁটার পর আহেলি দেখতে পায় মায়ের বর্ণন মতো রাস্তার পাশে একটা ছোটখাটো টিলা। আসলে ঢিবি। মায়েরা যে দিন ফিরে আসছিল, ওই ঢিবির ওপর দাঁড়িয়েছিল গোটা গ্রামের লোক, মায়েদের বিদায় জানাতে। ঢিবিটা তখন না কি ইতিহাস-প্রাচীন মন্দির মনে হচ্ছিল। মা অযথা চেপে গিয়েছিল সফর সঙ্গীর কথা। কিছুই মনে করত না আহেলি। বরং গল্পটা শুনতে আরও ইন্টারেস্টিং লাগত।

হাঁটতে হাঁটতে দুটো গ্রাম পেরিয়ে এল আহেলিরা। এক সময় বসতিও ফুরিয়ে এল। দূরে মাঠের শেষ প্রান্তে দেখা যাচ্ছে গাছ-পালায় চাপা পড়া একটা পুরনো দোতলা বাড়ি। আর একটু এগোতেই বোঝা যায় বাড়িটার অবস্থা একদমই জরাজীর্ণ প্রায় খণ্ডহর। ভাঙা সদর দেউড়ি, পাঁচিল উধাও। দোতলার অনেকটা অংশ ধসে গেছে। বাড়ির পিছনে জঙ্গল। ওই গাছ-পালার মধ্যে একটা ফুলে ভরা কৃষ্ণচূড়া দেখা যায়, আহেলির মনে হয় মা ওখানেই আছে। লাল কৃষ্ণচূড়ার ফুল যেন মায়ের টিপ।

আহেলিদের মাথার ওপর উড়ে যাচ্ছে পাখি। তুমুল হইচই। পাখিদের গন্তব বাড়ি লাগোয়া জঙ্গলে।

মৈনাক বলে, ওইটেই আমাদের পিতৃপুরুষের বাড়ি। ছোটবেলায় এক-দু'বার

এসেছি। ধুমধাম করে লক্ষ্মী পুজো হত। এখন সব বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ আর আসে না। আমার মনে হয় না, ওই ভাঙা বাড়িতে পারমিতাদি এসে উঠবে।

মৈনাকের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। পারমিতা উঠেছে ওই বাড়িতেই। অনীশও আছে তার সঙ্গে। এই পোড়ো বাড়িতে মানিয়ে নিতে একটুও অসুবিধে হয়নি পারমিতার। সে ফিরে গেছে কুমারীবেলায়। যে সময় গোপন অভিসারকে পাপ বলে ধরা হয় না। গতকাল বিকেলে এ বাড়ির উঠোনে পা দেওয়ার পর থেকেই পারমিতা একদম বদলে গেছে। ওর চেহারায় জমা হওয়া বিদগ্ধ বিষণ্ণতা কেটে গিয়ে এসেছে অপার সারল্য। আগের মতো এ বাড়িতে হাঁস নেই, তুলসী মঞ্চ, ধানগোলা সবই ভেঙে গেছে। মুছে গেছে লক্ষ্মী পুজোর আলপনাও। তবু যেন সব কল্পনায় দেখতে পাচ্ছিল পারমিতা। সারাটা বিকেল, সন্ধে জুড়ে ঘুরপাক খেয়েছে ভিটেতে। রাতে দোতলার ঘরে শুয়ে দু'জনে অনেক গল্প করেছে, কত কথা জমা হয়েছিল। একবারও বিবাহিত জীবনের কথা তোলেনি পারমিতা, ও সব যে অন্য জন্মের কথা। কুড়ি-বাইশ বছর আগের সেই রামধনু মাখা বৃষ্টির জল দু'জনের কাছেই সঞ্চিত ছিল। ভোররাতে সেই জলেই একে অপরকে অবগাহন করায় তারা। নক্ষত্ররা নিভে যাওয়ার পর দু'জনে ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুম ভাঙার পর অনীশ ফিরে আসে বাস্তবে, ক্রমে দ্বিধায় পড়ে যায় পারমিতার পরিতৃপ্ত মুখ দেখে, একটা দিন-রাতের কড়ারে ডেকে নিয়ে এসে পারমিতা কি ভুলেই গেছে বাড়ি ফিরতে হবে। দুপুর গড়িয়ে গেছে, পারমিতার ঘোর এখনও কাটেনি। দোতলার ঘরের জানলায় হাত আয়না রেখে এখন চুল আঁচড়াচ্ছে। ওর মুখে পড়েছে বিকেলের আলো। পারমিতার মনে, এখন আর বয়স বাড়ার আতঙ্ক নেই। গোধূলি আলোর বয়স বাড়ে না।

অনীশ বসেছিল শীতলপাটিতে। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে পারমিতা বলে, তোমাদের কংসারিদার খোঁজ নাও, আজ রাত্তিরে খাওয়া হবে কী?

অনীশের কাছে এর কোনও উত্তর নেই। টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে। পারমিতার আনা খাবারে দুপুর অব্দি চলেছে, এবার খিদে পেলে যদি হুঁশ ফেরে পারমিতার।

চিরুনি থেকে চুল গুছিয়ে থু থু করে জানলার বাইরে ফেলে পারমিতা। তারপর যায় রাস্তার দিকের জানলায়, যদি গ্রামের কাউকে দেখে, বলবে কিছু খাবার-দাবার এনে দিতে। বদলে দেখতে পায় তার মেয়ে আর মৈনাক হেঁটে আসছে।

ছিটকে জানলা থেকে সরে আসে পারমিতা। অনীশকে বলে, আহেলি, মনু আসছে। কী করে খবর পেল?

সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে অনীশ। তক্ষুনি জানলার কাছে যায়। এ রকমই কিছু একটা

সে চাইছিল। এই গোপন আস্তানায় না কি অতীতে, সে মোটেই বেশি দিন থাকতে চায় না। বাবার পরিণতি সে দেখেছে। দেরি হলে বিল্টুও হয়তো কোনও একদিন তাকে জরাজীর্ণ অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখবে।

মাটির পথ ধরে আহেলি মৈনাক প্রায় চলে এসেছে বাড়ির কাছাকাছি। আহেলিকে প্রথম দেখছে অনীশ, মায়ের মতোই দেখতে হয়েছে। পাশ থেকে বিষণ্ণ গলায় পারমিতা বলে, যাই, ওদের নিয়ে আসি।

দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে অনীশ দেখে, মনুরা সদর পেরিয়ে এলেও, পারমিতা এখনও পৌঁছয়নি। তখনই তার মনে কু-ডাকে, একটু আগে যে পুকুরে নারকোল পড়ার শব্দ হল, বেশ জোরেই হয়েছিল শব্দটা। ওটা কি তা হলে...

বুক ফাঁকা হয়ে যায় অনীশের, ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

পারমিতাকে দালানে শোওয়ানো হয়েছে। ডুবে যাওয়ার আগে বাতাস খামচে ধরতে চাইলেও, একবারও 'বাঁচাও' বলে চেঁচিয়ে ওঠেনি। তখনই ডাইভ মেরে ওকে তুলে আনে অনীশ। ঘাটের সিঁড়িতে শুইয়ে পেট থেকে জল বার করে। তারপর নিয়ে আসে দালানে। এখনও চেতনা ফেরেনি পারমিতার, শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে। ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে অনীশ, আহেলি। দু'জনে প্রাণপণে ডাকছে। এ বাড়ির আলো, বাতাস, ধুলো, পাখিরা সবাই ডাকছে পারমিতাকে। সামান্য তফাতে দাঁড়িয়ে থাকা মৈনাকের মুখে গভীর উদ্বেগ, অথচ এই সময়ই মৈনাক নিজের গল্পের শেষটা পেয়ে যায়, শহুরে ব্যক্তিত্বময়ী কোনও পথ না পেয়ে, পারমিতাদির মতোই নিজের থেকে যাওয়াটা নিশ্চিত করবে। নিষ্ঠুর ভাবনাটা তৎক্ষণাৎ মাথা থেকে তাড়িয়ে পারমিতার দিকে এগিয়ে যায় মৈনাক, পারমিতাদির ঠোঁটে ভেসে উঠেছে কাশফুলের মতো মিহি হাসি। প্রতিমা বিসর্জন হলে এই হাসিটা প্রথমেই মুছে যেত। নিশ্চিন্ত হয় মৈনাক। আহেলিকে কাঁদতে দেখে বলতে ইচ্ছে হয়, এখন বুঝতে পারছ, কী ভয়ংকর খেলার সঙ্গী করেছিলে আমায়।

অবচেতন থেকে ক্রমশ চেতনায় ফিরছে পারমিতা। কারা যেন তাকে ডাকছে কত রকম সম্বোধন! এর মধ্যে পাখিদের হইচইও ঢুকে গেছে। কণ্ঠস্বরগুলো চেন চেনা লাগলেও, ঠিক চিনতে পারছে না। চোখের পাতাদুটো ভারী হয়েছে এমন খুলতেই পারছে না।

অনেক কষ্টে চোখ মেলে পারমিতা। দৃষ্টি আবছা হলেও, মুখের ওপর ঝুঁকে পড় মেয়েটাকে চিনতে পারে, তারই কুমারীবেলা, তাকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদছে বড় মায়া হয় পারমিতার।
